আমি ও আমার ধর্ম

"কে তুমি, দিয়েছ সেই মানবহৃদয়ে, কে তুমি দিয়েছ প্রিয়জন;
বিরহের অন্ধকারে, যাকে তুমি কাঁদাও তারে,
তুমিও [illegible] সাথে করনা [illegible]।"

"কেন এই আনাগোনা, কেন মিছে দেখা শোনা, দু'দিনের তরে,
কেন বুকভরা আশা, কেন এত ভালবাসা, অন্তরে অন্তরে।
আয়ু যার এতটুকু, এত দুঃখ এত সুখ, কেন তার মাঝে,
অকস্মাৎ এ সংসারে, কে বাঁধিয়া দিল তারে, শতলক্ষ কাজে।।"

উৎসর্গ

শ্রীমৎ গৌরগোবিন্দ ভাগবত স্বামীর স্নেহাশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত ও তৎপ্রতি আশৈশব একান্ত অনুরক্ত, তীর্থ পর্য্যটন ব্রতধারী, অমলিন ভাগবতীয় আনন্দ ধারায় যাপিত জীবন, চিরকুমার, ১৩৯৫ বঙ্গাব্দের ১৩ই আশ্বিন শুক্রবার, ইংরাজী ৩০শে সেপ্টেম্বর ১৯৮৮, সূর্য্যোদয়ের সাথেই আত্মসূর্য্য অস্তমিত,- আমার কনিষ্ঠ সহোদর শ্রীমান গোপীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশে। গ্রন্থখানা উৎসর্গ করা হইল।

"মৃত্যু নয়, ধ্বংশ নয়, নহে বিচ্ছেদের ভয়, শুধু সমাপন,
শুধু সুখ হতে স্মৃতি, শুধু ব্যথা হতে প্রীতি, তরী হতে তীর।
খেলা হতে, খেলা শ্রান্তি, বাসনা হইতে শান্তি, নভ হতে নীড়,
শুধু বিদায়ের ক্ষণ।"

"গিয়েও তুমি যাওনি চলে, আছ মোদের কাছে
তোমারে স্মৃতি ছড়িয়ে আছে, সকল স্মৃতির মাঝে।"

শুদ্ধ সংশোধন সহায়িকা

পৃষ্ঠা পঙক্তি	হইবে	পৃষ্ঠা পঙক্তি	হইবে	পৃষ্ঠা পঙক্তি	হইবে
৬—১৮	ত্রিশের	২৯—২	রসনা	১৩৪—১৫	মৃতের
৮—১৬	৫০৫	৩০—৭	তপন	১৩৫—৮	চলিয়া
৯—১৩	আমাকে	৩০—১৫	আচরিত	১৪১—২৪	নিরপেক্ষ
১০—৪	মন	৩১—১১	উদগমের	১৪৫—৬	বদ্ধাবস্থার
১১—৪	;	৩১—১২	সম্পাদ	১৪৬—১৫	শ্রীমদ্ভাগবত
১০—৫	ফুল	৪০—২০	অনুরাগে	১৪৭—৩	অন্তরে
১০—১১	বোধক	৪৫—৮	প্রমাণ	১৪৭—২১	যাহা
১০—১১	উত্থিত	৪৬—২০	অবতীর্ণ	১৪৮—৪	পালন
১১—১৮	গ্রাহ্য	৪৭—১৬	দেবানাঞ্চ	১৪৮—১৬	বলিয়া
১২—৭	চেতনার	৪৮—২৮	জনপ্রবাদ	১৪৯—৮	সর্ব্বচিন্তা
১২—৭	উদ্বোধন	৫০—১৪	ধামে	১৪৯—১১	ভগবৎপ্রীতি
১২—৯	বা রসায়নিক	৫৫—১৮	বিশ্বনিয়ন্তার	১৪৯—১৩	ধামে
১৩—২৩	তাৎপর্য্য	৫৩—২৩	কুলার্ণবতন্ত্রে	১৪৯—২৮	ধর্ম
১৪—৪	এগার	৫৭—১৪	সুন্দর	৫০—২	মথিয়া
১৫—১১	অবহিত	৫৮—১০	নাম	১৫০—১০	কলিকাল
১৭—১	বিস্ফারিত	০৬—৫	নামেকীর্ত্তিত	১৫০—২২	মন
১৭—৮	মন	৬৭—২২	অম্বরীক্ষে	১৫০—২৮	আমায়
১৭—১৩	মনঃ	৬৮—২২	পদ্মরূপ	১৫১—৬	তাঁহারা
১৮—১১	অবশ্যই	৭২—৫	ঐশী	১৫২—২	জাগতিক
১৯—২	মন	৭৩—১৫	কৃত	১৫২—২	চেতনায়
১৯—১২	ঘনন	৬৭—২৩	মহোদধি	১৫২—৩	ভিত্তি
২০—৬	নিত্যবস্তু	৮৩=৪৫	আকর্ষিত	১৫২—২৭	ক্রিয়ান্বিত
২০—২৩	রিক্ততা	৯৩—১৮	কঠ-উপ	১৫৩—১	প্রথমাবধি
২১—২৮	মন	৯১—৯২	নিবিড়	১৫৩—৭	পারি
২৩—১৩	নহে	১০৬—৩	বরণীয়কে	১৫৪—২২	লিখিত খসড়া
২৪—১৮	জ্ঞান	১০৭—১০	আসক্তি	১৫৫—২	সহায়তা
২৪—২৪	গুণাগুণ	১০৭—১১	জল	১৫৫—২১	গিয়াছে
২৪—২৭	বস্তু	১০৮—২২	ধর্মীয়প্রতিষ্ঠা	১৫৬—৩	ধাবমান
২৫—২২	নিয়োজিত	১১০—৫	নহেন	১৫৮—২৯	অনুসারী
২৫—২৭	উদ্ভব	১১১—৭	সম্পদ	১৫৯—১২	প্ররোচনা
২৭—৪	শেষভূত	১২১—৮	নিত্যপ্রতিষ্ঠা	১৬১—২০	কালমেঘের
২৭—২৩	বিশ্বতোমুখ	১২১—২৯	অলৌকিক	১৬৩—১৮	উপনীত !
২৮—৬	তদ্রূপ	১২৩—২৩	বীজমন্ত্র	১৬৪—২	বন্দরের
২৮—২৭	ধাবিত	১৩৩—১৬	নিরূপণ	১৬৪—৩	যেন
২৮—২৮	মন	১৩৪—৩	অস্তিত্ব	১৬৪—১৩	অহং

"এ শুভলগনে জাগুক গগনে অমৃতবায়,
আমুক জীবনে নব জনমের অমল আয়ু।
জীর্ণ যা-কিছু, যাহা কিছু ক্ষীণ, নবীনের মাঝে হোক্ তা বিলীন,
ধুয়ে যাক্ যত পুরাণো মলিন, নব আলোকের স্নানে।"

উপহার

শ্রী——————————

মহোদয়কে; সমাদরের সহিত প্রদত্ত হইল।

পুস্তকে আলোচিত বিষয়, অন্তরকে পরিশুদ্ধ, যুক্তিবাদী, সত্যনিষ্ঠ ও কুসংস্কার মুক্ত রাখিয়া, অনন্তের অনুভব বোধের সহায়ক হইক

তারিখ——————। শ্রী——————

"লহো লহো তুলি লও হে, ভূমিতল হতে ধুলিম্লান এ পরাণ,
রাখো তব কৃপা চোখে, রাখো তব স্নেহ করতলে।
রাখো তারে আলোকে, রাখো তারে অমৃত,
রাখো তারে নিয়ত কল্যাণে, রাখো তারে কৃপা চোখে,
রাখো তারে স্নেহ করতলে।"

প্রকাশকের প্রশস্তি

দৈনিক জনপদ পত্রিকা অফিস — শ্রীশ্রীকৃষ্ণের পুষ্পদোলযাত্রা

আগরতলা (কৃষ্ণনগর) ত্রিপুরা — ১৩ জ্যৈষ্ঠ ১৩৯৮

শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভুর পঞ্চশতবর্ষ পূর্তি উৎসব উপলক্ষে গঠিত ত্রিপুরা রাজ্য কমিটি কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত, কার্য্যকরী সভাপতি শ্রীমোহিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, আমার আগ্রহে "শ্রীচৈতন্য আলেখ্য" নামে একটি তথ্যবহুল পুস্তক প্রণয়ন করেন। উক্ত গ্রন্থের মুখবন্ধে উল্লেখ করিয়া ছিলাম, এই লেখকেরই "আমি ও আমার ধর্ম" প্রকাশের বাসনা রইল। উক্ত অঙ্গীকারের মর্য্যাদা রক্ষায়, গ্রন্থকার অক্লান্ত অধ্যবসায়ে বেদ, উপনিষদ, গীতা প্রভৃতি হইতে যাথার্থ্য তত্ত্বাদি সংগ্রহ করিয়া এই পুস্তকটি রচনা করিয়াছেন। যেহেতু পাণ্ডিত্য, বিচার নৈপুণ্য, বিশ্লেষণ চাতুর্য্য, বর্ণনা মাধুর্য্য ও রসজ্ঞতার বিন্যাসে, জটিল দার্শনিক তত্ত্বসমূহ সুললিত ও সাবলীল, তাই আশা রাখি অতি আধুনিক যুগের আধ্যাত্মিক দুর্য্যোগ সময়ে, ভারতীয় আর্য্য সংস্কৃতি সম্পর্কে বইটি যথার্থ জ্ঞানবৃদ্ধির সহায়ক হইয়ামনের নিভৃতে আলোড়ন আনয়ন করিবে। কাল যে জীবিত ছিল, আজ হয়ত সে নাই, অথচ এই বিনাশশীল দেহটিকে আশ্রয় করিয়াই মানুষের কত আশা আকাঙ্খা, কত ভাবনাকল্পনা। এই দেহ ও দেহাতিরিক্ত সত্তা, কিবস্তু এবং তাহার স্ব-ধর্ম কি, তাহাই এই পুস্তকে আলোচ্য বিষয়।

উল্লেখ করা যায় যে,- চরাচর বিশ্বসৃষ্টির হাজার কোটি কোটি বৎসর পর নানা বিবর্ত্তনের মধ্যদিয়া ভূপৃষ্ঠে, ভূচর খেচর, জলচর জীব দেখা দেয় এবং মাত্র সাত হাজার বৎসর পূর্ব্বে সঙ্কলিত বেদগ্রন্থে, সৃষ্টিকর্ত্তার বিভিন্ন বিভূতি দেবতা-রূপে স্থান লাভ করে। তখন হইতেই চিন্তাশীল ঋষি চিত্তে প্রশ্ন জাগে, মরণশীল জীবন হইতে মুক্ত হইয়া অমরজীবন লাভের জন্য কাহার উপাসনা সঙ্গত। সুতরাং সমস্ত দেবদেবী এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মেরই প্রকাশ ও অভিব্যক্তি এবং তিনি সর্ব্বজীব হৃদয়ে সদা সন্নিবিষ্ট,- উপনিষদের এই অনুজ্ঞা অনুসারে, গ্রন্থকার পরমাত্মা পরমেশ্বর ব্রহ্মণ্যদেবকে ধ্যানরূপ উপাসনায় প্রতি গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন এবং সেই আত্মারাম পুরুষ হইতে মন বিচ্ছিন্ন হইলেই, জীবনে ঘটে দুঃখ বিষাদ,- ইহাই চিন্তা বৃত্তি ও মননের প্রাখর্য্যে এই পুস্তকে প্রতিপাদিত।

অগ্নিহীন স্থানে শুষ্ক কাষ্ঠ রাখিলে,যেমন তাহা জ্বলে না, তেমনি শাস্ত্রাদির মর্ম যথাযথভাবে হৃদয়ঙ্গম করিয়া জ্ঞানাগ্নি প্রজ্বলিত না করিলে, প্রার্থিত ফল লাভ হয় না। তাই আশা করিতে পারি, বিপুল প্রযত্ন ও অপূর্ব্ব কৌশলে, উপনিষদ গীতার জ্ঞানগর্ভ বিশ্লেষণ- বিদগ্ধ গুণানুরাগীপাঠক কর্ত্তৃক সমাদৃত হইবে। বেদোক্ত অগ্নি উপাসনা, বিশ্বের মূলশক্তি,- জ্ঞানস্বরূপ, প্রাণের প্রাণ, সর্ব্বব্যাপী পরমেশ্বরের

প্রতি আহুতিরূপ পূজা। হৃদয়ে জ্ঞানরত্ন সমাবেশকারী অগ্নিকে তাই বেদে বিশ্বের কল্যাণরূপী বিশ্ব পুরোহিত বলা হইয়াছে। মরমী অনুরাগীর জ্ঞানদীপ্ত অনুরাগে, গ্রন্থকার গভীর অর্থদ্যোতক সোমরস মহল্য ইত্যাদি বৈদিক পরিভাষার, যুগোপযোগী আলোকে অধ্যাত্ম ব্যঞ্জনার ব্যাখ্যা করিয়াছেন,- যাহা কৌতূহলী পাঠককে ভাবিত করিবে।

তন্ত্রোক্ত প্রতিমা পূজায় সংগতিক প্রথিত বস্তু লাভ হয় কিংবা ভগবৎ বিভূতির কল্পনা উদ্রেক করে। কিন্তু অতীন্দ্রিয় বুদ্ধিজাত ভাগবত জীবনের জ্ঞান লাভ করিতে হইলে, বেদনির্ভর উপনিষদ ও গীতার আলোকে পথ অনুসন্ধান করিতে হইবে। এই পুস্তকে তাহাই অনুসৃত হইয়াছে। প্রণিধানযোগ্য যে, অতি প্রাচীন কালে পাশ্চাত্য সভ্যতা যখন গভীর তমসায় আচ্ছন্ন, সেই যুগযুগান্তর ব্যাপী সময় হইতে ভারতের তপোবনে যে অধ্যাত্মপ্রদীপ জ্যোতির্ময় শিখায় প্রজ্জ্বলিত ছিল, বিজ্ঞান প্রভাবিত বহির্মুখীনতার প্রাবল্যেও, সেই মন্ত্রমালার প্রতি সুগভীর শ্রদ্ধা অদ্যাবধি হিন্দু মাত্রেরই ভক্তি অঞ্জলীতে দীপ্তিমান। নবযুবকদের মধ্যে এই শাশ্বত ব্রহ্মবিদ্যা প্রসারিত করিবারই প্রচেষ্টা করা হইয়াছে।

তরুণ বয়স হইতেই মোহিতবাবু ধর্মীয় প্রবন্ধ লেখায় উৎসাহী। প্রথম প্রকাশিত তাঁহার "অর্ঘ্য" পুস্তকের ভূমিকায় ডঃ মহানামব্রতব্রহ্মচারী লিখিয়াছেন,- "× × × পাঠক মনে মনে জিজ্ঞাসা করিবেন, আধুনিক যুগের উচ্চ ইংরাজী শিক্ষিত, সরকারী চাকুরীজীবি, বিশেষ কোঠার এই যুবক, এই সকল মহাতত্ত্ব-কথার মুক্তামণি কিরূপে আবিষ্কার করিল? এই প্রশ্নের উত্তর অভিজ্ঞজনের মুখ হইতে স্বতঃসিদ্ধের মত বাহির হইবে,- ইহা পিতৃপ্রভাব। মোহিতবাবুর পিতৃদেব নিত্যধামগত পুণ্যশ্লোক প্রিয়নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা না জানেন, এমন লোক আগরতলায় নাই। তিনি শুধু আইন ব্যবসায়ে অতিশয় প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াই, সকলের নিকট সুপরিচিত হইয়াছিলেন, তাহাই মাত্র নহে,- তিনি সকলের হৃদয়-ক্ষেত্র অধিকার করিয়া, সকলের সকলের পূজনীয় ও বন্দনীয় হইয়াছিলেন, তাঁহার ভজননিষ্ঠা ও ভক্তিশাস্ত্র সম্পর্কে সুনিপুণ ব্যাখ্যা দ্বারা। ভক্তিশাস্ত্রে তাঁহার অধিকার ছিল অপরিসীম। পিতার সাধ সম্পদ পুত্র উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করিয়াছে, × × ×।"

দ্বিতীয়গ্রন্থ "অর্ঘ্য ও প্রেম জিজ্ঞাসা" সম্পর্কে ত্রিপুরার প্রথম মুখ্যমন্ত্রী, শ্রী শচীন্দ্রলাল সিংহ মহাশয় উল্লেখ করিয়াছেন,-"০০০ শ্রীমান মোহিত কুমার ত্রিপুরার একটি বিশিষ্ট ধর্মপরায়ণ, সাহিত্যরসিক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করিবার সৌভাগ্যে গৌরবান্বিত। ০০০ তাঁহার স্বর্গত পিতৃদেব প্রিয়নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, একজন প্রতিভা

ধর পুরুষ ছিলেন এবং সেই প্রতিভা তাঁহার ওকালতী ব্যবসাক্ষেত্র মাঝেই সীমাবদ্ধ ছিল না। সাহিত্য, রাজনীতি, সমাজসেবা, ভক্তিশাস্ত্র ব্যাখ্যা, প্রতিটি ক্ষেত্রেই তাঁহার ক্ষমতা ছিল অদ্বিতীয়, প্রতিষ্ঠা ছিল প্রশ্নাতীত এবং প্রতিভার অভিব্যক্তি ছিল ক্ষুরধার। তাঁর পাণ্ডিত্যের সহিত যুক্ত ছিল ভক্তি, জ্ঞানের সহিত বিনয় এবং অনলস কর্মজীবনের সহিত মিলিত ছিল, প্রশান্তচিত্তের স্নিগ্ধ মাধুর্য্য। তিনি এমন মানুষ ছিলেন, যাঁহার জীবন হইতে অনেকে শিক্ষা আহরণ করিতে পারে, × × ×

তৃতীয় রচনা "শরণাগতি" গ্রন্থ প্রসঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত, উল্লেখ করিয়াছেন,-০ ০ ০ শিক্ষার্থীদের মধ্যে আধ্যাত্মিক চেতনা বিস্তার এবং একটি আদর্শ ছাত্র সমাজ গঠনে তাঁর আগ্রহ সুবিদিত। ০ ০ ০' সম্ভবতঃ মোহিত বাবুর প্রচেষ্টায়, তাঁহার ওকালতী জীবনের প্রাক্কালে, 'প্রগতি বিদ্যাভবন; প্রতিষ্ঠার প্রতিই তিনি ইঙ্গিত রাখিয়াছেন। ঐ শিক্ষা ক্ষেত্রে তিনিও ছিলেন, কিছু সময়ের সহকর্মী। মহৎকর্ম চতুর্থ পুস্তক "শ্রীচৈতন্য আলেখ্য" বিষয়ে, নিখিলভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের আচার্য্য ও সভাপতি ত্রিদণ্ডীস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ লিখিয়াছেন,- ০ ০ ০ যদি পরমারাধ্য শ্রীল শ্রীযুক্ত গুরু মহারাজ,আপনার মত গুণী ব্যক্তি পাইতেন, আপনার যৌবন কালে, তবে আপনার দ্বারা শ্রীমন্মহাপ্রভুর শুদ্ধ প্রেমভক্তির বাণী, অনেকের অপেক্ষা অধিক সুন্দরভাবে প্রচার করাইতে পারিতেন। × × × "

মোহিতবাবুর ভক্তিগ্রন্থ রচনা ও ধর্মীয় সভায় আবেগপূর্ণ বক্তৃতাদ্বারা ভাগবতীয় কথা প্রচারণা প্রসঙ্গে শ্রীগীতা হইতে সংযোজন, বোধ হয় বাহুল্য মনে হইবে না যে,- পূর্ব্বজন্মের পুণ্যকারী, বহু সুকৃতির ফলে সদাচার সম্পন্ন শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তির গৃহে অতি দুর্লভ জন্ম লাভ করিয়া,-অনুকূল পরিবেশপ্রাপ্তিতে প্রাক্তন জন্মার্জিত সংস্কার যথাযথ বিকাশে যত্নশীল হয়। এই লেখকেরই অপর পুস্তক 'কেন মোরে জয়ে তাপ ত্রয়' যথা কালে প্রকাশের কল্পনা রহিল। উল্লেখ করা যায় যে আমি ও আমারধর্ম রচনাটি। 'দৈনিক জনপদ পত্রিকার ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয় এবং ইতোমধ্যে ত্রিপুরার বিভিন্ন প্রান্তের 'জনপদের' পাঠক। পত্রিকা হইতে উৎসাহব্যঞ্জক পত্রাদি দপ্তরে পৌঁছিয়াছে। যিনি সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা, তাঁহাকে আপন অন্তরে প্রেমিক পুরুষরূপে উপলব্ধি করিয়া তাঁহার বাণী অপরের মর্ম স্পর্শ করে। "চলাচলমিদং সর্ব্বং কীর্তি যস্য স জীবতি"।

নিবেদক

শ্রীযতীন্দ্রকুমার মজুমদার

(সম্পাদক, দৈনিকজনপদ পত্রিকার)

7 Hindustan Road
Calcutta—29
21.5.91

সুহৃদবরেষু,

ভাই মোহিত, এক তাড়া 'জনপদ পত্রিকা' পেয়ে অবাক হলাম। তারপর তাই উল্টাতে গিয়ে, রত্নের সন্ধান মিলিল,—একেবারে মহারত্ন; সাথে 'আমি ও আমার ধর্ম' বইয়ের কয়েকটি প্রুফ ফর্মা। নিবিষ্ট মনে পড়তে সুরু করলাম,—সুদীর্ঘ সময় ধরে। বেদ, উপনিষদ, গীতা, পুরাণ শাস্ত্র, আর মহাকাব্য মহাভারত রোমন্থন করে, তার সারাৎসার সুকুমারময়, স্বচ্ছদৃষ্টির ও শাণিত যুক্তির বুদ্ধিবৃত্তিতে পরিবেশনার ব্যঞ্জনা বড়ই চিত্তগ্রাহী। রচনার পশ্চাৎপটে নিহিত অনুরাগ, অধ্যবসায়ের নিষ্ঠা, বহু প্রশংসার দাবী রাখে। তোমার পরিশ্রম, তোমার সাধনা, তোমার পক্ষে সার্থক হোক। আমার আন্তরিক অভিনন্দন গ্রহণ কর। বইটির পূর্ণপ্রকাশের ভবিষ্যতে.. প্রতি, সাগ্রহে প্রতীক্ষা করে রইলাম। × × ×
আশাকরি সকল বিঘ্ন দূর হয়ে বইটির সত্বর প্রকাশরূপ অরুণোদয়ে বিদগ্ধ পাঠকের মনোরঞ্জন করবে।

প্রীতিবদ্ধ—
হিতেন্দ্র কুমার রায়চৌধুরী

'শ্রীচৈতন্য আলেখ্য' পুস্তক সম্পর্কে লিখিত,ে
ড: শ্রীযুত অশোককুমার মিত্র, I.C.S লিখিত পত্রের প্রতিলিপি।

555 fodhpur park
Calcatta 700068
10.2.1988

শ্রদ্ধাভাজনেষু,

আপনার পাঠানো দুইকপি শ্রীচৈতন্য আলেখ্য এ খনি এসেছে। এই কাজ আপনার কতখানি ভক্তি ও নিষ্ঠার পরিচয়, তা আমার মত অভাজনের মুখে শোভা পায় না, তদুপরি আপনার পাণ্ডিত্য। পাণ্ডিত্য অনেকেরই থাকে। কিন্তু যে ভক্তি, নিষ্ঠা ও তন্ময়তায় পাণ্ডিত্য রসাপ্লুত হয়ে, সমস্ত মন ও আত্মাকে জারিত করে, তা আপনার আছে। আমি অতি শ্রদ্ধাসহকারে আদ্যোপান্ত পড়বো। আমার বিনীত নমস্কার জানবেন। ইতি

ভবদীয়
অশোক মিত্র

To
Shri Mohit K Banerjee
Krihnanagar Puran Kalibari Rood
Po. Agartala, Tripura, 799001

অধ্যাপক ডঃ কমলকুমার সিংহ, বাংলা বিভাগ, ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়

শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত মোহিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় দীর্ঘ পরিশ্রম ও অধ্যাবসায়ে বায়া তথ্য সমৃদ্ধ ও বিশ্লেষণ ধর্মী তাঁর 'আমি ও আমার ধর্ম' গ্রন্থটি লেখা ও ছাপাখানার হাত থেকে শেষ পর্যন্ত পূর্ণাবয়ব আকারে উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছেন জেনে আনন্দিত হয়েছি। পুস্তকটি সম্পর্কে তাঁর কঠোর শ্রম ও অধ্যাবসায় আমি দেখেছি, যে কোন লেখকের কাছে তা ঈর্ষার কারণ হবার যোগ্যতা রাখে—যা প্রেসের কর্মীদের কাছে হয়তো বা বিরক্তির কারণ হয়ে থাকতে পারে।

আজ এই অধর্মের যুগে নিজের পকেটখালি করে কেউ নিজের ধর্ম দেশবাসীকে বোঝানোর চেষ্টা করেননা। আজ ধর্ম যা প্রচারিত হয়ে থাকে তাও ব্যবসায়িক নিয়ন্ত্রিত দেয়ানেয়ার সম্পর্ক না থাকলে আজকাল ধর্মের আমদানীও হয়না। অবশ্য ধর্মের অর্থ যদি প্রত্যেকের কাছে পরিস্কার থাকে তাহলে কোন অসুবিধা হবার কথা নয়। ধর্মের পরিস্কার অর্থ আমি যা বুঝি তাহলো যা আমাকে ধারণ করে তাই আমার ধর্ম; অর্থাৎ আমার ব্যক্তি চরিত্র। আমার চারপাশে যে আবরণ আছে সে সম্পর্কে আমাকে অবহিত থাকতে হয় তাহলে, তাহলেই আমি বুঝতে পারতে পারি যে এই পঞ্চভূতের জগতে পঞ্চভূতের শরীর নিয়ে আমি কিভাবে আমার পৃথক অস্তিত্ব বজায় রেখে বেঁচে আছি। নাহলে তো আমিও কখন এক হয়ে যেতাম সেই বৃহৎ পঞ্চভূতের সঙ্গে। তা যে হতে পারছিনা তার কারণ আমাকে রক্ষা করছে আমার ধর্ম।

শ্রদ্ধেয় মোহিতবাবুর এই প্রবন্ধটি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হবার আগে দৈনিক জনপদ পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে বেরুতে থাকার সময়, পত্রিকার সম্পাদকের নামে আসা বেশ কয়েকটি চিঠি আমি দেখেছি। ত্রিপুরার প্রত্যন্ত অঞ্চলেও যে এর পাঠক আছেন এবং গভীর নিষ্ঠা সহকারে তা পাঠ করেন জেনে অবাক লেগেছিল। পত্রিকায় না বেরুলেই তারা চিঠি লিখতেন কারণ জানতে চেয়ে। একজন লেখকের কাছে এর চাইতে বড় পাওনা এবং বড় কিছু আর হতেপারে না।

নিজে আমি ধার্মিক কিনা জানিনা, অনেক ধর্ম সম্প্রদায়ের সঙ্গে যুক্ত, সকলের কথা জানতে আমার ভালো লাগে। শুনতে ভালো লাগে। কিন্তু নিজের দুর্ভাগ্য এখনো কারুর অনুগত হতে পারিনি। তবে নিজের ধর্ম সম্পর্কে আমি সচেতন, হয়তো মোহিতবাবুর মতোই। তাই সাহিত্যের লোক হয়েও ধর্ম সম্পর্কে একটা মতামত প্রকাশ করতে ভরসা পেলাম। হয়তো মোহিতবাবু এবং শ্রদ্ধেয় পাঠকরা আমার এইধৃষ্টতা সহ্য করবেন নিজগুণে।

২০মে ১৯৯১ইং— বিনীত— কমলকুমার সিংহ

আমি ও আমার ধর্ম

যো বা এতদক্ষরং অবিদিত্বা অস্মাৎ লোকাৎ প্রৈতি স কৃপণঃ

যে ব্যক্তি অক্ষরব্রহ্মকে না জানিয়া, ইহলোক হইতে প্রয়াণ করে,— সে পরদ্বারা ক্রীতদাসের ন্যায় দুঃখী। (বৃহ-উপ ৩।৮।১০)

"যে অলস চিন্তালতা, প্রচুর পল্লবাকীর্ণ ঘনজটিলতায় হৃদয়ে বেষ্টিয়া ছিল,—
তারি শাখাজালে, তোমার চিন্তার ফুল, আপনি ফুটায়েল;
নিগূঢ় শিকড়ে তার বিন্দু বিন্দু সুধা, গোপনে সিঞ্চন করি।"

পুস্তকের পূর্ব্বাভাষ

সর্ব্বক্ষণ জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে, আমরা কেবল সুখ বা আনন্দলাভের চেষ্টা করিয়া থাকি। কিন্তু এই সুখপ্রার্থী বা আনন্দাভিলাষী; কে বা কি বস্তু, তাহা অনুধাবন করিনা। শিশুকাল হইতেই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জড়দেহটি 'আমি' জ্ঞানে অভ্যস্ত বলিয়া 'আমি রুগ্ন' বা 'আমি সবল' এই প্রকার দেহাত্মবোধক বাক্য প্রয়োগের সহিত সবাই পরিচিত। পরন্তু 'আমি সুখী' কিংবা 'আমি দুঃখিত' বলিতে মানসিক ভাব সমূহকে লক্ষ্য করা হয়, যদিও ইহার অন্তর্বর্ত্তীর কথা ভাবনায় আসেনা এবং 'আমার হস্তপদ' অথবা 'আমার দেহ' বুঝাইতে শরীরীর কথা ভাবিনা,—দেহেন্দ্রিয়াদির সমষ্টিকেই 'আমি' ভাবিয়া বিভ্রান্ত হইতে হয়। একদিকে দেহটিকে 'আমার' বলা হয়, অপরদিকে অন্ধকার পথে পরিচিত ব্যক্তি পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে 'আমি' উচ্চারিত হয়;—যাহা পরস্পর বিরুদ্ধ বাক্য।

বস্তুতঃ পক্ষে দেহ সুস্থ থাকিলেও, মন অসুস্থ থাকিতে পারে,—যেহেতু একটি জড়পদার্থ এবং অপরটি জড়াতীত বস্তু। তাই দেহের সুখবিধান হইলেও, অন্তরে প্রসন্নতা আসেনা, যদি মন চঞ্চল বা বিষন্ন রহিয়া থাকে। আমার বসনভূষণাদি অবশ্যই আমি নহি, ইহা দেহের সাময়িক সম্পর্কিত বিষয়াদি মাত্র। যেমন গ্রীষ্ম ও শীতের গাত্রাবরণ আলাদা,—তেমনি বাল্য, কৈশোর, যৌবন কালে জীবাত্মার পরিচ্ছদরূপ বিভিন্ন দেহাবস্থা 'আমি' হইতে ভিন্ন এবং ক্ষণস্থায়ী। আমি বা জীবাত্মা দেহ হইতে স্বতন্ত্র সত্তা এবং অবিনশ্বর বিধায়, দেহরূপ আচ্ছাদন অবসানেও, তাহার অবলুপ্তি নাই। এই আত্মবোধ অনুভূত হইলে, আমার ধর্ম কি, সেই জিজ্ঞাসার জাগরণ হয়। এবং ইহাই বেদের 'নিজেকে জান' মহাবাক্যের অনুসরণ, যাহা ধর্মপথে পদক্ষেপের প্রথম সোপান।

পক্ষান্তরে আপনাকে জানা ও পাওয়া একই কথা নয়। শ্রুতিবাক্য অনুশীলনে তত্ত্ববস্তুর সংজ্ঞা অবগত হওয়া যায় মাত্র। কিন্তু তাহা অন্তরে উপলব্ধি করিবার দিশারী, ব্যক্তিবিশেষের রুচি বা ভাব,—যাহা জীবের সহজাত প্রবৃত্তি বা পূর্ব্বজন্ম

বাসনাবশে উদ্ভূত সংস্কার। সুতরাং পারিপার্শ্বিকতার প্রভাবে প্রায়শঃ জড়াশ্রয়ী বা ইন্দ্রিয়াদি নির্ভর বিচারবুদ্ধিকে, একটি ভাবসংশুদ্ধি বা উর্দ্ধমুখী প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করিতে, প্রথমেই প্রয়োজন 'আমি' শব্দটি কাহার উদ্দেশ্যে প্রযোগ হয় এবং ইহার স্বরূপ বা স্বভাব কি, তাহার অবধারণ। শ্রীমদ্ভাগবত একাদশস্কন্ধ দ্বিতীয়অধ্যায়ের সাইত্রিশশ্লোকে, বলা হইয়াছে,—অজ্ঞানভাবশতঃ দেহকে 'আমি' অভিনিবেশই দুর্মতির কারণ হইয়া থাকে,—অর্থাৎজড়দেহই আমি বা ইহাই আমার একমাত্র অস্তিত্ব, এই দেহাভিনিবেশই জীবের প্রধান ভ্রান্তি যাহা হইতে দেহের বিনাশেই আমিসত্বার চিরঅবসান এইরূপ ভয় উৎপন্ন হয়।

প্রণিধান যোগ্য যে, চৈতন্য বা জ্ঞান জীবাত্মার ধর্ম,—ইন্দ্রিয়াদি বিশিষ্ট জড় দেহের নয় এবং দেহমধ্যে প্রতিনিয়ত যে সুখদুঃখ, মান অপমান প্রভৃতি পরস্পর বিরোধ তরঙ্গ উত্থিত হইতেছে, তাহা দেহধারী জীবাত্মা কর্ত্তৃক অনুভূত। অগ্নি সংশ্লিষ্ট লৌহখণ্ড যেমন দাহিকা শক্তি স্পৃষ্ট হয়, সেইরূপ জীবাত্মার অবস্থানেই জড় দেহে চৈতন্যশক্তি ক্রিয়াশীল। তপ্তলৌহের উত্তাপ চলিয়া গেলে, তাহা যেমন আর দগ্ধ করিতে পারেনা,—তেমনি আত্মা কর্ত্তৃক পরিত্যাক্ত দেহ কিছুই অনুভব করেনা; নির্জীব পিণ্ডের মত পড়িয়া থাকে। সুতরাং যাহার অবস্থিতিতে ইন্দ্রিয়াদি কর্ম তৎপর এবং দেহ সচল, তাহাই জীবের আমি বাচক সত্তা বা জীবাত্মা।

এই অহংপদবাচ্য জীব, যখন শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ প্রভৃত ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বিষয়ব্যাপারে অভিনিবিষ্ট, তাহা স্থূলশরীর মাধ্যমে অভিব্যক্ত; বাসনাকামনা ইচ্ছাঅনিচ্ছা, ঈর্ষাদ্বেষ প্রভৃতি মানসিকভাব প্রকাশ সময়ে, সূক্ষ্মশরীর স্পন্দিত হয় এবং নিদিধ্যাসন বা পারমার্থিক ভাবনা স্ফুরিত হয়, কারণশরীরে; যেই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ক্ষেত্রেই জীবচৈতন্য বা জীবাত্মার অবস্থান। প্রদীপের সঠিক পরিচয় যেমন পরিস্কৃত চিমনীর মধ্যদিয়া উজ্জ্বল আলোক বিচ্ছুরণে; দেহস্থিত জীবাত্মার যথাযথ পরিচিতির অভিব্যক্তিও তেমনি পরিচ্ছন্ন 'আমি' মাধ্যমে, উচ্ছ্বস আনন্দের আবেগ কম্পনে।

"আমি চিনি না, জানিনা, বুঝিনা, তথাপি তাঁহারে চাই;
আমি সজ্ঞানে, অজ্ঞানে পরাণেরটানে, কার পানে ছুটে যাই।

'আমি-কে' তাহা হৃদয়ঙ্গম হইলে, জীবাত্মা বা আমার ধর্ম বা আচরনীয় কর্মকি এই চিরন্তন ধর্মজিজ্ঞাসা অন্তরে অনুরণিত হয়। কারণ চলমান জীবন হইতে সকল কেই একে একে চিরবিদায় নিতে হইবে; যেহেতু মৃত্যু প্রতিটি জীবেরই অনিবার্য্য পরিণাম। তাই জীবনকে সতত ধারণ করিয়া রহিয়াছে যেই চৈতন্যময় মহাশক্তি

আমি ও আমার ধর্ম

মানবমন আপন অজ্ঞাতসারেই তাঁহাকে জানিতে ও বুঝিতে চায়,—যাহা জীবন জিজ্ঞাসু ব্যক্তিমাত্রেরই স্বতঃ প্রণোদিত স্বভাবধর্ম। যদিও ভগবৎ প্রত্যয় সকলের সমান নয় এবং ধর্মাচরণের পদ্ধতিও স্থানকাল পাত্র ভেদে বিভিন্ন; তথাপি সমাজ জীবনে ধর্মকর্মের ভূমিকা অবশ্যই অপরিহার্য্য।

বহুমুখী প্রতিভায় প্রদীপ্ত বুদ্ধিবৃত্তি যখন বিকাশিত হইয়া, সাহিত্য, বিজ্ঞান, শিল্পকলা প্রভৃতি বিষয়ে উদ্বুদ্ধ হয়,—তাহা আত্মপ্রকাশের ধর্ম। যাহার অবিরত অনুশীলনে মানসিক মূল্যবোধ ও আত্মিক চেতনার উদ্ঘাটন ঘটিয়া, আধ্যাত্মিক অনুসন্ধিৎসা বিকাশ প্রাপ্ত; তাহা হৃদবৃত্তি প্রকাশের ধর্ম। সুতরাং ধর্ম কথাটির সাধারণ অর্থ করা যায়; অবস্থা যেমন পদার্থের ভৌত রাসায়নিক অবস্থা। পরন্তু যে অবস্থা অন্তরে স্থিতিশীল হইলে 'তত্ত্বজিজ্ঞাসা' জাগরিত হয়,—তাহা মানবমনের অধ্যাত্ম অবস্থা বা জীবের ধর্ম। ইহাই জিজ্ঞাসীতব্য।

মহাভারতে উল্লেখ রহিয়াছে, যাহাতে আপন আত্মা এবং অপরের জীবন ও সমৃদ্ধি বিধৃত হয়,-তাহাই সমাজ ধর্ম। মনুসংহিতায়, ধৃতি (ধৈর্য্য), ক্ষমা, দম (মনের স্থিরতা), অস্তেয় (অচৌর্য্য), শৌচ (শুচিতা), ইন্দ্রিয়নিগ্রহ;ধী, বিদ্যা, সত্য ও অক্রোধ,-এই দশটি আত্মিকধর্মের লক্ষণ বলা হইয়াছে। হারীতের মতে' যাহাতে আত্মার উন্নতি হয়; সেই শ্রেয়ো লাভের পন্থা অনুসরণ জীবনের ধর্ম। যাজ্ঞবল্ক বলেন, যাহা কুকার্য্য ও কলুষ হইতে চিত্তকে নিবৃত্ত করিয়া' জীবের কল্যাণ. জগতের হিতসাধন ও সৃষ্টিকে রক্ষা করিতেছে-সেই আদর্শ অবলম্বনই প্রাকৃতিক ধর্ম। বস্তুতঃ পক্ষে যাহাতে আত্মশুদ্ধি হয়; অপরের অপকার ভাবনা অপসৃত হয়'-সেই উচ্চ আদর্শ নির্ভর মানসিকতা অর্জন মানবধর্ম।

এই ধর্মচর্চা বলিতে মানুষের আত্মিক উন্নতি, তথা শ্রেষ্ঠ গুণাবলীর বিকাশ সাধনের শাস্ত্রবিহিত প্রচেষ্টাই সর্বতোভাবে গ্রহণীয়,-যাহা তপস্যা, নামে অভিহিত। তাৎপর্য্য এই-আমাদের শ্রোত্র' চক্ষুজিহ্বা ত্বক ঘ্রাণেন্দ্রিয় কেবল বাহ্য বিষয় ভোগে সতত লালায়িত, যাহা বন্ধনের কারণ হইয়া থাকে। তাই ইহাদের ভোগে লিপ্ত না হইতে তাড়না করা বা তাপ দেওয়াই তপস্যা। ক্ষুৎপিপাসা, শীত, উষ্ণ, সুখ-দুঃখাদি দ্বন্দ্ব সহনের দ্বারাই চিত্তবৃত্তিকে উত্তাপ দিয়া বহির্মুখী ভাবনা হইতে বিরত করা যায়,- অনবরত ইষ্টমন্ত্রজপ ও স্বাধ্যায় ইহার সহায়ক। পুরাকালে আত্মার এই শ্রেষ্ঠত্বলাভের জন্য, গার্হস্থ্য জীবনের পর আশ্রমে,- অর্থাৎ যেখানে মানসিক শ্রম করিয়া, জীবাত্মার উৎকর্ষ সাধনের আশ্রয় হইত সেই স্থানে বাস করিবার বিধান ছিল

(অবশিষ্ট অংশ ১৪৯ পৃষ্ঠা হইতে)

আমি ও আমার ধর্ম

প্রবঞ্চনা

"তাহারে জানিয়া জীব মরণ এড়ায়, অন্য পথ ভিন্ন আর নাহিক উপায়"

প্রতি দিবসের জীবনযাত্রায় 'আমি' ও 'আমার' শব্দ অনবরত ব্যবহার করিয়া থাকি। কিন্তু আপন অজ্ঞাতসারে প্রায়শঃ উচ্চারিত এই বাক্য, কাহার উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত হয়, সংসারের সংখ্যাতীত সমস্যা সমাধানের সংগ্রামে অবিরত জড়িত মানব মন, তাহার তত্ত্বানুসন্ধান করিতে তৎপর হয় না। ইহাই মানব জীবনের প্রধান প্রহেলিকা।

জগতের অজস্র যন্ত্রাদির ক্রিয়াকলাপ লক্ষ্য করিয়া, আমাদের দেহটিকে কতগুলি প্রকৃষ্ট অংশের যথাযথ সমষ্টির ক্রিয়া বলিয়া অনুমান করিতে প্রয়াসী হইয়া থাকি। মনে করি, যেমন বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের অভিপ্রায়ে নির্মিত যন্ত্রাংশ যথানুরূপ সন্নিবিষ্ট হইবার ফলেই, যন্ত্র ক্রিয়াশীল হয়, তেমনি যে জীবদেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি যথাস্থানে নিযুক্ত থাকিয়া জীব শরীর ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করিতেছে।

বস্তুতঃ মানুষের বুদ্ধি কৌশলেই, কোন এক নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য সমাধানের প্রকল্পে বিশেষ প্রকার যন্ত্র উদ্ভাবন, তাহা সেই প্রয়োজনে প্রস্তুত তাহা অতিরিক্ত কোন কাজ করিতে পারে না এবং যন্ত্রে কোনরূপ প্রাণের বা স্বয়ং বুদ্ধিবৃত্তির প্রকাশ নাই। অপিচ, ইহাতে আত্মরক্ষা, নিজস্ব উদ্দেশ্য সাধন, আত্ম নিয়ন্ত্রণ, আত্ম সংরক্ষণের ক্ষমতা নাই। পক্ষান্তরে মাতৃগর্ভে চৈতন্য সত্ত্বা মনুষ্য ভ্রূণে প্রতিষ্ঠিত হইলে, মানব দেহ নৈসর্গিক প্রণালীতে অপত্য হইতেই গঠিত হইতে থাকে। ভূমিষ্ঠ হইবার পর পারিপার্শ্বিকের প্রভাবে জীব দেহে বুদ্ধি বৃত্তি বিকশিত হয়। পক্ষান্তরে বিশেষজ্ঞ কর্তৃক সংযোজিত অংশসমূহ সহায়েই যন্ত্র সচল থাকে এবং ইহাকে বাহির হইতে পরিচালনা করিতে হয়। কিন্তু দেহ পরিচালনার দেহী, দেহাভ্যন্তরেই অধিষ্ঠিত থাকেন এবং তিনি অন্তর্হিত হইলে, দেহটিকে মৃত বলিয়া গণ্য করা হয়। সুতরাং যান্ত্রিক ক্রিয়ার সহিত দেহেন্দ্রিয়াদির তুলনা বিচার কখনও যুক্তিগ্রাহ্য নয়।

সদা জনগণের হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট দেহের চেতনা প্রদানকারী চৈতন্য পুরুষই প্রতিটি জীবের 'আমি'। পরিধেয় বা পরিহিত জামা কাপড় প্রভৃতির সহিত দেহের যেরূপ সম্পর্ক এই 'আমির' সহিত 'দেহের' সম্পর্কও অনেকটা সেইরূপ। তাৎপর্য এই, পরিচ্ছদাদি যেমন দেহের জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী হইলেও, তাহা দেহ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক বস্তু, দেহও তেমনি 'আমার' অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াদির প্রয়োজন সাধক প্রতিপালিত হওয়া সত্ত্বেও 'আমি' হইতে ভিন্ন। কিন্তু দেহ হইতে স্বতন্ত্র সত্ত্বা বিবেচিত হইলেও এই 'আমি' দেহের কোথায় কিভাবে, কোন্ প্রয়োজনে অবস্থিত, তাহাই অনুধাবনীয়।

সাধারণতঃ পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়, অর্থাৎ যেই ইন্দ্রিয়াদি সহায়ে বাহ্য বিষয়ের উপলব্ধি হয়, যথা, চক্ষু,কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্ এবং পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয়, অর্থাৎ যে সকল ইন্দ্রিয় বা তাহার শক্তি দ্বারা কর্ম সম্পাদন হয়, যথা বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ। এই দশটি 'বহিরিন্দ্রিয়' নামে অভিহিত এবং 'অন্তরিন্দ্রিয়' নামধেয় 'মন' সর্ব্বমোট এগারটি কার্যকরী ইন্দ্রিয়ের অবস্থান ক্ষেত্র দেহটিকেই ভ্রান্তিবশতঃ 'আমি' ভাবনা করিয়া, ইহার 'কর্ত্তা' বা পরিচালকের কথা বিস্মৃত হইয়া থাকি। প্রনিধানযোগ্য যে দৃষ্টির অগোচর 'মন' বা 'অন্তঃকরণ' একটি মাত্র ইন্দ্রিয় নির্দ্দেশ করিলেও, কার্যভেদে ইহার চার প্রকারের প্রকাশ পরিলক্ষিত হইয়া থাকে, যথা স্মৃতি,বুদ্ধি, অহঙ্কার, চিত্ত বা ভাবনা।

আমরা 'আমার হাত' কিংবা 'আমার মস্তক' উল্লেখে দেহ সম্পর্কিত কোন দেহাংশ নির্দ্দেশ করিয়া, সমগ্র শরীর বা হস্তপদাদি বিশিষ্ট অবয়বটিকে 'আমার দেহ' স্থির করি। কিন্তু 'আমার' বলিতে তাহার পরিচালক 'আমি' বস্তুটি কি এবং জীব শরীরে কি প্রকারে তাঁহার স্থিতি ও অন্তর্দ্ধান, তাহা নিরুপণ করিবার আবশ্যকতা মনে আসে না। কারণ জাগ্রত অবস্থায় যে সকল জ্ঞান হয় অথবা অনুভূতি আসে, তাহার বহিঃ প্রকাশ ইন্দ্রিয়াদির ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া ফলে এই দেহেই ঘটিয়া থাকে এবং যে সকল কর্ম সম্পাদন করি কিংবা যাহা কিছু বাক্যে প্রয়োগ করা হয় তাহাও দেহের মাধ্যমেই কৃত হইয়া থাকে। তাই দেহটিকেই 'আমি' বলিয়া ভ্রম হয়। কিন্তু দেহের বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি পরস্পর সমান শক্তিশালী নয় এবং প্রতিটির ক্রিয়া প্রণালীও ভিন্ন প্রকার। অধিকন্তু সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবে গঠিত দশটি ইন্দ্রিয়, পৃথক পৃথক প্রয়োজনে নিয়োজিত হইয়া থাকে, যাহার কার্যকারিতা একটির সহিত অপরটির সম্পূর্ণরূপে সাদৃশ্য বিহীন। সুতরাং দেহ বা ইন্দ্রিয়াদিকে 'আমি' মনে করা যুক্তি সঙ্গত হইতে পারে না।

দশটি বহিরিন্দ্রিয়ের ক্রিয়াকলাপ বাহিরের বিষয়বস্তু নির্ভর করিয়া প্রকাশ পায় বলিয়া, আমরা ইহাদিগের কর্মপ্রণালী সহজেই বুঝিতে পারি। কিন্তু অন্তরেন্দ্রিয় বা 'মন' দৃশ্যতঃ কোন কাজের সহিত সরাসরি যুক্ত নয় বলিয়া তাহার ক্রিয়া কর্ম প্রত্যক্ষ করিতে না পারিলেও, অপরোক্ষ অনুভূতিতে ইহার অস্তিত্ব অনুভব করা যায়। কারণ সর্ব্ব প্রকার মননের মূলে রহিয়াছে 'মন' এবং এই ইন্দ্রিয়টি যোগ না দিলে, অপর ইন্দ্রিয়গুলি কর্মক্ষম হইতে অপারক হয়। তাই মনকে অপর ইন্দ্রিয় সকলের 'কর্ত্তা' বা দেহের 'পরিচালক' বলা হইয়া থাকে। কিন্তু স্বভাবতঃই চঞ্চল, অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের অগোচর, অতি সূক্ষ্মবস্তু 'মন' একই সময়ে বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়ায় যোগ দিতে কিংবা অধিকক্ষণ একই বিষয়ের প্রতি মনোনিবেশে নিমগ্ন থাকিতে না পারিলেও, তৎক্ষণাৎ এক বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে চলিয়া যাইতে পারে।

আমি কি বস্তু, ইহা নির্দ্ধারণ করিতে, প্রথমেই 'মন' নামক অন্তরিন্দ্রিয়টির বিশ্লেষণ আবশ্যক। প্রত্যেক ব্যক্তিরই একটি স্বতন্ত্র মন আছে, যাহা তাহার পক্ষে বাহ্যবস্তুর ও বিষয় ব্যাপারের এবং চিন্তা ও ভাবপ্রকাশের যন্ত্রস্বরূপ। আমাদের বিভিন্ন ইন্দ্রিয়াদির প্রত্যেকটিই পৃথক কর্মে নিযুক্ত এবং প্রতিটি ইন্দ্রিয় একটি নির্দিষ্ট কার্য্য নির্ব্বাহের উপযোগী ভাবে গঠিত। চক্ষু ইন্দ্রিয় দ্বারা কেবল দেখিবার কাজ হয়। কর্ণ সদা তৎপর শুধু শব্দ বাক্যাদ শুনিবার জন্য, নাসিকা নিযুক্ত, শ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়া নির্ব্বাহে ও বিভিন্ন গন্ধ অনুভবের ব্যাপারে, জিহ্বা বাক্য উচ্চারণে ব্যবহৃত ও রস আস্বাদনের সহায়, ত্বক, কোন কিছুর স্পর্শ অনুভব সম্পর্কে সংবেদনশীল। এই পাঁচটি বহিরিন্দ্রিয় আপনাপন কর্ম সম্পাদন করিয়া চলিলেও, তাহার বহিঃপ্রকাশ জন্য একে অপরের প্রতি নির্ভরশীল।

চক্ষু কেবল দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া চাহিয়া দেখিতেই সক্ষম, সেই দৃষ্টবস্তু হইতে কোন শব্দাদি উদ্ভূত হইতেছে কিনা, শুনিবার কাজ কানের, নাসিকা বস্তুর গন্ধ উপলব্ধি করিয়া থাকে, জিহ্বা মুখ গহ্বরে প্রবিষ্ট দ্রব্য নাড়াচাড়া করিলেও তিক্ত বা মিষ্টরস আস্বাদ করিবার সময়, তাহা কি জাতীয় বস্তু হইতে উৎপন্ন বা কি রকম মিশ্রণের সৃষ্টি অথবা কি প্রকার রসদ্রব্য, তাহা নির্ণয় করিতে পারে না। ত্বক কোন কিছুর উষ্ণতা, শীতলতা, কিংবা তীক্ষ্ণতা রুক্ষতা অনুভব করিতে পারে। কিন্তু এই অনুভূতির মূলে কোন বস্তুর সংস্পর্শ বিদ্যমান, তাহা মনুষ্য, পশু কিংবা জড়দ্রব্য, তাহার নিশ্চয় বুদ্ধি স্পর্শেন্দ্রিয়ের নাই।

কর্মেন্দ্রিয় সম্পর্কেও একই মন্তব্য প্রযোজ্য। বাগেন্দ্রিয় কেবল বাক্যসমূহ বিস্তার করিতে সমর্থ, কিন্তু এই বাক্য কেন, কিসের প্রয়োজনে উচ্চারিত, ইহার অর্থপদ বা তাৎপর্য্য, তাহার জ্ঞানগম্য নয়। পদদ্বয় কেবল পাদচারণ করিতে পারে, কিন্তু কি অভিপ্রায়ে পাদ-চারী, কোথায় গমন করিতে হইবে, সেই সম্পর্কে তাহার কোন ধারণা নাই। হস্তদ্বয় অবিরত কর্ম করিয়া চলিয়াছে, কিন্তু কোন্ কর্ম কি পদ্ধতিতে বা কিভাবে সম্পাদন করিতে হইবে, এবং কেই বা তাহা করাইতেছে, সেই প্রসঙ্গে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। এই তত্ত্বের সমাধান নির্দ্ধারণ, যাবতীয় ইন্দ্রিয়াদির পরিচালক বা সংযোগ রক্ষাকারী, অতিরিক্ত অন্তরিন্দ্রিয় 'মন' ভাবনায় আসিয়া পড়ে।

'আমি আছি' এই অনুভূতির মূলে মনেরই সংবেদন। 'মন' জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্মেন্দ্রিয়ের প্রবর্ত্তক বা প্রেরণা প্রদানকারী অথবা ইহাদের ক্রিয়াশীল হইবার সহায়। জীবের জীবন যাত্রা নির্ব্বাহের পথে বিভিন্ন ইন্দ্রিয়াদি যে সকল জাগতিক বিষয় ব্যাপার বা বস্তুসমূহের সম্মুখীন হইয়া পড়ে 'মন' সেই সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ইন্দ্রিয় বিশেষকে উদ্বুদ্ধ করিয়া নানা কর্মে ব্যাপৃত রাখে। পরন্তু বিভিন্ন জীবের বিচিত্র সংস্কার অনুযায়ী গঠিত 'মন' পৃথক পৃথক রুচি অনুসারে, বিষয় বিশেষের প্রতি আকৃষ্ট হয় কিংবা উপেক্ষা করিয়া থাকে। ইহা

প্রণিধান যোগ্য যে, মন দ্বারা নির্দ্দেশিত না হইলে, কিংবা মনের সম্মতি না পাইলে, যে কোন ইন্দ্রি ই কার্য্যকর বা উদ্যোগী হইতে পারে না। পক্ষান্তরে মনের অনুমোদন বা অনুসরণ আসিলেও, উদ্দিষ্ট কর্ম যথাযথভাবে অথবা তৎপরতার সহিত নির্ব্বাহ করা, নির্ভর মনেরই বিশেষ প্রকাশ বুদ্ধি বৃত্তির উপর। বিষয়টি গ্রহণ যোগ্য, না পরিত্যাজ্য, উহা এক্ষণি সম্পাদন করিতে হইবে, কিংবা বিলম্ব প্রয়োজন অথবা কি কৌশল অবলম্বন করিতে হইবে,-তাহার ইতি কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ বুদ্ধির সহজাত ক্রিয়া কিংবা অভিজ্ঞতা লব্ধ বিবেচনার উপর নির্ভরশীল। 'মন' যদি কখ ও বিপথগামী হইবার পথে পড়, সংস্কারানুযায়ী 'বুদ্ধি' তাহার হিতাহিত বিবেচনা করিয়া, মনকে উক্ত বিষয় হতে নিবৃত্ত করিতে, বিরত থাকিতে অথবা দৃঢ় মনঃ সংযোগ প্রবৃত্ত হইতে প্রেরণা প্রদান করে। কারণ বুদ্ধি বৃত্তি জীবের পূর্ব জন্মের কর্মানুসারী হইয়া থাকে। এবং মনের সহিত বুদ্ধির সংযোগ না হইলেই কর্মে সদুদ্যোগ আসে।

চক্ষু দ্বারা নিকট বর্ত্তী বস্তু সমূহ দেখা যায়। কিন্তু দৃষ্ট বস্তুর প্রতি মনের যোগ না ঘটিলে, দৃষ্টি পথে পতিত বস্তু, বিশেষ কিংবা নিকটে আগত কোন ব্যক্তি দৃষ্টিগোচর হয় না,-মন ছাবাছাবির মত প্রতিভাত হয়। অধিকন্তু দৃশ্যমান বিষয় বস্তুর প্রতি মনের যোগ ঘটিলেও, তাহা কি বস্তু, বা উহার স্বরূপ কি,-ইহার নির্দ্ধারণ করা বুদ্ধির ক্রিয়া। অশান্ত চিত্তকে শান্ত করিতে, বুদ্ধিই অগ্রগামী হয়। মনকে বিকাশিত করে 'বুদ্ধি', মন সহসা চঞ্চল বা বিচলিত হইয়াছিল,-এই বোধ বা অনুভব, নির্ণয় করে, তাহা মন হইতে নিশ্চই পৃথক সত্ত্বা হইবে। কারণ দ্রষ্টা বা অনুভবকারী, দ্রষ্ট বস্তু অনুভূত বিষয় হইতে অবশ্যই পৃথক। আমি আমাকে দেখি,-এই ক্ষেত্রে দর্শক ও দৃশ্য পদার্থ পরস্পর আলাদা।

অধিকাংশ ক্ষেত্রে নয়ন সম্মুখে এমন অনেক কিছু আসিয়া পড়ে, তৎক্ষণাৎ তাহার জাতি বা পরিচয় উপলব্ধি করা সম্ভব হয় না, যেমন সহসা গরুর পাল নজরে পড়িলে, তন্মধ্যে কোনটি গাভী তাহা বুঝিতে পারা যায় না। কারণ দৃষ্টি শক্তির কাজ কেবল তাকাইয়া থাকা বা দৃষ্টিপাত করা। সেই ক্ষেত্রে মন দৃষ্টি গোচর অনেক অপ্রয়োজনীয় বিষয় হইতে প্রয়োজনীয় বিষয়ের প্রতি দৃষ্টিশক্তিকে নিবদ্ধ করে। তখনই উক্ত বস্তুর প্রতি দর্শনক্রিয়া প্রসারিত হয়। কিন্তু উহাই প্রার্থিত বিষয়, কিংবা দর্শনীয় বস্তু, অথবা দেখার অযোগ্য বোধে দৃষ্টি সরাইয়া লওয়া প্রয়োজন কিনা,-তাহা নির্দ্ধারণ করে 'বুদ্ধি'।

কর্ণে কোন শব্দ শ্রুত হইলে, মন তৎপ্রতি আকৃষ্ট হয় এবং মনের প্রবণতাবশে শব্দ আসার পথ অনুযায়ী চক্ষুর দৃষ্টি সেই দিকে, বিস্তৃত হয়। বহু দূরবর্ত্তী স্থান হইতে আগত হইলে, হয়ত ধ্বনিবুরের উৎসস্থল দেখা যায় না, তখনই 'বুদ্ধি' স্থির করে শব্দটির উৎপত্তি স্থল কোথায় হইতে পারে এবং তাহা কোন্ বিষয় হইতে উদ্ভূত [illegible] চলিত

থাকিলে কর্ণ কলরব শুনিয়া নিস্পন্দিত নেত্র কেবল দেখিয়াই যায়। 'বুদ্ধি' নিশ্চয় করে, কোনটি করণীয় বা বিবাহের পাত্র। পক্ষান্তরে অপ্রাসঙ্গিক ব্যাপার, বীভৎস বা অশ্লীল দৃশ্য দেখিতে 'মন' ইচ্ছুক হইলে, অবস্থা বিচারে 'বুদ্ধি' নিরস্ত করিতে পারে।

সুতরাং মনকে দেহস্থিত ইন্দ্রিয়াদির পরিচালক বা 'আমি' বলা যায় না। দেহ ও তৎসংলগ্ন ইন্দ্রিয়াদি বিস্তৃত সম্পন্ন। কিন্তু মনের কোন রূপ বিস্তার ঘটে না। চিন্তা, অনুভূতি ও ইচ্ছার ক্রিয়ার অভিব্যক্তি অনুধাবন করিয়াই মনের আলাদা অস্তিত্ব অনুভব করা হয়। পরন্তু এই অনুভবিতা, মন হইতে পৃথক। ইনি চৈতন্যস্বরূপ, এবং 'আমি' পদবাচ্য। দেহ যান্ত্রিক পদ্ধতিতে চালিত। 'মন' জন্মান্তরীণ সংস্কারানুযায়ী উদ্দেশ্য বা আদর্শ অনুসারে নিয়ন্ত্রিত। উন্মাদ রোগগ্রস্ত ব্যক্তির সুখ দুঃখ অনুভবের মানসিকতা থাকিলেও হর্ষ বিষাদের যথাযথ কারণ নির্ণয়কারী বোধশক্তি নাই। কারণ সুখদুঃখ অনুভব করে 'মন' এবং ইহার বিচার বিবেচনা 'বুদ্ধির' ক্রিয়া। 'মন' বিষাদগ্রস্ত বা ভারাক্রান্ত হইলে 'বুদ্ধি' তাকে প্রশান্তি আনিতে চেষ্টা করে। কাজেই মনের গতি প্রকৃতি নির্দ্ধারণ কিংবা মনোবৃত্তির নিয়ন্ত্রণ অথবা মনঃস্থিত জটিলতার সম্ভাব্য সমাধান 'বুদ্ধির' বিবেচনা প্রসূত নির্দ্দেশের অপেক্ষা করে। তাই অপর কোন শক্তির উপর নির্ভরশীল 'মন' যাবতীয় ইন্দ্রিয়ের তথা দেহের কর্ত্তা নয়।

ছাত্র যখন 'মন' সংযোগ করিয়া অধ্যয়ন করে, তাহার মূলে 'বুদ্ধি'র প্রেরণা বিদ্যমান থাকে। অর্থাৎ পরীক্ষায় কৃতকার্য হইবার বুদ্ধিযুক্ত উদ্দেশ্যই, তাহাকে অত্যধিক অধ্যয়নে অনুপ্রাণিত করে। এই ক্ষেত্রে মনের ক্রিয়া গৌন। বুদ্ধির প্ররোচনাই মুখ্য। মনের ক্রিয়া যান্ত্রিক কর্ম্মের ন্যায় উদ্দেশ্যবিহীন। চালিত করিলেই চলিতে থাকে,- যাহা দেহেন্দ্রিয়াদির নিয়ত প্রতিক্রিয়া দ্বারা অন্তরে প্রতিফলিত হয়। এই কারণেই ব্যক্তি বিশেষের মানসিক গঠন অনুযায়ী, স্বভাবতঃ চঞ্চল ও সংস্কার নির্ভর 'মন' ভালমন্দ, শুভাশুভ, ইচ্ছানিষ্ট সকল প্রকার বাহ্যিক ব্যাপারেই অন্ধবেগে ধাবিত হইয়া থাকে। উহার হিতাহিত অবধারণ করা, বুদ্ধির ক্রিয়া হইলেও 'বুদ্ধি' মনের কার্য্য করিতে পারে না। অপিচ, সকলের বুদ্ধি সমান নয়। কাহারও বুদ্ধি স্থূল। কেহ সূক্ষ্ম বুদ্ধির অধিকারী। মন কেবল পঠনে মনোনিবেশ করিতে পারে। কিন্তু পঠিত বা অধীত বিষয় পাণ্ডিত্য সহকারে হৃদয়ঙ্গম করা মেধা বা স্থির বুদ্ধির কাজ। পক্ষান্তরে 'মন' যদি অকল্যাণের পথ অনুসরণ করে কিংবা লেখাপড়ায় অমনোযোগী হয়,- সেই ক্ষেত্রে 'বুদ্ধি' বিচার বিবেচনা করিয়া তৎ বিষয়ে মনকে নিশ্চেষ্ট করিতে এবং পড়াশুনায় নিবিষ্ট করিতে পারে। কাজেই মন ও বুদ্ধির ক্রিয়া পরস্পর বিভিন্ন এবং নিজ নিজ বৃত্তি প্রকাশের ক্ষেত্রে, একে অপরের প্রতি নির্ভরশীল নয়। কারণ সবল মন বুদ্ধির ক্রিয়া উপেক্ষা করিতে পারে এবং বুদ্ধি প্রখর না হইলে, মনের ক্রিয়াকে প্রভাবিত করিতে পারে

না। কাজেই বুদ্ধিবৃত্তিকে 'আমি' বা দেহেন্দ্রিয়ের পরিচালক বলা যায় না। জাগ্রতকালে সুখদুঃখ অনুভব হয়। হিতাহিত বিবেচনা করা যায়,- ইহাতে বুদ্ধির ক্রিয়া লক্ষিত হইলেও, নিদ্রাকালে তাহার প্রকাশ নাই। তখন বুদ্ধিবৃত্তি,- রাগদ্বেষ, বিচারবিবেচনা বোধ লোপ পায়। কাজেই 'বুদ্ধি' অবশ্যই কোন কিছুর নিয়ন্ত্রণাধীন স্বীকার করিতে হয়।

আহার করিতেছি, বুঝাইতে দেহের ক্রিয়া ভাবনায় আসে। চিন্তিত হইয়াছ, উল্লেখে, দেহাতিরিক্ত 'মন' মনে পড়িয়া যায়। বিচারবিবেচনা করিয়া ইতিকর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ কালে 'বুদ্ধি' প্রয়োগ হয়। কোন কিছু স্মরণ করিতে 'মস্তিষ্ক' পরিচালিত হয়। লোকটি জীবিত, বলামাত্র দেহাশ্রিত প্রাণবায়ুর অবস্থিতি অনুভব আসে। কিন্তু ইহাদের কোন একটিও 'আমি' কিংবা দেহের পরিচালক গণ্য হইতে পারে না। ইহাদিগের প্রত্যেকেই কিংবা প্রত্যেকের সম্মিলিত ক্রিয়াকেও কোন এক পরিচালক কর্ত্তৃক পরিচালিত হইতে হয়,- যেমন যন্ত্র চালু কিংবা বন্দ করিতে যন্ত্রীর হস্তক্ষেপ অবশ্যই আবশ্যক। যাহা অচেতন যন্ত্র হইতে নিশ্চয়ই পৃথক এবং তাহা অবশ্যই সচেতন সত্ত্বা।

স্থূলদেহের ভিতর প্রাণের ক্রিয়া চলাকালীন, দেহ কর্ম্মোপযোগী হইলেও, প্রাণ দেহের কর্ত্তা বা মুখ্য পরিচালক গণ্য হইতে পারে না। কারণ নিদ্রিত অবস্থায় প্রাণ ক্রিয়াশীল থাকিলেও, দেহের কোনরূপ কর্ম চাঞ্চল্য প্রকাশ পায় না,- চক্ষু দেখে না। কাণ শোনে না। নাসিক ঘ্রাণ গ্রহণ করে না। জিহ্বা অসাড়, ত্বক অনুভূতিহীন। অধিকন্তু প্রাণের বিদ্যমানতা বশতঃ দেহ জীবিত অবস্থায় রহিয়াছে, নির্দ্দেশ করিলেও, প্রাণ ইন্দ্রিয়াদির কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিতে পারে না। সবল ও প্রাণযুক্ত দেহের মন, আনন্দে শোকে বা নেশায় বিহ্বল হইয়া পড়িলে, দেহেন্দ্রিয়াদি অভিভূত অবস্থায় অবস্থান করে। মস্তিষ্ককেও 'দেহের কর্ত্তা' বলা যায় না। মৃতদেহে অটুট মস্তিষ্কের অবস্থান থাকা সত্ত্বেও, দেহ নীরব নিথর, নিশ্চল এবং অনুভূতি হীন।

প্রাণ ও মস্তিষ্কের মিলিত শক্তিও দেহের কর্ত্তা স্বীকৃত হইতে পারে না। কারণ জ্ঞান-বুদ্ধির সহিত মস্তিষ্ক ক্রমে পুষ্ট হয়। কোন ক্ষেত্রে অধিক প্রতিভা সম্পন্ন হয়। পক্ষান্তরে কাহারও মস্তিষ্কের বিকৃতিও ঘটে। বার্দ্ধক্যে বহু লোকের মগজের ক্রিয়া স্তিমিত হইয়া আসে। কেহ বা বাহাত্তুরে বলিয়া গণ্য হয়। মস্তিষ্ক চালনা করিয়া অধীত বা মুখস্ত করা বিষয় এখন স্মরণে আসিতেছে না। এরূপ যে ভাবে, বা অনুভব করে সেই শক্তিমত্তা মস্তিষ্কের ক্রিয়া হইতে পৃথক সুতরাং মস্তিষ্কও কাহারও দ্বারা পরিচালিত হইবার অপেক্ষায় থাকে।

ইন্দ্রিয়াদির সম্মিলিত শক্তিকেও 'আমি'বা দেহেন্দ্রিয়ের পরিচালক বলা যায় না। কারণ কল্পনা, স্মৃতি, চিন্তা প্রভৃতি মানসিক প্রক্রিয়াসমূহ, ইন্দ্রিয় নির্ভর নয়। কোন ইন্দ্রিয় নষ্ট কিংবা বিকল হইয়া পড়িলেও, চিন্তা কল্পনা প্রভৃতি মানসিক কার্য চলিবার পক্ষে কোন বাধা

হয় না। অন্তরিন্দ্রিয়কেও 'আমি' কিংবা দেহের নিয়ন্তা বলা সঙ্গত হইতে পারে না। কারণ 'মন' অনুপরিমাণ বলিয়া প্রত্যক্ষ্য যোগ্য না হইলেও, সুখদুঃখ, আশা নিরাশা প্রভৃতি মানসিক গুণগুলি প্রত্যেকেরই প্রত্যক্ষীভূত এবং 'মন' ইহাদের অনুভবকারী নয়। 'মন' ব্যথিত বা উদ্বিগ্ন অথবা বিষয়ভোগে বিমুখ কিংবা বিমুগ্ধ বলিলে, মনের এই অভ্যন্তর অপর কেহ বুঝিতেছে, তাহাই সিদ্ধান্ত হয়।

সমগ্র ইন্দ্রিয়বর্গের একীভূত চেতনার অবিরাম প্রবাহ বা হর্ষ বিষাদ, বাসনা কামনার নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল মানসিক প্রক্রিয়ার ধারাকেও 'আমি' বলা যায় না। কারণ সতত পরিবর্ত্তিত মনোগত এই তরঙ্গের ঘাত প্রতিঘাত কোন ঘটনার পূর্ব্ববর্ত্তী কিংবা পরবর্ত্তী অর্থাৎ কোনরূপ স্মৃতির অবগাহন, ইন্দ্রিয় নিজে তাহা বুঝিতে পারে না। ইহার নিজ নিজ নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মে ব্যাপৃত। দেহেন্দ্রিয়াদির সহিত প্রাণশক্তি যুক্ত হইবার ফলে উদ্ভূত চৈতন্যকেও 'আমি' বলা যায় না, যেহেতু কোন স্থিরকৃত, অচঞ্চল আধারকে আশ্রয় না করিয়া চেতনার জাগরণ সম্ভব নয় এবং ইন্দ্রিয়াদি পুষ্ট কিংবা জীবনীশক্তির বৃদ্ধি হইলেই, মন শক্তি সমৃদ্ধ হয় না। ক্ষীণপ্রাণ বা দুর্ব্বল ইন্দ্রিয়বিশিষ্ট ব্যক্তি অনন্যসাধারণ ব্যক্তিত্বের অধিকারী এবং মনীষাসম্পন্ন হইতে পারে। সুতরাং মনের উৎকর্ষ প্রাণক্রিয়ার উপর নির্ভরশীল নয়। প্রাণ দেহটিকে সজীব রাখে মাত্র।

আমাদের দ্বিধাদ্বন্দ্ব, ইচ্ছা অনিচ্ছা, প্রবৃত্তি নিবৃত্তি, সুখদুঃখ, রাগদ্বেষ প্রভৃতি অনুভূতি অনুরূপ বাহিরের সংঘাতে কর্মশীল। কোন কিছু প্রীতিজনক বোধ হইলে' সেই বিষয়ের প্রতি অভিরুচি উন্মুখ হইয়া পড়ে। সুখপ্রদ ভাবিলে, তাহা লাভ করিতে অভিলাষ হয়। দুঃখদায়ী মনে করিলে, তাহা তৎক্ষণাৎ বর্জ্জন করিতে তৎপরতা আসিয়া যায়। কিন্তু কোন বিষয় বা পরিস্থিতি সুখপ্রণোদিত কিংবা দুর্দশাদায়ক, তৎসম্পর্কে তথনই সঠিক সিদ্ধান্ত স্থির করিতে, অতীত অভিজ্ঞতার স্মৃতি অনুসরণ আবশ্যক হইয়া পড়ে। অর্থাৎ এই বস্তু বা ঘটনার সাদৃশজনক কোন বিষয়ে কিংবা অনুভবনীয় পদার্থে, সুখ কিংবা দুঃখ ভোগ হইয়া থাকিলে, সেই পূর্ব্বানুভূত বিষয়ের জ্ঞান বা ভাবনার অনুবর্ত্তন অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট বিষয় ব্যাপারে উন্মুখ অথবা বিমুখ হই। সুতরাং বিষাদ অবসাদ, হর্ষ উল্লাস, খ্যাতি অখ্যাতি, লাভঅলাভ ইত্যাদি পরস্পর বিরোধী অতীত অনুভূতি বা বোধকে যে স্থায়ীভাবে স্মৃতিতে ধরিয়া রাখে, সেই বস্তু কোন এক অনির্ব্বচনীয় 'নিত্যবস্তু' হইতে হইবে এবং বিনাশশীল, সতত পরিবর্ত্তিত, বিষয়-সংস্পর্শে বিক্ষুব্ধ ইন্দ্রিয়বর্গ কোনমতেই ঐ নিত্যসত্ত্বা বলিয়া গ্রাহ্য হইতে পারে না।

যদিও ইন্দ্রিয়াতীত, অথচ ইন্দ্রিয়াদির অনুভবযিতা এই নিত্যবস্তুকে, ইন্দ্রিয়াদির সহায়ে জানিবার উপায় নাই,-কিন্তু যখন বলি 'আমি আছি' তখন দেহাতিরিক্ত কোন 'শুদ্ধ সত্ত্বা'



বক্তব্য

সম্পর্কে, এক স্বতঃ প্রবৃত্ত জ্ঞান অন্তরে সঞ্চারিত হয়। দৃষ্টি পথ পতিত বাহিরের কোন বস্তু দেখিয়া, উহার আকৃতি কিংবা গতিবিধি প্রভৃতি লক্ষ্য করিয়া, যেমন ঐ সকল লক্ষণ দিয়া তাহার পরিচয় ও সংজ্ঞা নিরূপণ করি। তেমনি ইচ্ছা, সুখ, দুঃখ প্রভৃতি গুণগুলির বাহ্যিক অভিব্যক্তি অবধারণায়, এই মানসিক প্রক্রিয়া নিশ্চয়ই কোন দেহাতিরিক্ত স্বাধীন সত্ত্বা হইতে উৎসারিত, এরূপ অনুমান করিতে পারি। ইন্দ্রিয়াদিকে নিশ্চল করিয়া চিত্তের স্থিরস্থিতিতে আরূঢ় হইলে, অন্তরের অন্তর্যামী, সেই নিত্যবস্তুর অবিরাম অবস্থিতি উপলব্ধি করা যায়,- যেই অনুভূতির মূলেও এই চৈতন্যপুরুষের স্থিতি এবং জীবের 'আমি' সংজ্ঞাটিও তিনিই উপাশ্রয়।

'আমি ইচ্ছা করি' কিংবা 'আমি উদ্বিগ্ন' ইত্যাদি স্বতঃ উচ্চারিত দৈনন্দিন উক্তি পর্য্যালোচনায় কিংবা ইন্দ্রিয় নিরপেক্ষ কোন আকস্মিক অন্তর প্রেরণার অনুধাবনায়, ইহা নিশ্চিতরূপে অনুভব করা যায় যে,- দেহাতিরিক্ত অথচ দেহেন্দ্রিয়াদির পরিচালক কোন চৈতন্যসত্তার অস্তিত্ব এই জীব দেহতেই অবস্থিত। যদিও শারীরিক কিংবা মানসিক অবস্থাভেদে ব্যক্তিগত অনুভবের ব্যতিক্রম ঘটে, কিন্তু ব্যক্তিত্বের সচেতনতা কখনও লুপ্ত হয় না। অর্থাৎ যে ব্যক্তি শিশুদেহ, যুবকদেহ অতিক্রম করিয়া বৃদ্ধত্বে উপনীত, তাহার পরিবর্ত্তিত দেহের প্রতি 'আমি' অনুভবের অন্যথা হয় না। 'নিদ্রিতছিলাম' নিদ্রাভঙ্গের পর এই অনুভব,- নিদ্রাকালে ক্রিয়াহীন ইন্দ্রিয়াদির ইঙ্গিত হইতে পারে না। সময়বিশেষে আমাদের নানাবিধ অভিজ্ঞতা হয়। কিন্তু সেই অভিজ্ঞতার বিভিন্নতার সহিত, চৈতন্যসত্তার অর্থাৎ চর্চা বা বহুদর্শিতা দ্বারা লব্ধজ্ঞান ধারকের কোন পরিবর্ত্তন ঘটে না। তাই পৃথক পৃথক ঘটনার ও অবস্থার পরিবর্ত্তনশীলতার দর্শক এবং তাহা স্মৃতিতে সংগ্রাহক,- কোন এক অপরিবর্ত্তিত, নিত্যস্থির, আধ্যাত্মিক তত্ত্ববস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়।

অগ্নিশিখা যেমন চঞ্চল। নদী জলধারা গতিময়। বীজ অঙ্কুরিত হইয়া ক্রমশঃ বৃক্ষে, লতায় পরিণত। ফুল যেমন ঝরিয়া পড়িবার জন্যই ফোটে। গ্রীষ্মের দাবদাহের পরই, বর্ষার ধারাপাত, শরতের স্নিগ্ধতাকে অতিক্রম করিয়া আসে, শীতের রিক্ততা। তারপর দেখা দেয় বসন্তের পরিপূর্ণতা, নবকিশলয়ের আগমন,- তেমনি জগতের পার্থিব বস্তুই পরিবর্ত্তনশীল। জীবদেহও জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত অবিরতই পরিবর্ত্তিত হইতেছে। এবং সাথে সাথে ইন্দ্রিয়াদির উৎকর্ষ, অপকর্ষ, ঘটিতেছে। সুখদুঃখ, হর্ষবিষাদ কতনা অনুভূতির উপলব্ধি হইতেছে। ইচ্ছাচিন্তা, বাসনাকামনা, অন্তরে অহরহ আবর্ত্তিত হইয়া চলিয়াছে। এই মানসিক ধারা বা দৈহিক কর্মপ্রবাহের সাক্ষীস্বরূপ যেই শক্তি দেহেন্দ্রিয়াদির ক্রিয়া নিরপেক্ষ হইয়া জগণের হৃদয়ে সদা সন্নিবিষ্ট এবং ইন্দ্রিয়াদিকে নিজ নিজ কর্মে প্রবৃত্ত থাকিবার প্রেরণা দাতা। তাহা দেহাতিরিক্ত একটি অদ্বিতীয় সচেতন পদার্থ,- যাহা ভিন্ন ভিন্ন দেহে পৃথক

রূপে অবস্থান করে এবং ব্যষ্টি জীবের পূর্ব্বজন্মকৃত কর্মানুযায়ী বুদ্ধিরূপে ব্যক্ত হইয়া যথার্থরূপ কর্মপথে পরিচালিত রাখে। এই তত্ত্বজ্ঞানের অধ্যাপনাতে অন্তরে অধিষ্ঠিত চৈতন্যাত্মার অস্তিত্বের প্রতি আস্থা আসে।

বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ প্রভৃতি মানসিক অবস্থাগুলি সেই গুণ বা ধর্ম। অথবা বিশেষ কার্যোৎপাদিকা শক্তি। কোন আলম্বন ব্যতীত কিংবা প্রেরণা প্রদানকারী ছাড়া, ইহাদের প্রকাশ নাই বলিয়া যে বস্তুতে এই গুণগুলির আশ্রয় এবং যাহার স্থিতিতেই ইন্দ্রিয়াদি কর্মচঞ্চল, তাহাই জীবদেহে নিত্যপদার্থ নামে অভিহিত। এই 'জীব চৈতন্য' দেহের সহিত সংশ্লিষ্ট নহে, অথচ দেহের চেতনা প্রদানকারী।

দেহ বুদ্ধিহীন ও চৈতন্যবিহীন, ইহা জড়পদার্থ বিশেষ। কিন্তু দেহে অধিষ্ঠিত এই নিত্যবস্তুর বুদ্ধি ও চৈতন্য রহিয়াছে। এই বস্তু ইন্দ্রিয় নয়। কারণ ইন্দ্রিয়াদি ভৌতিক পদার্থ এবং পঞ্চভূতাত্মক দেহের মাধ্যমে ক্রিয়াশীল। ইহা মন নহে, মন ইন্দ্রিয় বিশেষ, যাহা 'অন্তরিন্দ্রিয়' নামে অভিব্যক্ত। ইনি জ্ঞাতা, কর্ত্তা, ভোক্তা এবং চৈতন্যস্বরূপ। কিন্তু চৈতন্যশীলতা তাঁহার অবিচ্ছেদ্য লক্ষণ নয়। দেহে অবস্থানকালেই, ইন্দ্রিয়াদির মাধ্যমে চেতনাশক্তি প্রকাশিত হয় এবং এই শক্তি দেহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলে, তাহা শবদেহ কথিত হয়।

চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণ যদি নিজেরাই নিজেদের চেতনাকারী হইত, তবে পূর্ব্বদৃষ্ট বিষয় বা অতীতের অনুভব, ঐ সকল ইন্দ্রিয়ের অভাবে কোন মতেই স্মরণে আসিত না। তাৎপর্য্য এই চক্ষু কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণ, যদি স্ববিষয়ের অনুভবকারী হয়,-তবে যে চক্ষুদ্বারা কোন ঘটনা প্রত্যক্ষ করা হইয়াছে, কিংবা যে কর্ণদ্বারা কিছু শ্রবণ করা গিয়াছে, অথবা যে হস্তদ্বারা বিশেষ কর্ম নির্ব্বাহ হইয়াছিল, ঐ সকল ইন্দ্রিয় সমূহের অবিদ্যমানতায়, অর্থাৎ উহা বিকল কিংবা নষ্ট হইলে, বিগত সময়ের দৃষ্ট, শ্রুত, কৃত প্রভৃতি ক্রিয়া বা পূর্ব্বানুভূত বিষয়ের জ্ঞান কিছুতেই স্মরণ হইত না। সুতরাং কোন নিত্যচৈতন্য পদার্থের উপস্থিতিতেই ইন্দ্রিয়বর্গ ক্রিয়াশীল ও তাহার অনুপ্রেরণাতেই নিজ নিজ কর্ম তৎপর। সেই নিত্যবস্তুই সকল কিছুর অনুভবিতা, সর্ব্বকর্মের অনুমন্তা, যাবতীয় দৈহিক মানসিক ব্যাপারের সতত সাক্ষী, সনাতন পুরুষ। যেমন মানবগণ জীর্ণবসন ত্যাগ করিয়া, পৃথক পরিচ্ছদ পরিধান করে,-তেমনি দেহস্থিত এই চৈতন্যসত্ব, কর্মফল ভোগে অক্ষম দেহ পরিত্যাগ করিয়া, নূতন দেহে প্রবেশ করে।

অন্তরিন্দ্রিয় 'মন'কেও স্মৃতির ধারক বলা যায় না। কারণ এইক্ষণে অচঞ্চল, পরক্ষণেই চঞ্চল, বিকারী মনের এই ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া, মনের পক্ষে মনে রাখা সম্ভব না। যেহেতু 'মনে' অণু বা অতি সূক্ষ্মবস্তু এবং অণুর প্রত্যক্ষজ্ঞান থাকিতে পারে না। তাই জ্ঞানকর্ম, সুখদুঃখাদির অনুভব, বিকারশীল মনের ক্রিয়া নহে। কোন সুগন্ধীবাসিত বসনে যেমন সেই সৌগন্ধ

সংক্রামিত হইয়া, তাহার স্বর সৌরভ বলিয়া ভ্রম হয়, তেমনি দেহস্থিত নিত্যচৈতন্য বস্তুর দ্বারা অন্তরে সঞ্চারিত হইয়া, দুঃখক্লেশ, আনন্দ আহ্লাদকে মানব বিক্রিয়া বোধ হইলেও, বস্তুতঃ পক্ষে সেই নিত্যবস্তুই তাহা অনুভব করিয়া থাকেন এবং তিনিই অনুভূতির উৎসমূল। কাজেই কাহারও মন নিষ্ক্রিয় পর্যন্ত হইলেও সুখদুঃখের অনুভূতি অব্যাহত রহিয়া যায়,- যেহেতু এই চৈতন্যপুরুষ মনেরও পর্য্যবেক্ষক এবং তৎসম্বন্ধে আমাদের অন্তরও চিন্তা, দৈহিক ক্রিয়াবস্থা মানসিক ক্রিয়া বিশেষ হে। পক্ষান্তরে বহির্জগতের নানা ঘটনার তরঙ্গাঘাতের তৎপ্রবাহে প্রতিক্রিয়া, আমাদের অন্তরে আপনা হইতেই নানা সংবেদনা জাগাইয়া তুলিতেছে,- যাহা কখনও আমাদিগকে উৎসাহিত করে কিংবা [illegible] রাখে। যেহেতু বহির্বিশ্বের এই ভাব সমূহের প্রতিক্রিয়া অন্তরে আন্দোলনকারী ছাপ স্পষ্ট, অথচ ইন্দ্রিয়াদি নিরপেক্ষ, তাই যাঁহার উপর এই ভাবতরঙ্গ ক্রিয়াশীল বা পর পর যাহার ছাপ, অর্থাৎ সংস্কারের প্রতিচ্ছায়া প্রতিফলিত, তাহা কোন সচেতন নিত্যবস্তু।

জড়দেহে চৈতন্যধর্ম নাই। মৃত্যু হইলে দেহটি অবিকল পড়িয়া থাকিলেও, তাহাতে আনাদি থাকে না; ইন্দ্রিয়াদির ক্রিয়াও দেখা যায় না। কারণ যিনি জ্ঞানশক্তির ধারক এবং ইন্দ্রিয় ক্রিয়ার প্রবর্ত্তক, তখন তিনি দেহ হইতে অন্তর্হিত। উল্লেখযোগ্য যে, মৃত্যু পথযাত্রীর সর্বেন্দ্রিয় নিশ্চল হইয়া পড়িলেও, "আমি মরণোন্মুখ" এই বোধের অভাব হয় না। সুতরাং 'আমিআছি' কিংবা 'আমাকে অনুভব করি' এই যে স্বতপ্রবৃত্ত আত্মপ্রত্যয় কিংবা স্বতঃসিদ্ধ অনুভূতি, ইহা দেহের ধর্ম নয়। 'আমি' অর্থাৎ যে জানে এবং 'আমাকে' অর্থাৎ যাহাকে জানিতে হইবে,- এই ক্ষেত্রে "জ্ঞাতা আমি" এবং "জ্ঞেয় আমাকে" উভয়ই একবস্তু, যাহা নিত্যবস্তু এবং দেহেন্দ্রিয়াদির ক্রিয়ার অনুভবকারী তথা স্মৃতির ধারয়িতা বিধায়, কোন ইন্দ্রিয় সহসা বিকল কিংবা মনের ক্রিয়া অব্যবস্থিত হইয়া পড়িলেও, অনুভবের অভাব অথবা স্মৃতিশক্তির বিপর্য্যয় ঘটে না। অধিকন্তু মস্তিষ্ক স্তম্ভিত বা কোন বিষয় বস্তুর বিস্মরণ হইয়াছিল, ইহা যে বোধ করে, সেই পদার্থ বা শুদ্ধসত্ত্ব দেহেন্দ্রিয়াদি হইতে পৃথক বিধায়,- দেহের বিকারে আত্মার বিকৃতি নাই।

লোকের কর্মানুসারী বুদ্ধি হয়। সংস্কারের অনুযায়ী কর্ম বিশেষে অভিরুচি আসে এবং জন্মান্তরীণ কর্মফল ভোগের আগামী ইহজন্মে যথোপযুক্ত দেহলাভ ঘটে। পূর্ব্ব জন্মের সংস্কারাদি, যাহা প্রবৃত্তি বা ঝোঁক রূপে জন্মান্তরের সাথী হইয়া থাকে,- তাহা নিত্যবস্তুতে আহিত কিংবা প্রতিষ্ঠিত থাকায়, জীবের কর্মফল ভোগ যথানিয়মে যথাযথ সংঘটিত হয়। যেমন দেহের বাল্যকাল, যুবাকাল যথাকালে আগত হয়, তেমনি যথাসময়ে কর্মসূত্র প্রভাবে সংস্কার উদ্বুদ্ধ হইয়া ভাল কিংবা মন্দ কর্মে জীবকে নিয়োজিত করে এবং জীবনে সুখদুঃখ, সঙ্কট বিপদ, সফলতা বিফলতার আবর্ত্তন সৃষ্টি করিয়া চলে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের কর্মবিপাক,-অর্থাৎ

কৃতকর্মের ফলভোগ ইহজন্মে জাতি, আয়ু, আকৃতি ও রোগশোক প্রভৃতি ভাগ্যগত অদৃষ্ট রূপে ব্যক্ত হয়। ইহার ভোক্তা 'আমি'র কোনরূপ ব্যতিক্রম হয় না। একই 'আমি' নানা প্রকার দেহ পরিগ্রহণ করিয়া জন্ম জন্মান্তরের পথ পরিক্রমা করে।

এই 'আমি'তে পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে অনুষ্ঠিত পাপ পুণ্যাদি কর্ম্মের ছাপ বা দাগ এবং পূর্ব্বজন্ম বাসনা বা ঝোঁক, সহজাত প্রবৃত্তি বা বুদ্ধিরূপে, নবজন্ম লাভের সাথেই প্রকাশ পাইতে থাকে। যেহেতু পূর্ব্বজন্মের সংস্কার 'আমি' রূপ নিত্যসত্তার বা জীবাত্মার সংলগ্ন ছিল, জন্মসহ উৎপন্ন সেই সংস্কার বিবশেই অবোধ শিশু,- দুঃখের কারণ হইলে কাঁদিতে থাকে। কাহারও ক্রোড় হইতে পড়িয়া যাইবার সম্ভাবনা দেখিলে, কোন কিছু বা ব্যক্তিকে ভয়ে জড়াইয়া ধরিবার প্রয়াস পায়। তৎক্ষণাৎ উল্লাস বা আনন্দের কারণ ঘটিলে, হাস্য প্রকাশ করে। ক্ষুধার উদ্রেক হইলে, মাতৃবক্ষ অনুসন্ধান করিয়া স্তন্য দুগ্ধ পান করে,- এই প্রক্রিয়া বা কৌশল প্রয়োগ কোনমতেই ইহজন্মের অভিজ্ঞতা অনুসারী নয় এবং অবশ্যই তৎ- পূর্ব্ব অনুভব অর্থাৎ জন্মান্তরীণ পূর্ব্বলব্ধ জ্ঞানের অভিব্যক্তি, যাহা অতীত জন্ম হইতেই চির আমি রূপ সত্তায় সূক্ষ্মরূপে অবস্থিত রহিয়াছে। কারণ ক্ষুধা নিবারণের জন্য স্তন্য পান প্রয়োজন, জল নহে,- এই নিশ্চিত জ্ঞান সদ্যজাত শিশুর পক্ষে, পূর্ব্বজন্মের সংস্কারের ধারক এবং বাহক, 'আমি'র বা স্বীয় নিত্যসত্তার উদ্দীপনা ব্যতীত উদ্ভাসিত হইতে পারে না। সুতরাং প্রতিটি দেহের পৃথক ব্যক্তি সত্তায় অবস্থিত কোন নিত্যপদার্থই দেহেন্দ্রিয়াদির 'কর্ত্তা' বা পরিচালক এবং শরীর তাহার 'করণ' অর্থাৎ ব্যবহারিক ক্রিয়া - সাধনের উপকরণ বা যন্ত্রবিশেষ,- ইহাই প্রতিপাদিত হয়। এই চৈতন্যপুরুষ বা দেহেন্দ্রিয়াদির অধিপতি, জীবদেহে 'আমি' নামে পরিচিত।

স্বতন্ত্র অবস্থার চেতনাবিহীন, বিভিন্ন শ্রেণীর অণু পরমাণুর নানাপ্রকার রাসায়নিক মিলনে গঠিত মস্তিষ্ক ক্রিয়াশীল হয়। ইন্দ্রিয় জ্ঞান, মানসিক বিকাশ, বুদ্ধি প্রয়োগ, বিচারবিবেচনা, চিন্তাধারা, প্রীতিপ্রণয়, ঈর্ষা বিদ্বেষ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়বৃত্তি, জ্ঞানবৃত্তি, হৃদয়ানুভব বৃত্তির কার্য্যগুলি প্রকাশ পায় মনে করিলে,- অন্য সাধারণ ব্যক্তির ইন্দ্রিয় ক্রিয়া, চিত্তবিশ্লেষণ, চিন্তাশক্তি প্রভৃতি উচ্চস্তরের মানবীয় চিত্তবৃত্তির কার্য্যাবলীর আকস্মিক অস্তিত্বপূর্ব্ব কোন উদ্ভাবনের কারণ নির্ণয় করা অসম্ভব হয়। পড়ে এবং মনীষাসম্পন্ন বা তীক্ষ্ণধী ব্যক্তিবিশেষের সঙ্গীতে কিংবা গণিতে অথবা দর্শন শাস্ত্রে অসাধারণ নৈপুণ্যের সঙ্গত ব্যাখ্যা নির্দ্ধারণ হয় না। সুতরাং পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের যে সকল অসামান্য সাধনার সংস্কার দেহাতিরিক্ত কোন নিত্যসত্তায় অভিজ্ঞতা ও প্রবৃত্তিরূপে বিদ্যমান ছিল, তাহাই নবজন্মলাভের পর অনুকূল পরিবেশ প্রাপ্তিতে পরিস্ফুট হইতে থাকে এবং সেই চৈতন্যশক্তি যাহা কোন দেহে অনাচ্ছাদিত বা সম্যক প্রকাশিত, জীবদেহে তাহার অস্তিত্ব ব্যতীত মানুষে জ্ঞান বুদ্ধির তারতম্য বা

পার্থক্য অবধারণ করা যায় না। এই চৈতন্যসত্তাই মানবশরীরে 'আমি' বা 'অহং' ভাবে রূপায়িত। এবং তাহারই অভীপ্সায় দেহেন্দ্রিয়াদি ক্রিয়াশীল, ইহাই সঙ্গত সিদ্ধান্ত হয়।

নাসিকার গন্ধবহা নাড়ীর গতিবিধি অবগত হওয়া যায়,- কর্ণকুহরে শব্দতরঙ্গের ক্রিয়া অনুভব করা যায়,- কিন্তু বাহ্যপদার্থের জ্ঞান সঞ্চালনকারী বহুবিধ শিরা উপশিরা দেহাভ্যন্তরে কম্পন সৃষ্টি করিয়া, তাহা মস্তিষ্ক পদার্থের গোচরে প্রতিফলিত করে,- এইরূপ অনুমান ধারণায় আনিলেও, তাহার প্রতিক্রিয়াতেই মনোবুদ্ধির কার্য্য নিষ্পন্ন হয়, প্রীতিবিদ্বেষের ব্যাপার ঘটে, ইহা প্রমাণিত হয় না। কারণ স্নায়ুতন্তুগুলি, সবই ব্যতিক্রম রহিত, একই নির্দ্ধারিত নিয়মে ক্রিয়াশীল এবং ইহাদের কোন একটি স্থানচ্যুত কিংবা অভিঘাতপ্রাপ্ত হইলে নির্জীব ও ক্রিয়াহীন হইয়া পড়ে। অধিকন্তু দর্শন, শ্রবণ প্রভৃতি ব্যাপারে চক্ষু কর্ণাদির চিত্তের সহিত যোগ না হইলে, দৃশ্যবস্তু বা শব্দাদি উপস্থিত থাকিলেও, তাহার প্রত্যক্ষজ্ঞান উপজাত হয় না। চিত্ত যখন ধ্যানমগ্ন। কিংবা মন অন্যমনস্ক সেই সময় নিকটবর্ত্তী বস্তুও দৃষ্টিগোচরে আসে না। অথবা অদূরে শ্রুতশব্দ কিংবা কোলাহল হইতে উৎপন্ন, তাহা বোধগম্য হয় না। চিত্ত বিষয় বিশেষে অনাসক্তিশূন্য বা সম্পর্ক বিবর্জিত হইলে, তাহাও জ্ঞানের অগোচরে রহিয়া যায়। দেহেন্দ্রিয়াদির ক্রিয়া, বাহ্যিক বিষয়ের সম্পর্কজ্ঞান লাভের সহায়কারী যান্ত্রিক পদ্ধতি বিশেষ। ইহাদের বিচার বিবেচনা নাই। দেহস্থিত অথচ দেহাতিরিক্ত চৈতন্যবস্তুই জ্ঞানময় এবং অভিজ্ঞতা সঞ্চয় ও বিষয় প্রকাশের কর্ত্তা।

ক্ষীণদৃষ্টির সহায়কারী কাচ বা চশমা, যেমন নিজে কিছু দেখিতে বা উপলব্ধি করিতে পারে না। কেবল দুর্ব্বল দর্শনশক্তির সহায়তা করে মাত্র,- তেমনি ইন্দ্রিয়াদি প্রত্যক্ষ জ্ঞানলাভের সহায়ক হইলেও, তাহা জ্ঞানবান নয়। দেহেন্দ্রিয়াদির চেতয়িতা, নিত্য চৈতন্যবস্তুই জ্ঞাতা, জ্ঞানবান, জ্ঞানপ্রদাতা। কোন বস্তুর রসগুণ রসনেন্দ্রিয় বা জিহ্বা দ্বারা উপলব্ধি করা যায়। কিন্তু সেই বস্তুর রূপ বা আকৃতি নির্ণয় করিতে দৃষ্টিশক্তির ক্রিয়া আবশ্যক। যদিও রস ও রূপ উভয়ই গুণ বিশেষ, তথাপি বিভিন্ন গুণের তাৎপর্য্য বিশ্লেষণ জন্য পৃথক ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া, অর্থাৎ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও দর্শনেন্দ্রিয়ের কার্য্যকারিতা প্রয়োজন। অধিকন্তু আস্বাদিত 'রস' কিংবা 'দৃষ্টবস্তু' যদি পূর্ব্ব অনুভবের বিষয়ীভূত না হয়, তবে বুদ্ধিও তাহার গুণাগুণ স্থির করিতে পারে না। কোন কিছু ইহজন্ম অনাস্বাদিত কিংবা অদৃষ্টপূর্ব্ব হইলেও, কোন এক অজ্ঞাতশক্তির প্রেরণা যেন ইহার ইষ্টানিষ্ট কিংবা প্রিয়অপ্রিয় সম্ভাবনা নির্দ্ধারণ করিয়া দেয়। এই প্রেরণাপ্রদানকারীই দেহগত 'নিত্যবস্তু' যাহাতে পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত অভিজ্ঞতার সংস্কার স্থাপিত রহিয়াছে। তাই সদ্যপ্রসূত শিশুর স্তন্য পানাভিলাষ, হংসশাবকের জন্মের পরই জলে সন্তরণের পটুতা, দুগ্ধপোষ্য নবজাতকের হর্ষ, ভয় প্রভৃতি অজ্ঞাতপূর্ব্ব ভাবের স্বতঃ অভিব্যক্তি।

ত্বক বা গাত্রচর্মের কো স্থানে বেদনাবোধ হইলে, কিংবা ঔষধ প্রয়োগে দেহের স্থান বিশেষ অবশ করিলে, অথব শরীরের কোথাও কণ্টক বিঁধিলে, কোনও অঙ্গুলীতে ছেঁকা লাগিলে, অন্য অংশ ইহা অনুভব করিতে পারে না। কিন্তু ক্ষণকালের জন্য হইলেও, দেহের কো স্থান অসাড় কিংবা যন্ত্রণাদায়ক হইয়াছিল-, ইহা যে স্মরণ করে, তাহা দেহাভ্যন্তরস্থ 'নিত্য চৈতন্যপুরুষে' ইনি প্রেম ও প্রসন্নতার নিত্য নির্ব্বাহিনীরূপ জনগণের হৃদয়দেশে অবস্থিত। প্রাণের মধ্যে তিনি বিজ্ঞানময়। হৃদয়ে অন্তর্জ্যোতি পুরুষ। তিনি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম হইলেও, তাঁহার অবস্থানজনিত চৈতন্যগুণের ব্যাপ্তিতে সমস্ত দেহব্যাপী কার্যসম্পন্ন হইয়া থাকে। যেমন গন্ধ তাহার আশ্রিত বস্তু হইতে অন্যস্থানে ব্যাপ্ত হইতে পারে,- কিংবা গন্ধপুষ্পের নিকটবর্ত্তী অপ্রাপ্তিস্থলেও সেই পুষ্পের সুগন্ধ পাওয়া যায়, তেমনি হৃদয়ে অধিষ্ঠিত এই চৈতন্যবস্তুর গুণ দেহের সর্ব্বত্র প্রসারিত হইয়া থাকে। পুষ্প হইতে প্রসৃত গন্ধাদি যেমন উক্ত পুষ্পেরই প্রতীতি জন্মায়, তেমনি একদেশস্থিত চৈতন্যের সর্ব্বশরীরে ব্যাপ্তি হইয়া থাকে প্রজ্ঞাবদ্বারা শরীরে সমারূঢ় হইয়া, চৈতন্যগুণের দ্বারা ইন্দ্রিয়গণের জ্ঞানশক্তি গ্রহণ পূর্ব্বক, ইনি সারথির ন্যায় দেহরূপ রথকে সচল রাখিয়া পরিচালনা করিতেছেন। দেহাভিমানী 'আমি' বা ব্যষ্টি আত্মা ইহারই প্রতীক।

ইন্দ্রিয়বর্গ স্থূলদেহের অপেক্ষা কার্যকারিতায় শ্রেষ্ঠ বিবেচিত হইলেও, সূক্ষ্মক্রিয়া বিবেচনায় 'মন' ইন্দ্রিয়গণের তুলনায় প্রধান বলিয়া গণ্য হয়। পক্ষান্তরে 'বুদ্ধি' বা বিচার শক্তিকে সর্ব্ব প্রধান বলা হইয়াছে। তাৎপর্য্য এই ইন্দ্রিয়াদির আপনা হইতে ক্রিয়াশীল হইবার যোগ্যতা বা সুযোগ নাই। কারণ ইহারা মনের প্রবর্ত্তনার অপেক্ষায় থাকে। 'মন' ইন্দ্রিয়সমূহের প্রবর্ত্তক বলিয়া, যাহা কিছু চিত্তে উদিত হয়, কিংবা ভাবনায় আসে,- অথবা প্রয়োজন উপলব্ধি হয়,- 'মন' তৎসমুদয়ের বাহ্যিক অনুষ্ঠানের জন্য, কর্মেন্দ্রিয়বর্গকে যথাযথভাবে প্রবর্ত্তিত করিয়া অভিলষিত কর্মে প্রবৃত্ত বা নিবৃত্ত করে। জ্ঞানেন্দ্রিয়াদি মনের সম্মুখে যে বিষয় সকল স্থাপন করে,- 'মন' তৎসম্পর্কে ইতিকর্ত্তব্য স্থির করিয়া,- অর্থাৎ এক্ষনি কি করা উচিত তাহা ভাবিয়া, কোন একটি বা একাধিক কর্মে হ্রয়কে তাহা সম্পাদন করিতে প্রবর্ত্তিত বা ক্রিয়াশীল করে।

কোন ক্ষেত্রে কর্মনির্ব্বাহ করিবার সময়, যদি কিছু ভুল, ভ্রান্তি কিংবা সন্দেহ দেখা দেয়, অথবা হঠাৎ প্রতিকূল পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটিয়া, কিংবা বিকল্প ভাবনা উপস্থিত হইয়া, অর্থাৎ কর্মানুষ্ঠানের একাধিক উপায় চিন্তিত চিত্তকে বিচলিত বা আন্দোলিত করায়, 'মন' কর্ত্তব্যতা নির্দ্ধারণের সঙ্কল্প স্থির করিতে দ্বিধাগ্রস্থ হয়,- তখন নিঃসংশয়রূপে কর্ত্তব্য অবধারণ করিয়া দেওয়া ব্যক্তিগত 'বুদ্ধি'র কাজ। সুতরাং এই নিশ্চয়াত্মিকা

বুদ্ধি, সঙ্কল্প বিকল্পাত্মক মন হইতে শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত। কিন্তু যাহাকে আশ্রয় করিয়া, অর্থাৎ যে চালিকাশক্তি কর্ত্তৃক প্রভাবিত হইয়া, মন ও ইন্দ্রিয়াদি নিজ নিজ ব্যাপারে নিযুক্ত থাকে,- বুদ্ধি উদ্দীপিত হয়,- প্রাণেরও চেতনা প্রদানকারী কিংবা প্রাণ, মন, বুদ্ধি এই সমস্তই যাহার বাহন বা তাহার বহিঃপ্রকাশের যন্ত্রমাত্র,- দেহস্থিত সকল পদার্থ হইতে উচ্চতর এবং সম্পূর্ণ পৃথকবস্তু, এই চিরন্তন চৈতন্য সত্বাই দেহেন্দ্রিয়াদির কর্ত্তা, তথা কৃতকর্ম্মের সাক্ষী এবং ইনিই "আমি"র প্রতিভূ।

কঠোপনিষদে প্রথমঅধ্যায়ের তৃতীয়বল্লীর দশকসূত্রে, দেহস্থিত সূক্ষাতিক্ষ কারণাত্মক সর্ব্বব্যাপক এই "চৈতন্যসত্বা"কে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উল্লেখ করা হইয়াছে,- বিষয়সমূহকে উপলব্ধির জন্যই তদুপযুক্ত ইন্দ্রিয় নির্মিত হওয়ায়, তাহারা অর্থাৎ জ্ঞেয় বা অনুভবনীয় পদার্থ, ইন্দ্রিয় অপেক্ষা সূক্ষতর বা শ্রেষ্ঠ বলিয়া বোধ হয়। পক্ষান্তরে মনের বিকাশ সাধন করিয়াই মননশীল মানব সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জীব গণ্য হওয়ায়, জ্ঞাতব্য বা ভোগ্য বিষয়সমূহ হইতে, 'মন' অগ্রগামী বা গরিষ্ঠ বিবেচিত। পরন্তু মনের ভুল ভ্রান্তি, সন্দেহ সংশয় স্থলে হিতাহিত বিবেচনা করিয়া কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণকারী 'বুদ্ধি' তদপেক্ষা প্রধানরূপে অনুভূত হয়। অধিকন্তু অসংযত মনের সহিত যুক্ত থাকিলে, তৎসংস্পৃষ্ট বুদ্ধিও বহির্ম্মুখ ইন্দ্রিয়ের বশীভূত হইয়া পড়ে। সুতরাং ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধির উদ্দীপক, যাহা পূর্ব্বজন্মকৃত ধর্মাধর্মাদির ধারকরূপে "প্রকৃতি" নামে অভিহিত, তাহারও পরিচালক এবং ইহজন্মে জীবকৃত ইষ্টানিষ্ট কর্মের দ্রষ্টা ও সাক্ষী, সর্ব্বভূতস্থিত "চৈতন্যসত্বা" সর্ব্বকারণ কারণ বলিয়া সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

উপনিষদোক্ত এই মহাবাক্যের প্রতিধ্বনি শ্রীগীতার তৃতীয়অধ্যায়ে বেয়াল্লিশ শ্লোকে পরিলক্ষিত এইরূপ যে, স্থূল বাহ্যদেহ হইতে সূক্ষ, প্রকাশক, ব্যাপক ও অন্তঃস্থ বলিয়া শরীর হইতে 'ইন্দ্রিয়' শ্রেষ্ঠ ধারণা করিলেও,- ইন্দ্রিয়াদির প্রবর্ত্তকরূপ 'মন' অধিক সামর্থ্যশীল এবং ইতিকর্ত্তব্য নির্ণেতা 'বুদ্ধি' সঙ্কল্প বিকল্পকারী মন হইতে উত্তম পরিগণিত হইলেও,- দেহমনবুদ্ধির অভ্যন্তরে অবস্থিত ও তাহাদের একমাত্র আশ্রয় চৈতন্যপুরুষই সর্বশ্রেষ্ঠ। তাৎপর্য্য এই, জাগতিক বাসনা কামনার পরিপোষক দেহেন্দ্রিয়াদি হইতে 'আমি' বা 'জীবাত্মা' পৃথক, এই জ্ঞান যতই দৃঢ় হইতে থাকে, বহির্ম্মুখীভাব ততই নিস্তেজ হইয়া আসে এবং তখনই একাগ্র ও সূক্ষ্মবুদ্ধি সহায়ে 'আমি' প্রত্যক্ষ অনুভূত হয়। অর্থাৎ যাহা কিছু আমাদের দৃশ্য বা দৃষ্টিপথে পতিত তাহারা সকলেই যেমন 'দ্রষ্টা আমরা' হইতে ভিন্ন,- সেইরূপ দৃশ্যমান শরীর ও ইন্দ্রিয়াদি বা অনুমেয় বস্তু হইতে 'দর্শক আমি' পৃথক,- যাহা নিত্যচৈতন্যের অংশ বা তাঁহার বিকাশ। এই চৈতন্যপুরুষের স্বরূপ লক্ষণ বর্ণনায় শ্রীজীবগোস্বামী কৃত "পরমাত্মসন্দর্ভ" গ্রন্থে

আমি ও আমার ধর্ম

সর্ব্বশাস্ত্রের সার উল্লেখের ব্যাখ্যায় জানা যায়,- ইনি জ্ঞানাশ্রয়, জ্ঞানগুণ সম্পন্ন, জড় প্রকৃতি হইতে ভিন্ন, সতত চেতন হইয়াও নির্বিকার একরূপ,- ব্যাপ্তিশীল,- চিদা নন্দাত্মক অহং অর্থবোধক,- ক্ষেত্রী, সনাতন, অদাহ্য, অক্লেদ্য, অশোষ্য, অক্ষর, পরমাত্মার শেষভূত। ইনি দেব, নর, তির্য্যক, স্থাবর, দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, প্রাণ, বুদ্ধি, ইহার কিছুই নহেন। প্রতিক্ষেত্রেই ইনি ভিন্ন। নিত্য নির্মল হইয়াও, জ্ঞাতা, কর্ত্তা, ভোক্তাদি ত্রি ধর্মক এবং আপনাতে আপনি প্রকাশ।

আমরা দেখিতে পাই, জীবদেহ মাত্রই মরণশীল। কিন্তু শরীর অনিত্য হইলেও, দেহস্থিত 'চৈতন্যশক্তি' নিত্য, অবি নাশী ও অপ্রমেয়। জড়দেহ নশ্বর, দেহাশ্রিত চৈতন্য পুরুষ অবিনশ্বর, অক্ষর, শাশ্বত। ইহার জন্ম নাই, মৃত্যু নাই,- পুনঃ পুনঃ বর্দ্ধিত কিংবা ক্ষীণপ্রাপ্ত হইবার যোগ্য নহেন। ইনি অজ, নিত্য। শরীরাদি বিনষ্ট হইলেও ইনি বিনাশপ্রাপ্ত হন না। ইনি অস্ত্রে ছেদিত, অগ্নিতে দগ্ধ, জলে ক্লেদিত বা বায়ুতে শোষিত হইবার মত পার্থিব বস্তু নহে। ইনি নিত্য, সর্ব্বগত, স্থিরভাব, অচল, অনাদি,- অতএব অচ্ছেদ্য, অদাহ্য, অক্লেদ্য ও অশোষ্য। ইনি চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের অগোচর, মনের অবিষয় ও কর্মেন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্য। পক্ষান্তরে তিনি সৎ বা অস্তিত্বশীল নহেন কিংবা অসৎ বা অবিদ্যমানও নয়। সর্ব্বত্রই তাঁহার কর, চরণ, চক্ষু, মস্তক, মুখ বিরাজিত।

স্থানকাল হইতে বিচ্ছিন্ন না থাকিয়া সর্ব্বদেশে, সর্ব্বকালে, সর্ব্ব অবস্থায়, স্থূল সূক্ষ্ম প্রভৃতি যাবতীয় সত্তায় যে সকল ক্রিয়া সম্পাদিত হইতেছে, সেই ক্রিয়াই যেন তাঁহার হস্তস্বরূপ,- তাই তাঁহাকে 'বিশ্ববাহু' বলা হয়। চক্ষুরূপ কোন পৃথক অঙ্গ না থাকিয়াও যেমন সূর্য্য বিম্বে বিশ্বজগৎ প্রতিফলিত হইয়া প্রকাশিত, তেমনি বস্তুতঃ নেত্রহীন হইয়াও, তিনি 'সর্ব্বদ্রষ্ট'ও সকল জগৎ আবৃত রাখিয়াছেন বলিয়া,- 'বিশ্বতঃচক্ষু' অগ্নির সর্ব্বমূর্ত্তিই যেমন তাহার মুখ, তেমনি সর্ব্বস্বরূপ হইয়া, সর্ব্বভূত উপভোগ করেন বিচারে তিনি 'বিশ্বতোমুখ' সমস্ত বস্তুর মধ্যে আকাশ যেমন পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে, তেমনি শব্দমাত্রেই রহিয়াছেন এরূপ যুক্তিতে তিনি 'সর্ব্বশ্রুতিমান'। ইনি সমস্ত দেহেন্দ্রিয়াদি আবৃত করিয়া অবস্থিত। তিনি ইন্দ্রিয়বিহীন হইয়াও, সমস্ত ইন্দ্রিয় ও রূপরসসমূহ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য গুণ সকল প্রকাশ করিয়া থাকেন। তিনি নির্গুণ হইয়াও সর্ব্বগুণ পালক। আসক্তিশূন্য ও সমুদয় বিষয়বস্তুর আধাররূপে অন্তর ও বহিভাগে অবস্থান করিতেছেন তিনি। অতি সূক্ষ্মত্ব প্রযুক্ত অবিজ্ঞেয় হইয়াও, তিনি সন্নিকৃষ্ট অথচ দূরবর্ত্তী। তিনি অবিভক্ত হইয়াও সকলের হৃদয়ে বিভক্তির ন্যায় সদাসন্নিবিষ্ট।

যেমন জীর্ণবস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া দেহের উপযোগী নূতন বস্ত্র পরিধান করিতে

হয়, তেমনি দেহে অবস্থিত 'চৈতন্য পথ' কর্মফল ভোগ অক্ষম দেহের বিনাশে, এক-দেহ বর্জ্জন করিয়া ইহজন্মের কর্ম সংস্কারের সমষ্টি লইয়া, কর্মফল ভোগের কার্য্যকারিতা অনুযায়ী যথাযোগ্য অন্য দেহ গ্রহণ করেন। ইনি মনদ্বারা দুর্লভ। সাধনার দ্বারাও অপ্রাপ্য। গুণত্রয় রহিত তিনি। তিনি ব্যক্তিবিশেষের আকারের অতীত, অথচ সর্ব্বব্যাপক এবং সদাই অবিকৃত একরূপ। জলের প্রবাহ যেমন আদিতে উৎপত্তি-স্থলে অখণ্ডিত, সমুদ্রে গিয়া মিশিলেও তদ্রূপ,- প্রবাহের মধ্যস্থলেও একইরূপ দেখা যায়,- তেমনি এই "চৈতন্যপুরুষ" দেহ হইতে দেহান্তরে প্রবহমান হইলেও, সতত্ই একরূপ। ইনি নিত্যশুদ্ধ, নিরুপাধি, বিশুদ্ধ। সুতরাং অস্ত্রাদিদ্বারা ইহার ছেদন হয় না। জল-দ্বারা প্লাবিত করা যায় না। অগ্নিদ্বারা দগ্ধ সম্ভব নয়। বায়ুর শোষণ শক্তিও, ইহার উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না। ইনি নিত্য, শাশ্বত, স্বয়ং পূর্ণ এবং স্বরূপতঃ সর্ব্বব্যাপী। এই পূর্ণত্ব হইতে জীবাত্মার আত্মস্বরূপ একবসত্ব সম্পাদন হইলেও, তিনি অর্থাৎ 'পরব্রহ্ম' পূর্ণই রহিয়া থাকেন।

যেমন পবনস্পর্শে জল তরঙ্গাকার ধারণ করে,- কিংবা অপরের ইচ্ছায় স্বর্ণপিণ্ড অলঙ্কারের রূপ গ্রহণ করে,- তেমনি অমূর্ত্ত বা আকারহীন এই চৈতন্যসত্বা, কোন দেহ আশ্রয় করিলেই, দেহটি যথানুরূপ আকৃতি প্রাপ্ত হইয়া গঠিত, বর্দ্ধিত ও ক্রিয়া-শীল হইয়া থাকে। ব্যবহারিক দৃষ্টিতে সূর্য্যের উদয় অস্ত বুঝাইলেও, সূর্য্য যেমন সর্ব্বদাই একরূপ, কিংবা একস্থানে অস্তগামী দেখাইলেও অপর কোথাও উদীয়মান, তেমনি উৎপত্তি বিনাশহীন এই নিত্যবস্তু একদেহে অন্তগত হইলেও, অপর কোন দেহে প্রকাশিত থাকেন,- তাহা স্থুল সূক্ষ্ম অর্থাৎ ইন্দ্রিয় প্রাণ মন বুদ্ধি সমন্বিত জড়-ধর্ম বর্জ্জিত দেহ কিংবা কারণ শরীরও হইতে পারে। ইনি দেহাশ্রিত বা দেহে সঙ্গত হইবামাত্রই, জীবদেহে নখ হইতে কেশ পর্য্যন্ত, সর্ব্বত্র সমানভাবে চেতনার সঞ্চার হয় এবং শরীরের কোন অঙ্গ বা প্রত্যঙ্গ, শিথিল কিংবা দুর্ব্বল অথবা অপবিত্র হইলেই, ইনিই তাহা অনুভব করেন। কারণ এই চৈতন্যশক্তিই জীবদেহে মনবুদ্ধিকে সর্ব্বদা সচেতন রাখিয়া, ইন্দ্রিয়াদির প্রেরণা প্রদান করে,- সমগ্র দেহকে কর্মক্ষম রাখে। চুম্বক যেমন সংশ্লিষ্ট লৌহর সর্ব্বাংশকেই আকর্ষণ করিয়া চালিত করে,- এই চৈতন্য-সত্তা অনেকটা তেমনি ইন্দ্রিয়াদির মধ্যসন্ধিস্থলে অবস্থান করিয়া সম্পূর্ণ শরীরকে যুগ-পৎ জাগ্রত ও ক্রিয়াশীল রাখে,- এবং সেই প্রবৃত্তিবশে বিষয় বিশেষের প্রতি বাতিত 'বুদ্ধি' ব্যক্তিমানস বা 'মন'কে তদভিমুখী রাখিয়া চঞ্চল করে, সেই ইচ্ছাকেও সঞ্চালিত ও প্রয়োজনে বর্দ্ধিত করিয়া, বাসনা কামনার দ্বন্দ্ব দিশাহারা উত্তেজিত 'অহঙ্কার' বা আমিত্ববোধকে, ইন্দ্রিয়গ্রামের সহায়তায় বিষয়ভোগে নিয়োজিত করেন,- এবং

আমি ও আমার ধর্ম

কাম্য বস্তু লাভে অসমর্থ হইলে, মনে বিকার সৃষ্টি করিয়া 'দ্বেষ' আনয়ন করেন এবং সংস্কারানুযায়ী গঠিত বুদ্ধিবৃত্তিকে, শ্রবণ, নয়ন, ত্বক্, ঘ্রাণ, রসনা এই পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের মাধ্যমে বিষয়াদির সুখদুঃখ বিচারে প্রবৃত্ত করিয়া থাকেন-, এবং বাক্, হস্ত, পদ গুহ্যদ্বার, শিশ্ন প্রভৃতি পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয়কে অভীষ্ট কর্মে প্ররোচিত করেন। কিন্তু দেহস্থিত এই নিত্যসত্ত্বার কোন কর্মে প্রবৃত্তি বা বিরক্তি নাই। ইনি জন্ম জন্মান্তর ব্যাপী সংগৃহীত শুভাশুভ কর্মাদি সংস্কারের ধারক, সহজাত প্রবৃত্তির উদ্বোধক এবং ক্রিয়মান কর্মের সাক্ষীস্বরূপ। পক্ষান্তরে অন্তরে তিনিই জ্ঞান উন্মেষক হৃদয়ে প্রেম এবং চিত্তে প্রসন্নতা প্রদায়ক।

এই বিশুদ্ধ চৈতন্যপুরুষ দেহে অবস্থান করিলেও, দেহ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক তত্ত্ব,- যেমন চুম্বকের সংসর্গে আকৃষ্ট হইলেও, লৌহখণ্ড চুম্বক নয়,- কিংবা দীপ বর্ত্তিকার আলোকে গৃহকার্য্য নির্ব্বাহ হইলেও, দীপ ও গৃহের মধ্যে প্রভেদ রহিয়াছে। দর্পণে দেখা মুখচ্ছবি, যেমন মুখের প্রতিবিম্ব বা প্রতিফলিত আকৃতি,- চৈতন্যপুরুষের জীব দেহে অবস্থানও তদ্রূপ তাঁহার প্রতিরূপ বা প্রতিচ্ছায়া। জীবিত ও মৃতব্যক্তির মধ্যে যে পার্থক্য দৃষ্ট হয়,- অর্থাৎ চেতনার অবস্থিতি পর্য্যন্তই দেহ সজীব ও ক্রিয়াশীল এবং চেতনার অবসানে দেহ নির্জীব, নিষ্ক্রিয়,- কিংবা দর্পণ সম্মুখে দাঁড়াইলেই, দেহ দৃশ্য হয়,- সেইরূপ ইন্দ্রিয়াদির চেতনাদাতা চিৎপুরুষের সান্নিধ্য বা স্থিতি অবধি দেহ সচেতন এবং দেহের সহিত এই দেহী বা আত্মপুরুষের এইটুকুই সম্পর্ক। তিনি অন্তর্হিত হইবামাত্র, ইন্দ্রিয়াদি কিছুই দেখে না বা শোনে না,- সচল দেহ শবদেহরূপে গণ্য হইয়া থাকে।

ভূতলে ভ্রাম্যমান এই দেহ পঞ্চভূতদ্বারা গঠিত এবং সহজাত প্রবৃত্তি অনুযায়ী পূর্ব্বজন্ম বাসনা অভিমুখিন কর্মসূত্রে আবদ্ধ থাকিয়া, জন্মমৃত্যুর অধীন। কিন্তু দেহস্থিত চিৎপুরুষ অনাদি বশতঃ নিত্য,- স্বয়ংসিদ্ধ নির্গুণ। এই চিৎসত্তা চন্দ্রের ন্যায় হ্রাসবৃদ্ধিকারী কলাযুক্ত পূর্ণ নয়,- অথবা কলারহিত অপূর্ণ নহে। ইনি নিষ্ক্রিয় অথবা ক্রিয়াশীল নহেন এবং সূক্ষ্ম কিংবা নিরাভাস অথবা অদৃশ্য নয়। তিনি মুক্ত বা বদ্ধ নহেন। ইনি দেহেন্দ্রিয়ের চেতনা সম্পাদক,- কেবল আত্মস্বরূপ। তিনি শরীরে অবস্থানকালে 'এই দেহ আমি' এইরূপ আত্মাভিমান বোধের অনুবর্ত্তনে, জন্মাবচ্ছিন্ন অর্থাৎ জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত নিরন্তর 'দেহধর্ম' বিষয়ে মতত্ববুদ্ধি জন্মিয়া জীব দেহধারীরূপ বন্ধনদশা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

সূর্য্য যেমন কোন বিষয় না হইয়াও নেত্র ইন্দ্রিয়ের বিষয়, অর্থাৎ অনুভবনীয় পদার্থ বা দর্শনীয় বস্তু প্রকাশ করে,- এই চৈতন্যসত্ত্বাও তেমনি কোন কর্ম না করিয়াও কর্ম-

গুলি প্রকটিত করান। সমস্ত নগরব্যাপী একই বিদ্যুতের সরবরাহ থাকিলেও, ক্ষেত্র বিশেষে যান্ত্রিক ন্যূনতা বশতঃ যেমন কয়েকটিতে বিদ্যুতের প্রকাশ হয় না,- কিংবা একই স্থানে রোপিত বীজের ধর্মানুসারে, মৃত্তিকা ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের বৃক্ষাদি উৎপন্ন করে,- কোনটির ফল মিষ্টস্বাদ, অপরটি তিক্ত বা টক,- তেমনি নিজ কর্মানুসারেই প্রাণিগণের মধ্যে কেহ সদাসুখ ভোগ করে,- অপরজন সতত দুঃখে ব্যাকুল। দিবাকের সমভাবে আলোক বিকিরণ করিলেও, যেমন গোময় অপেক্ষা লৌহখণ্ডের তপ তাপ ধারণ করিবার ক্ষমতা অধিক,- তেমনি মনের নিয়ন্তা 'বুদ্ধি'র উৎকর্ষ বা অপকর্ষ অনুযায়ী, সর্ব্বজনের হৃদয়ে সর্ব্বদা সন্নিবিষ্ট অন্তরাত্মা পুরুষ তত্ত্বজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি বিশেষেই অনুভবগম্য হইয়া থাকেন।

এই অন্তর্য্যামী পুরুষ জীবশরীরে আপনস্থানে থাকিয়া কেবলমাত্র দেহের চেতনা সম্পাদন পূর্ব্বক দেহধর্ম, যাহা দেহেই অনুষ্ঠিত হইতে থাকে, তাহা সাক্ষীভূত ভাবে দেখেন মাত্র;- অর্থাৎ কর্মবশ কোন জীব ভোগপরায়ণ হইয়া বদ্ধ হইতেছে,- অপর কেহ ভোগবিমুখ হইয়া মুক্তিপথে অগ্রসর হইতেছে, তাহা সর্ব্বসাক্ষীরূপে অবলোকন করেন। পক্ষান্তরে জন্মান্তরীণ কর্মানুযায়ী ভোগযোগ্য যেই দেহ লাভ হয়, কর্ত্তাভোক্তারূপে আচ্ছাদিত জীব,- তাহাকেই "আমি "আমার" মনে করিয়া, তাহাতে আরূঢ় হয় এবং বালক যেমন জলের মধ্যে কিংবা দর্পণে নিজ প্রতিবিম্ব ধরিবার ব্যর্থ প্রয়াস করে,- তেমনি দেহাকারে প্রকাশিত আপনারই প্রতিচ্ছায়াকে 'দেহই আমি' এই ভ্রান্তবুদ্ধি পোষণ করিয়া, প্রকৃতির কার্য্য করিবার ইন্দ্রিয়াদি অবয়বগুলিতে 'আমার' ভাবিয়া সাংসারিক ব্যবহারে প্রবৃত্ত হয়।

এই চৈতন্যপুরুষ জীবভাবে যখন কোন ব্যষ্টি শরীরে প্রবেশ করেন,- তখনই তাহার 'কর্ত্তৃত্ব' এবং 'ভোক্তৃত্ব' দৃষ্টিগোচর হয়। যেমন কোন বিলাসবহুল আবাসে কিংবা রাজসিক প্রাসাদে অথবা জীর্ণ কুটিরে, বাসকারীর ঐশ্বর্য্য, বিলাসিতা অথবা দৈন্যদুর্দ্দশার পার্থক্য বুঝিতে পারা যায়,- তেমনি মহান চৈতন্যসত্ত্বা যখন কোন বিশেষ দেহ ধারণ করেন, সেই সুস্থসবল অথবা রোগদীর্ণ দেহে তাঁহার অহং কর্ত্তৃত্ব বোধের তারতম্য ঘটে,- অর্থাৎ আমি সুখী, আমি দুঃখী, আমি স্বাস্থ্যবান, আমি রোগপীড়িত, ইত্যাদি ভাবান্তর মনোভাব দেখা যায়,- এবং বিষয়াদির প্রতি অসংযত ব্যবহার কিংবা দুঃস্থ, কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় অবস্থা, দৈহিক আচরণের মধ্য দিয়া প্রকাশ পায়। পক্ষান্তরে হৃদয়মন সর্ব্বসংস্কার মুক্ত হইলে, সর্ব্বক্ষণ একটি নির্মল তৃপ্তির স্পর্শে বিভোর থাকে,- সচেতনা লাবণ্য দেখা দেয় মুখমণ্ডলে।

দেহ ত্যাগ করিয়া যাইবার সময় এই চৈতন্যবস্তু মন ও শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়ের শক্তি

এবং কর্মসংস্কার সঙ্গে লইয়া যায়,- বায়ু যেমন গন্ধ বহন করিয়া থাকে,- এবং পুনরায় নব কলেবর ধারণ করিলে সংস্কার আহিত ইন্দ্রিয়গুলিকে, দেহে বিস্তার করেন। সুতরাং পূর্ব্বজন্ম সংস্কারের চিত্ত বৃত্তি অনুসারেই প্রাণীগণের কর্মের প্রবণতা এবং ধার্ম্মিক আচরণ হয়,- চালচলন, রীতি, নিষ্ঠা, বিশেষ ব্যাপারে অনুরাগ প্রকাশ পায়। তাই প্রতিটি জীবের ব্যবহারিক জীবনে বৈশিষ্ট্য বা বৈষম্য দৃষ্ট হইয়া থাকে,- আকার, আকৃতিতে প্রভেদ লক্ষিত হয়। পরন্তু এই দেহের অবসানে, অর্থাৎ মরণের পর ঐ প্রাণী ইহজন্মের সঞ্চিত সংস্কার অনুযায়ী, কৃতকর্মের ফল ভোগের উপযুক্ত দেহ প্রাপ্ত হয়,- ধনী কিংবা নির্ধন গৃহে, নীরোগ কিংবা ব্যাধিগ্রস্ত শরীর লাভ করে,- কেহ নিরুপদ্রব, নিরুপম জীবন যাপন করে,- কাহারও জীবিতকাল কেবল হাহাকার করিয়া অতিক্রান্ত হইতে থাকে।

বসন্ত আগমে যেমন বৃক্ষে নবপল্লব উদ্গমের হেতু হইয়া, শাখা প্রশাখায় উদ্গত কিশলয় ফুলকে ফলে পরিণত করে,- অথবা বর্ষা সমাগম নিমিত্ত হইয়া, ধারা যথাপাত ক্ষেত্রে শস্য বীজ অঙ্কুরিত করে,- তেমনি ভ্রূণে আবির্ভূত প্রাণ চৈতন্যদ্বারা ক্রিয়াশীল অব্যক্ত প্রকৃতিগর্ভে গর্ভস্থ সন্তান ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে থাকে এবং দেহ ভূমিষ্ঠ হইলে, এই চৈতন্যনাথের প্রেরণাপ্রাপ্ত, সর্ব্ব সম্বন্ধের কারণ 'মন' উদ্যোগী হইয়া, ইন্দ্রিয়দিগকে নিযতি নির্দ্দিষ্ট কর্মে প্রবোচিত করিয়া সুখ কিংবা দুঃখভোগে প্রবৃত্ত রাখে। শ্রীগীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের ত্রয়োদশ শ্লোকে, দেহস্থিত এই চৈতন্যসত্তাকে "জীবাত্মা" নির্দ্দেশে বলা হইয়াছে,- দেহের কৌমার, যৌবন ও জরা ক্রমাগত হইলে 'দেহভৃৎ' পরিবর্ত্তিত হন না। কারণ আত্মার সত্তা অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ এই তিন কাল চক্রেই অবাধিত বা অবিনষ্ট। তাই দেহের পতনেও দেহী অবিকৃত থাকেন মৃত্যু দৈহিক ক্রিয়ামাত্র। জন্ম অস্তিত্ব, বৃদ্ধি, পরিণাম, অপক্ষয় ও বিনাশ,- এই ষড়বিধ বিকারী ধর্মযুক্ত প্রাণী দেহের ন্যায়, উক্ত ধর্ম বর্জ্জিত জীবাত্মার ধ্বংশ নাই।

বেদ এবং উপনিষদের পরবর্ত্তীকালে, সাংখ্য, যোগ, ন্যায়, বৈশেষিক, মীমাংসা ও বেদান্ত নামে 'ষড়দর্শন' সমূহে সূত্রাকারে- অর্থাৎ সংক্ষিপ্ত স্মৃতি সহায়ক বাক্য, আত্মতত্ত্বের যে নিগূঢ় দার্শনিক সমস্যা ও তাহার গভীর সমাধান,- সম্ভাব্য আপত্তি ও বিরুদ্ধ মতখণ্ডন, গ্রথিত হয়,- তাহার প্রত্যেকটিতেই প্রতি মানুষের মধ্যেই স্বতন্ত্রভাবে বিরাজমান দেহাতিরিক্ত এক পৃথক সত্তাকে "জীবাত্মা" নামে অভিহিত করিয়া উল্লেখ রহিয়াছে,- এই আত্মা দেহ ও মনকে সতত পরিচালিত রাখে এবং 'চৈতন্য' তাহার ধর্ম বা গুণ। মানবদেহ মরণশীল,- কিন্তু আত্মা অমর। জড়দেহের অবসানে, অর্থাৎ কোন মানুষের মৃত্যু হইলে, সেই দেহাশ্রিত আত্মা অন্যদেহ আশ্রয়রূপে গ্রহণ করে।

প্রবর্ত্তনা

সাংখ্যদর্শনের প্রবর্ত্তক মহর্ষি কপিল বলেন, আত্মা বা পুরুষ, বিশুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ এবং দেহ, মন, ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি হইতে স্বতন্ত্র। ইনি নিত্য, স্বপ্রকাশ, নির্গুণ, নিষ্ক্রিয় ও অপরিণামী এবং দেহভেদে বিভিন্ন বলিয়া বহু,- এক সংখ্যক নহে। প্রত্যেক জড়দ্রব্যই অপর কোন চৈতন্যসত্তার প্রয়োজন মিটাইয়া থাকে এবং যাহার প্রয়োজন সাধনে, জাগতিক যাবতীয় অচেতন পদার্থ সদা প্রস্তুত রহিয়াছে,- তাহাই বিভিন্ন জীবদেহে অধিষ্ঠিত, পুরুষ বা জীবাত্মা। পক্ষান্তরে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে অক্ষম, মনবুদ্ধিকে পরিচালিত করিতে দেহধারী আত্মা সংজ্ঞিত।

যোগদর্শনের প্রতিষ্ঠাতা মহর্ষি পতঞ্জলীর মতে, বিভিন্ন দেহে চেতনা প্রদানকারী আত্মার আলাদা সত্তারূপে বিদ্যমানতা স্বীকৃত। আত্মার চৈতন্যে প্রতিবিম্বিত স্বরূপতঃ অচেতন,- বুদ্ধি, অহঙ্কার ও মন এই তিনতত্ত্বের সমষ্টি 'চিত্ত' সংজ্ঞায় অভিহিত হইয়া, যখন বৃত্তিভাবে বিষয় সংযোগে আসিয়া জ্ঞানরূপে প্রকাশ পায়, তখন এই চিত্তবৃত্তির মাধ্যমে বা তাহার বশবর্ত্তী হইয়া জীবাত্মার বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান হয় এবং আত্মার কোন বিকার বা পরিবর্ত্তন না থাকিলেও, সচেতন আত্মা অচেতন চিত্তে প্রতিবিম্বিত হইয়া উহাকে ক্রিয়াশীল করেন বলিয়াই, চিত্তের বিবিধ প্রবৃত্তিকে আত্মার বৃত্তি বলিয়া প্রতীয়মান হয়,- অর্থাৎ অপরিণামী এবং স্বভাবতঃ মুক্তশুদ্ধ আত্মা, জন্মান্তরীণ সংস্কারে আচ্ছন্ন ও দেহে আবদ্ধ অবস্থায়, অবিদ্যা বা মায়াবশতঃ মনোবৃত্তি বা চিত্ত বিক্ষোপের পরিণামকে নিজের ক্রিয়া বা কার্য্যাবলী মনে করে। নিদ্রার সময় যে অনুভূতি হয়,- অর্থাৎ সুনিদ্রা হইয়াছে কিংবা নিদ্রাকর্ষণ হয় নাই,- ইহাও মনেরই এক প্রকার বৃত্তি পূর্ব্ব অভিজ্ঞতার পুনরাবৃত্তিরূপ স্মৃতিও, মনের ধর্ম্ম বা গুণ। আত্মার নিজস্ব কোন বৃত্তি নাই। ইনি নিত্যচৈতন্যস্বরূপে স্থিত থাকিয়া ইন্দ্রিয়াদি ও যাবতীয় বৃত্তির চেতনা প্রদানকারী মাত্র। ভ্রম বশতঃই মায়া কল্পিত জীব, চিত্তের বৃত্তিকে আপন বৃত্তি ভাবিয়া, নিজেকে সুখদুঃখের ভোক্তা মনে করে।

ন্যায়দর্শনের সংস্থাপক মহর্ষি গৌতমের সিদ্ধান্ত এই যে,- আত্মা একটি, অভৌতিক দ্রব্য বা অদ্বিতীয় পদার্থ এবং প্রতিটি দেহে পৃথক আত্মা বিদ্যমান,- চৈতন্য আত্মার গুণ বা ফলাৎ পারিকা শক্তি। সুখদুঃখ, ইচ্ছাদ্বেষ, বুদ্ধিজ্ঞান প্রভৃতি মানসিক অবস্থার গুণ কোন দ্রব্য অবলম্বন ব্যতীত প্রকাশ পাইতে পাবে না বলিয়া, যাহাকে আশ্রয় করিয়া ইহারা অবস্থান করে,- তাহা আত্মা। দেহ উৎপন্নের সাথে আত্মা সৃষ্ট হয় না। কারণ দেহ অচেতন পদার্থ এবং বুদ্ধিহীন। আত্মা মনের বিকারও নহে,- যেহেতু 'মন' ইন্দ্রিয় বিশেষ এবং ইন্দ্রিয়াদি ভৌতিক বা পঞ্চভূতাত্মক পদার্থ। অধিকন্তু নানা অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সমষ্টি দেহটির নিজস্ব কোন জ্ঞান নাই। আত্মাই দেহেন্দ্রিয়াদি

ক্রিয়ার কর্ত্তা এবং দেহদ্বারা কৃতকর্মের ভোক্তা। দেহান্তর প্রাপ্ত আত্মার চৈতন্য থাকে না,- দেহে অবস্থানকালেই জীবরূপে চৈতন্যপ্রাপ্ত হয় এবং ইন্দ্রিয়াদির মধ্যদিয়া তাহার প্রকাশ লক্ষিত হয়। অন্তর্দর্শনেই এই আত্মার পরিচয় পাওয়া যায়,- যেমন করিয়া চিত্তের নিস্থিতা বা মানসিক অবস্থাকে জানি বা ধ্যানাবস্থিত চিত্ততা ও অন্তরের আনন্দ বা অবসাদ অনুভব করি।

বৈশেষিক দর্শনের প্রবর্ত্তয়িতা মহর্ষি কণাদের মতানুসারে, আত্মা দুই প্রকার,- জীবাত্মা ও পরমাত্মা। জীবাত্মা সংখ্যায় বহু,- যত জীব, তত জীবাত্মা। কিন্তু পরমাত্মা এক বা অদ্বিতীয় এবং জীবাত্মার চেতনা প্রদাতা। শরীরভেদে জীবাত্মা বিভিন্ন হইয়াও, নিত্য ও সর্ব্বব্যাপী বস্তু এবং জ্ঞান বা চেতনার আধার হইলেও,- স্বরূপতঃ অচেতন, নির্গুণ নিষ্ক্রিয়। দেহের সহিত যুক্ত হইলেই জীবাত্মায় চেতনার প্রকাশ হয় বলিয়া 'চৈতন্য' আত্মার আগন্তুক বা আবির্ভূত গুণ। আত্মা,নিজের সুখদুঃখ হিংসা দ্বেষ প্রভৃতি মনের সাহায্যে প্রত্যক্ষ করে। 'মন' তাই নিত্যদ্রব্য বা গুণ এবং কর্মের আধাররূপী একটি স্বতন্ত্র সত্তা। অনুপরিমাণ বলিয়া 'মন'কে প্রত্যক্ষ করা না গেলেও,বাহ্য বস্তুকে যেমন বহিরিন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রত্যক্ষ করা যায়,- সুখদুঃখ প্রভৃতি আন্তর অবস্থাকে তেমনি অন্তরেন্দ্রিয় দ্বারা উপলব্ধি করিয়া, মনের অস্তিত্ব অবগত হওয়া যায়। পক্ষান্তরে বহিরিন্দ্রিয়ের সহিত তাহাদের নিজস্ব বিষয়বস্তুর, যথা কোন বাক্যালাপের কিংবা কিছু দর্শনীয় বিষয়ের সংযোগ ঘটিলেই, একই সময়ে সমস্ত ব্যাপারকে প্রত্যক্ষ করা হয় না, যদি বস্তু বিশেষের প্রতি 'মন' সংযোগের, অর্থাৎ মনোযোগের অভাব থাকে বা মানসিক অবস্থার ব্যতিক্রম ঘটে,- তাহা মনের বিমগ্নতা, নির্লিপ্ততা অথবা চঞ্চলতা যাহাই হউক না কেন। সুতরাং বস্তু বিষয়ে প্রত্যক্ষ জ্ঞানের জন্য মনের যোগদান স্বীকার করিয়া, অচেতন মনকে ক্রিয়াশীল করিতে, আত্মার অস্তিত্বও স্বীকার করিতে হয়। অধিকন্তু দেহের বাহ্যিক অভিব্যক্তি যথা,- হর্ষ, বিষাদ, বিমূঢ় কুদ্ধভাব লক্ষ্য করিয়া মনের বিভিন্ন ক্রিয়া প্রত্যক্ষ গ্রাহ্য হইবার সাথে,-মনোভাবের এই ভাবান্তরের অনুভবয়িতা আত্মার অস্তিত্ব স্বীকৃত হয়।

মীমাংসাদর্শনের প্রযোজক মহর্ষি জৈমিনির অভিমত,- আত্মা,- নিত্য ও সর্ব্বব্যাপী দ্রব্য এবং দেহ মন ও ইন্দ্রিয় হইতে ভিন্ন। আত্মা এক নহে,- ভিন্ন ভিন্ন দেহে পৃথক আত্মা বিরাজ করে। দেহের বিনাশ আছে, যেহেতু জড় বস্তু বলিয়া নশ্বর,- চিৎবস্তু বলিয়া আত্মার ধ্বংশ নাই,- ইনি অমর, অবিনশ্বর। কিন্তু স্বরূপতঃ নির্গুণ ও নিষ্ক্রিয়। 'চৈতন্য' আত্মার স্বরূপগত গুণ নহে,- পরন্তু আগন্তুক গুণ। আত্মার সঙ্গে মনের, মনের সহিত ইন্দ্রিয়ের এবং ইন্দ্রিয়াদিতে যখন বিষয়বস্তুর সংযোগ ঘটে,- তখন আত্মায়

চৈতন্যগুণের উদ্ভব হয়। সুষুপ্তিতে ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে জাগতিক বিষয়বস্তুর সংযোগ না থাকায়, ঐ সময় আত্মায় চৈতন্যগুণের অভিব্যক্তি হয় না। দেহ বিনষ্ট হইলে দেহস্থিত আত্মা, মন ও ইন্দ্রিয়াদির সংস্কার, অর্থাৎ পূর্ব্বদেহজাত ইন্দ্রিয়ের সূক্ষ্ম অবস্থা বা কার্য্য প্রণালী সহিত দেহান্তরে অধিস্থিত হয়।

বেদান্ত দর্শনে, আত্মা ও ব্রহ্ম,- এক বা অভেদ রূপে প্রস্তাবনা রহিয়াছে। ব্যাসদেব প্রণীত এই দর্শনশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত এইরূপ যে,- আত্মা এক ও অদ্বিতীয়,- কিন্তু দেহাশ্রিত বদ্ধাবস্থায় জীবাত্মা বহু,- যেমন বিভিন্ন জলপূর্ণ ঘটের আকার ও জলের প্রকার ভেদে পার্থক্য। পরন্তু মানুষ বা প্রাণী, আত্মা ও দেহের সমষ্টি নয়,- দেহমাত্রই অন্যান্য জড়বস্তুর ন্যায় নশ্বর,- আত্মা সৎবস্তু বলিয়া অবিনশ্বর। আত্মা স্বরূপতঃ নিত্য, শুদ্ধ, মুক্ত হইয়াও মায়াবশে দেহের সহিত নিজেকে অভিন্ন ভাবিয়া, দেহেন্দ্রিয়দ্বারা কৃত কর্মসমূহের কর্ত্তা, জ্ঞাতা ও ভোক্তার অভিমান করিয়া থাকে। ফলতঃ দেহের জন্ম মৃত্যু; সুখদুঃখ, রোগশোক প্রভৃতি সন্তাপ কিংবা সন্তোষকে, আত্মবোধ করিয়া সংসারদশা প্রাপ্ত জীবাত্মা স্বীয় ব্রহ্মত্ব বিস্মৃত হইয়া পড়ে।

বেদান্তদর্শনের অন্যতম ভাষ্যকার বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের উদ্ভাবক আচার্য্য রামানুজের বিধিমতে,- আত্মা ব্রহ্মের অংশ হইলেও অসীম নয়,- প্রকৃতবিচারে সসীম এবং দেহ, প্রাণ, মন, বুদ্ধি হইতে বিলক্ষন বা পৃথক সত্তা। দেহ আশ্রয়ী আত্মা "জীব" নামযুক্ত হয়। জীবদেহ ব্রহ্মের অচিৎ অংশ হইতে প্রসূত এবং আত্মা ব্রহ্মের চিৎ অংশ হইলেও প্রসূত নয়,- সতত চিদ্রূপ বা চৈতন্যস্বরূপ। আত্মা নিত্য বা অক্ষয়,- তাই অজ বা জন্মরহিত,- সুতরাং অমর বা মৃত্যুহীন এবং চৈতন্য তাঁহার নিত্যগুণ বা ধর্ম বলিয়া, সুষুপ্তি ও মুক্ত অবস্থাতেও অহংরূপ, আমিত্বজ্ঞান সম্পন্নভাবে প্রকাশিত থাকেন।

জৈন ধর্মমতে আত্মাকে 'জীব' বলা হয়,- অর্থাৎ যাহার জীবন আছে, তাহাই জীব বলিয়া আখ্যাত। এবং চেতনা বা সর্ব্বক্ষণ সজ্ঞান অবস্থা জীবের স্বভাবগত ধর্ম। এই জীব ইন্দ্রিয়াদির কর্ত্তা,- দেহদ্বারা আচরিত বা সম্পাদিত কর্মের জ্ঞাতা এবং দেহের সুখদুঃখ ভোক্তা বা অনুভবকারী। নিজের কোন আকার না থাকিলেও,- এই জীব বা আত্মা প্রাক্তন কর্মজনিত কামনাবাসনার বশে, যে দেহ আশ্রয় করে, সেই দেহেরই আকৃতি ধারণ করে এবং তৎ অনুপাতে তাহার বিস্তৃতি ঘটিয়া, চৈতন্য দেহব্যাপী পরিব্যাপ্ত হইয়া থাকে।

বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীগণ দেহাতিরিক্ত নিত্য বা শাশ্বত আত্মার অস্তিত্বকে গুরুত্ব না দিলেও, মানুষের চেতনায় সুখদুঃখ প্রভৃতি নানা রকমের অনুভূতি, চিন্তা, ইচ্ছার অহরহ আসা যাওয়ার অবিরাম প্রবাহরূপ মানসিক প্রক্রিয়ার ধারাকেই আত্মা বলিয়া

স্বীকার করেন,-যাহা পূর্ব্ববর্ত্তী অবস্থা হইতে উদ্ভব হইয়া, পরবর্ত্তী অবস্থার সৃষ্টি করে। তাৎপর্য্য এই, দিবারাত্র প্রজ্জ্বলিত প্রদীপের শিখা যেমন পরবর্ত্তী শিখার সৃষ্টি করিয়া, একটি অবিচ্ছিন্ন অগ্নিশিখার ধারা প্রতিষ্ঠিত রাখে,- কিংবা নির্ব্বাণোন্মুখ কোন প্রদীপ-শিখা হইতে তৈলপূর্ণ অন্য প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত হয়,- তেমনি এক জীবনের শেষ অবস্থা হইতে, পরবর্ত্তী জীবনের প্রথম অবস্থার সৃষ্টি হয় এবং এই অবস্থাসমূহের ধারাবাহিকতা রক্ষাকারী চৈতন্যসত্বাকে 'আত্মা' ধারণা করা হইয়া থাকে,- যাহা প্রাণরূপে সুখদুঃখ ভোক্তা।

সমগ্র উপনিষদে আত্মার নিত্য অস্তিত্ব এবং পুনর্জন্মবাদ স্বীকৃত। যেমন তিলের মধ্যে তৈল, দুধে ঘৃত, ফুলে গন্ধ, ফলে রস, কাষ্ঠে অগ্নি, তেমনি ভাবে জীব শরীরে আত্মা বিরাজিত। উপরন্তু জীবাত্মাকে মহান বৃক্ষের ন্যায় স্তব্ধ, স্থির অচল, নিষ্ক্রিয় ও শান্তস্বরূপে সংস্থিত 'পরমতত্ত্ব' ও 'আনন্দস্বরূপ' আখ্যাত করিয়া, ইহাকে ব্রহ্মের অংশ উল্লেখে বলা হইয়াছে,- ব্রহ্ম ও জীবাত্মা এক ও অভিন্ন হইলেও দেহাশ্রিত অবস্থায় পৃথক,- যেমন স্বর্ণপিণ্ড ও স্বর্ণনির্ম্মিত দ্রব্যাদি স্বরূপে একই বস্তু হইয়াও, সত্তায় আলাদা আত্মায় আনন্দ আছে বলিয়াই তৎসল্লিষ্ট বিষয়বস্তু আনন্দময় বোধহয়। জলে গলিয়া যাওয়া লবণ, যেমন আস্বাদে জানা যায়, জীবশরীরে পরিব্যাপ্ত জীবাত্মা তেমনি অনুভূতিদ্বারা উপলভ্য।

দর্শনের গহনারণ্যে এবং বিভিন্ন মতবাদের জটিলতায় বিভ্রান্ত, ধর্মাভিজ্ঞাসু ব্যক্তির পক্ষে, ভারতীয় অধ্যাত্মভাবনার রত্ন ভাণ্ডার, সর্ব্বোপনিষদসার, সকল পারমার্থিক প্রশ্নের সার্থক উত্তর,- যাবতীয় মত ও পথের অপূর্ব্ব সমন্বয়,- অতলস্পর্শী, অবধিহীন ভাবনাময়, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা একটি প্রধান ধর্মগ্রন্থ,- তথা জীবনের শ্রেষ্ঠকাম্যবস্তু প্রাপ্তির বা পরমপথে সহজ উত্তরণের অভিন্ন উপায় নির্দ্দেশক বলিয়া স্বীকৃত। ইহাতে প্রতিপাদিত পরমতত্ত্ব সকল শ্রেণীর লোককেই শোকে সান্ত্বনা, দুঃখে আশা এবং মৃত্যু ভাবনায় ভীতকে চিরন্তন আশার বাণীতে আশ্বস্ত করিয়া, উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষিত রহিয়াছে,- মানবদেহে একটি অবিনাশী 'নিত্যবস্তু' আছে,- যাহা "জীবাত্মা" নামে অভিহিত হইয়া দেহ ও মনকে পরিচালিত করে। 'চৈতন্য' ইহার ধর্ম বা গুণ,- যাহা নিত্য ও চিরন্তন বলিয়া, দেহের নানাবিধ পরিবর্ত্তনের মধ্যেও, বিকারের প্রাপ্ত হয় না,- মৃত্যুতে কোনদেহ ধ্বংশ হইলে, ঐ দেহস্থিত আত্মা দেহান্তরে গমন করে, যে অবস্থায় 'আমিত্ব' অর্থাৎ ব্যক্তিত্বের চেতনা অবলুপ্ত হয় না।

জীবদেহ নশ্বর, বিনাশশীল হইলেও, জীবদেহধারী দেহী, অর্থাৎ প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের অতীত জীবাত্মার বিনাশ নাই। দেহাশ্রিত জীবাত্মা বা 'আমি' দেহের কৌমার,

প্রবর্ত্তনা

যৌবন, জরা প্রভৃতি অবস্থাত্রয় যেমন প্রাপ্ত হইয়া থাকে,- তাহার দেহান্তর প্রাপ্তিও সেইরূপ একটি অবস্থা বিশেষমাত্র। পক্ষান্তরে ঋতু পরিবর্ত্তনের ন্যায় দেহ নানাবিধ ভাবাপন্ন হইলেও,- অর্থাৎ বাল্যকালের পর যুবক অবস্থা, তারপর প্রৌঢ়ত্বদশা প্রকাশ পাইলেও, জীবাত্মার কখনই অন্যথাভাব হয় না। তাৎপর্য্য এই, জীবাত্মা বালকদেহে যেমন ছিলেন, যৌবনকালেও সেইরূপ থাকেন এবং বৃদ্ধাবস্থার দেহতেও, তাঁহার একই রূপে অবস্থিতি' অর্থাৎ দেহের বিবিধ অবস্থায় দেহী বা জীবাত্মার কোন পরিবর্ত্তন অথবা হ্রাসবৃদ্ধি ঘটেনা। কারণ দেহের জন্ম হইতে মৃত্যু পর্যন্ত ক্রমবিকাশের ন্যায়, 'আমি বা 'জীবাত্মা' যদি পরিবর্ত্তনশীল হইত তবে 'যুবক আমি কিংবা 'বৃদ্ধআমি' এইরূপ স্বতন্ত্রতার অনুভব প্রকাশ দেখা দিত। কিন্তু বয়োবৃদ্ধির সাথে দৈহিক অবস্থার পার্থক্য লক্ষিত হইলেও, আমিত্ববোধের কোনরূপ ভিন্নতা বা তারতম্য অনুভূত হয় না,- যদিও ভাবনা হয়, এই দেহটি একসময় সবল ছিল, এখন দুর্ব্বল বোধ হইতেছে। ইহার কারণ, আত্মা বা দেহস্থিত নিত্যবস্তুই মানুষের অনুভূতি, চিন্তা এবং ইচ্ছার আধারস্বরূপ এবং বাল্য, যৌবন ও বার্দ্ধক্য প্রভৃতি দেহের অবস্থাত্রয় যে, একই অভিন্ন ব্যক্তির সত্তার বিভিন্নদশা, তাহার অনুভাবয়িতা। ইহার ভাবার্থ এইরূপ,- মাতৃগর্ভস্থ ভ্রূণ যেই শক্তিবলে দেহ বর্দ্ধিত ও মন সংগঠিত হয়, তাহার চেতনাপ্রদাতা একটি 'নিত্যসত্তা' অবশ্যই স্বীকার করিতে হয়। এই শাশ্বত চৈতন্যসত্তাই পূর্ব্বজন্মের সহিত ইহজন্মের এবং তৎ পরবর্ত্তী জন্মের যোগসূত্র রক্ষাকারী,- অর্থাৎ প্রাক্তন ক্রিয়মাণ ও সঞ্চিত কর্ম সংস্কারের ধারক এবং দেহাশ্রিত অবস্থায় দেহের 'আমি' অভিমানী। যেহেতু পূর্ব্বে না থাকিয়া পরে থাকিবার নাম 'জন্ম' এবং পূর্ব্বে থাকিয়া পরে না থাকার নাম 'মৃত্যু',- পরন্তু আত্মায় এই দ্বিবিধ অবস্থার কোনটিই নাই এবং জীবাত্মা অর্থে দেহধারী 'আমি, সঙ্গিত হয়,- তাই 'দেহের আমি' জন্ম মৃত্যু রহিত। মানুষ যেমন পরিহিত বস্ত্র ত্যাগ করা কালীন নিজে অপরিবর্ত্তিত থাকিয়া, অপর বস্ত্র পরিধান করে,- তেমনি ইহজন্মের আমি আখ্যাত অবয়ব পরিবর্ত্তন করিয়া জীবাত্মা যখন পরজন্মে অভিনব দেহরূপ পরিচ্ছদ গ্রহণ করে, সেই দেহ ক্ষেত্রেও আমিত্ব আরোপিত থাকে,- অর্থাৎ 'ইহাই আমার দেহ' এই জ্ঞান উপজাত হয়। প্রনিধান যোগ্য যে, গৃহ দগ্ধ হইলে গৃহ মধ্যস্থ প্রাণী দগ্ধ হইবার ন্যায়, নিরবয়ব বলিয়া 'আমিসত্বা' দহনযোগ্য নয় এবং ব্যষ্টি আত্মার, অর্থাৎ আমিভাব অধ্যাসিত জীবাত্মার স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ শরীর পরিগ্রহণ কালে, এমন কি বন্ধনমুক্ত অবস্থাতেও আমিত্ববোধ, অর্থাৎ 'আমিআছি' এইভাব স্থির থাকে।

আত্মা বিভূতিগুণহীন ও চেতন এবং দেহ বিভূতিগুণ সম্পন্ন ও অচেতন বিধায়, দেহে 'আমিত্ব' অর্পণ করিয়াই, জীবদেহধারী জীবাত্মার জীবলোকে বিচরণ।

ভাবার্থ এই,- অগ্নি দগ্ধ কিংবা আলোক বিকিরণ করিলেও,- কাষ্ঠ, মশাল অথবা প্রদীপ অবলম্বন ব্যতীত, যেমন আগুনের প্রকাশিত রূপ অথবা বাহ্নিকক্রিয়া উপলব্ধি হয়না,- তেমনি দেহে 'আমি ধর্ম' সংস্থিত না হইলে, জড়ধর্ম বর্জ্জিত আত্মার জাগতিক বিষয়-ব্যাপারে আত্মস্ফুরণ ঘটে না,- যদিও সূর্য্য কর্ত্তৃক জগৎ প্রকাশিত করিবার ন্যায়, স্বরূপতঃ ব্রহ্মচৈতন্য আত্মাদ্বারাই 'আমিভাব' জ্যোতিষ্মান, যেমন অগ্নি সংযোগ ঘটিলেই প্রদীপ দেদীপ্যমান। পক্ষান্তরে পূর্ণতাপ্রাপ্তির আবেগ, ধর্মলাভের ব্যাকুলতা, দুঃখনিবৃত্তির উপায় অনুধাবনা, অথবা 'আমি জীবন্মুক্ত' বা 'আমি ব্রহ্ম সান্নিধ্য উপনীত' জীবাত্মার এই আত্মপ্রত্যয় 'আমি'র মাধ্যমেই বিকশিত। ফুলের রং গন্ধ ইন্দ্রিয় সাহায্যে জানা যায়,- কিন্তু ইহার সৌন্দর্য্যবোধ ইন্দ্রিয়বেদ্য নয় এবং এই অনুভূতি পৃথক জনের নিকট ভিন্নভাবে প্রতীয়মান। সুতরাং কোন কিছু উপলব্ধির ক্ষেত্রেও ব্যক্তিগত 'আমি'র স্ব তন্ত্র্য লক্ষিত হয়। অপিচ' কর্মাদির সংস্কার 'আমি নামধারী' জীবাত্মায় আহিত থাকিয়া অনুরূপ ফলদায়ক বলিয়া, আমিই কৃতকর্মের ফলভোগ করাকালীন অনুশোচনা করি, কিংবা ব্যথিত হই, জীবাত্মা নহে। ইনি অন্তরিন্দ্রিয় ও বহিরিন্দ্রিয় দ্বারা লব্ধজ্ঞানের জ্ঞাতা মাত্র। তাই বিভিন্ন সময়ের নানারূপ পরিবেশে আহৃত অভিজ্ঞতার পার্থক্য সত্ত্বেও, আত্মার পরিবর্ত্তন হয় না,- যদিও পারিপার্শ্বিকের প্রভাবে 'আমি'র উৎকর্ষ বা অপকর্ষ ঘটে। সংক্ষেপে,- কর্ণধার হাল ধরিয়া যেমন নির্জীব তরণী চালনা করে, জীবাত্মাও যেন তেমনি দেহাভিমানী 'আমি'কে অবলম্বন করিয়া স্থূলদেহ পরিচালিত করেন। এবং সুখদুঃখ প্রভৃতি অনুভূতির অজ্ঞাত আধাররূপে অবস্থান করিয়া, তাহার সংবেদন, আমিরূপ অধ্যাত্মতত্বে সংক্রামিত করেন,- তখনই আমি সুখী, আমি দুঃখী, এই রূপ অনুভাবের অনুক্রমণ দেখা দেয়।

পার্থিব বিষয়াদি যেমন মানবের ভোগের জন্য সৃষ্ট, মানব দেহটিও তেমনি আমি ভাবাত্মক জীবাত্মার কর্মফলভোগের উপযুক্ত করিয়া উৎপন্ন। পক্ষান্তরে পরস্পর অসম্বন্ধ বস্তু, অপরের প্রয়োজনেই সংযুক্ত হইয়া থাকে,- যেমন বহু দ্রব্যের মিলনে নির্মিত গৃহ, ব্যক্তিবিশেষের ভোগ দখলের নিমিত্ত বিদ্যমান। সেইরূপ জীবাত্মার ভোগ উপলব্ধির জন্য, দেহেন্দ্রিয় সমষ্টি সংহত হইয়া পার্থিব দেহরূপ ভোগায়তন। অধিকন্তু অপর কর্ত্তৃক গঠিত আবাসে 'আমি এই গৃহকর্ত্তা' এইরূপ মর্যাদা বোধ না থাকিলে, যেমন সেই গৃহের যথোচিত সংস্কার সাধন কিংবা যত্নগ্রহণ করা হয় না,- তেমনি প্রকৃতি কর্ত্তৃক প্রস্তুত দেহে, আত্মাভিমান অর্থাৎ 'আমারদেহ' এইরূপ অ ত্মবোধ না জন্মিলে দেহের পরিচর্য্যারূপ রক্ষণে শিথিলতা আসিয়া যায়। যেমন জীর্ণগৃহ পরিত্যাগ করিয়া নবনির্মিত আবাসে গমন করিলেবা প্রবেশ করিলেও, 'আমার গৃহ' বোধের অন্যথা হয়

না,- তেমনি জীবাত্মা যখন একটি দেহ বর্জ্জন করিয়া অন্যদেহ গ্রহণ করে, সেই নব-কলেবরেও 'আমি জ্ঞান' অব্যাহত থাকে।

গর্ভস্থ অবস্থায় ভ্রূণে সঞ্চারিত চৈতন্যসত্তার, দেহধারণ করিয়া মাতৃকুক্ষি হইতে নির্গমনের সাথে সাথে অচেতন মনবুদ্ধি প্রভৃতির নিয়ন্ত্রণকারী জীবাত্মার প্রতি অহং-ভাব স্থাপন করিয়া, 'এই দেহ আমার' তাপর সত্তাই 'আমি'। কারণ দেহেন্দ্রিয়ের কার্য্য যদি কোন ভোক্তার উদ্দেশ্যে কৃত না হয়, তবে তাহা নিরর্থক বিবেচিত হইয়া পরে। অধিকন্তু জাগতিক বিষয় মাত্রই সুখাত্মক, দুঃখাত্মক ও বিষাদাত্মক,- যাহা অনুভূতির বস্তু বা অনুভবনীয় পদার্থ এবং ইহাদের অনুভবকারী দেহস্থিত চৈতন্যসত্তাই 'আমি' ভাবে বিভাবিত হইয়া শারীরিক ও মানসিক সুখদুঃখাদি অনুভব করে। পক্ষান্তরে দৃশ্য বা দর্শনীয় বিষয় এবং দ্রষ্টা বা দর্শক, পরস্পর পৃথক বস্তু এবং দৃশ্য থাকিলে দ্রষ্টাও থাকিবে,- যেমন চরাচর জগৎ দৃশ্যমান,- ইহার দ্রষ্টা 'আমি' রূপী নিত্য সত্তা জীবাত্মা, যিনি অবয়বটিকে 'আমার' আখ্যায়িত করিয়া 'আমি' ভাবে অবলোকন করিতেছেন।

স্বপ্নাবস্থায় বিচিত্র দেহ ধারণ হইলেও, 'আমি' জ্ঞানের পার্থক্য বোধ হয় না,- অর্থাৎ নিদ্রাতেও 'আমিবোধক' সংজ্ঞা অপারিত থাকে। ভারতের অধ্যাত্মশাস্ত্রসমূহে ইহা সুপ্রতিষ্ঠিত বাক্য যে, 'আমি' বা 'আমার আত্মা' দেহ, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন এবং ইন্দ্রিয়াদি বিকল, মন অবসন্ন, বুদ্ধি বিপর্য্যস্ত, এমন কি দেহের বিনাশ ঘটিলেও, তাহার স্বীয় স্বরূপের ব্যতিক্রম হয়না,- যেহেতু ইনি অজর, অমর এবং চিৎস্বরূপ। আমি স্থুল, আমি কৃশ, আমি পীড়িত, ইত্যাদি দৈহিক অবস্থার পরিবর্ত্তন, ভ্রম বশতঃই জীবাত্মায় আরোপিত হয়,- কারণ ইনি দেহের অবস্থান্তরের অর্থাৎ বাল্য, কৈশোর, যুবক, প্রৌঢ় প্রভৃতি অবস্থার দ্রষ্টা বা অনুভবকারী 'আমি' আখ্যাত, চৈতন্যসত্তা। তাই বয়োবৃদ্ধির সহিত শারীরিক পরিবর্ত্তন দেখা দিলেও 'আমিত্ব' বোধের কোন ভিন্নতা বা বৈলক্ষণ্য প্রকাশ পায় না,- যদিও দেহটি যখন ক্রমশঃ বার্দ্ধক্যের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে, তখন, আমার দেহটি জরাগ্রস্ত হইতেছে' আমি সংজ্ঞিত জীবাত্মা তাহা উপলব্ধি করে মাত্র,- যেমন জীর্ণ যানের বিকল যন্ত্রাদির দুরবস্থা চালক বুঝিতে পারে।

সুতরাং ইহাই নির্দ্ধারণ করা যায় যে, প্রতি জীবের মধ্যেই দেহ ও মনের পরি-চালক একটি স্বতন্ত্রসত্তা বিরাজিত, যাহা 'জীবাত্মা' নামে অভিহিত। 'চৈতন্য' আত্মার বিশেষ ধর্ম বা গুণ এবং ব্যষ্টি আত্মা মানবদেহে 'আমি' অর্থবোধক। দেহমাত্রই বিনাশ শীল, কিন্তু দেহাতিরিক্ত চৈতন্যসত্তা জীবাত্মার ধ্বংশ নাই এবং আমিত্বেরও অবসান হয় না। দেহের বিনাশকাল উপস্থিত হইলে কর্ম ফলদাতা দৈবশক্তি আমি অভিমানী

আমি ও আমার ধর্ম্ম

জীবাত্মাকে স্বীয় কৃতকর্ম ফলভোগের যথাযোগ্য দেহের নিকট আকর্ষণ করিয়া লইয়া যায়, যখন পূর্ব্ববর্ত্তী দেহের মন অনুগমন করিয়া পরবর্ত্তী প্রাপ্তদেহে স্থিতিলাভ করে। দেহের মৃত্যু ঘটিলে 'আমি' আরূঢ় আত্মা কোন্ লোকে গমন করিবে এবং সেখানে কতকাল কিভাবে অবস্থান করিয়া, অতঃপর জীবলোকে পুনরাবর্ত্তনে কিরূপ পরিবেশে, কি প্রকারের দেহ ধারণ করিবে, তাহা নির্ভর করে,- বিধি নির্দিষ্ট কর্মফল অনুসারী। কারণ অহংভাবে পূর্ব্বজন্মে কৃতকর্মাদি, ইহজন্মে প্রারব্ধ ভোগের অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি করে। উল্লেখযোগ্য যে,পুরুষকার প্রয়োগে আত্ম শুদ্ধিদ্বারা পরিমণ্ডল উর্দ্ধমুখী প্রসারিত করা যায়, কেবল তাহাই নহে,- প্রাক্তন কর্মবিপাকের গতিও স্তিমিত বা পরিবর্ত্তন সম্ভব 'আমি'র পৌরুষ প্রাবল্যে।

দৃশ্যমান এই যে মানবদেহ বা স্থূলশরীর, তাহার অভ্যন্তরে সূক্ষ্মশরীর,-যেমন কোষের মধ্যে কৃপাণ। সূক্ষ্ম শরীরই মনের অবস্থানভূমি,- যেখানে ধৃতি, মেধা, চিন্তা, কল্পনা, ধারণা, একাগ্রতা, আসক্তি, অনুরাগ, কামনাবাসনা, আবেগউত্তেজনা, ইচ্ছা-দ্বেষ, স্মৃতি অনুভূতি ইত্যাদি মানসিক প্রক্রিয়া অনবরত আবর্ত্তিত হইতেছে। ইহার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অবস্থা কারণ শরীরে জীবাত্মার অবস্থিতি এবং আত্মার অস্তিত্বেই দেহ সজীব ও আমিভাবে কর্মের কর্ত্তা, জ্ঞাতা ও ভোক্তা। স্থূলদেহ নির্জীব হইলে জীবাত্মা সূক্ষ্ম-দেহে আবৃত হইয়া কারণদেহ সমেত চলিয়া যায়, এবং ইহাতেই নিহিত থাকে পূর্ব্বতন, অর্থাৎ ফেলিয়া আসা জীবনের সংস্কার, অভিজ্ঞতা, নৈতিক উৎকর্ষতা,- যাহাকে সাথী করিয়া জীবাত্মা মর্ত্ত্যের ভোগযোগ্য অন্যদেহ ধারণ করে। ইহাই জীবের পুনর্জন্ম বা জন্মান্তর নামে পরিগণিত।

এই জন্মান্তরবাদ কর্মবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। আমাদের প্রত্যেক কর্মের যেমন কোন কারণ থাকে, তেমনি প্রতিটি সুকৃত দুষ্কৃত কার্য্যের শুভাশুভ ফল সৃষ্ট হয়। যে ব্যক্তি ইষ্টানিষ্ট কর্মে প্রবৃত্ত হয়, তাহার সেই অনুযায়ী পাপপুণ্যের ফল লাভ হয়। 'কর্ম' বলিতে কেবল দেহদ্বারা অনুষ্ঠিত শারীরিক কার্য্যাদি বুঝায় না,- মানসিক চিন্তাভাবনাও নির্দ্দেশ করে। ধ্যান, তপস্যা, স্বাধ্যায়, ভগবৎ নামকীর্ত্তনও কর্ম। পারমার্থিক অনুভাবনা যেমন আত্মোন্নতির অনুকূল, বিষয়াদির অনুধাবনা তেমনি আত্মার উর্দ্ধগতির প্রতিকূল। কেহই কর্ম না করিয়া জীবনধারণ করিতে পারে না। কিন্তু ফলপ্রাপ্তি কামনায় কৃত-কর্মাদি ইহ জীবনে সম্যক ফলপ্রসূ না হইলে, তাহা পরবর্ত্তী জন্মে ভোগের অপেক্ষায় রহিয়া যায়। অতএব পূর্ব্বজন্মের কর্মই ইহজন্মে দৈব বা অদৃষ্ট। সরলার্থ এই, জীবমাত্রেরই বর্ত্তমান অবস্থাপ্রাপ্তি, তাহার প্রাক্তন কর্মের পরিণাম এবং ইহজীবনে সঞ্চিত কর্মের পরিণতি, পরবর্ত্তী কোন জন্মে পর্য্যবসিত হইবে, ক্রিয়মাণ কর্মরূপে,- যাহা প্রাপ্তদেহ প্রারব্ধ ভোগ সংজ্ঞায় পরিখ্যাত।

প্রবর্ত্তনা

প্রত্যেকটি সাত্ত্বিক, রাজসিক কিংবা তামসিক কর্ম পৃথক অদৃশ্য শক্তি সৃষ্টি করিয়া থাকে, যাহা প্রবৃত্তিরূপে মানুষের নিয়তিকে নিরবধি নিয়ন্ত্রণ করে। উল্লেখযোগ্য যে, মনন প্রবৃত্তির ক্রিয়া না থাকায় মনুষ্যেতর তির্য্যক প্রাণীতে নূতন কর্ম সংস্কার সৃষ্ট হয় না। যেহেতু সংস্কারগত প্রবৃত্তি হইতে কাহারও অব্যাহতি নাই, তাই অমোঘ নিয়তির অনিবার্য্য পরিণাম এড়াইয়া চলা, আত্মজ্ঞানহীন ব্যক্তির উপায় নাই। নিয়তির লীলা কার্য্যকারণ পরম্পরায় কখনো ইহ জীবনেই পরিদৃশ্যমান,- কোনক্ষেত্রে জীবন রঙ্গমঞ্চের অন্তরালে গুপ্ত থাকিয়া যায়, অপর কোন জন্মের উপযুক্ত দেহ ও পরিবেশে ভোগদায়ক হইবার প্রতীক্ষায়। তাৎপর্য্য এই, এক জীবনে অহংভাবিত মানব যে সকল পাপপুণ্য কর্ম করিয়া যায়, তাহা সেই জীবনে কিছু লাভ বা ফলদায়ক হইলেও, সমস্ত কর্মবিপাক বা শুভাশুভ ভোগ একটি নির্দিষ্ট দেহে একই জীবনে নিঃশেষ হইয়া যায় না। তাই কৃত-কর্মের পরিণাম ফলভোগ নিমিত্ত পুনরায় ভোগ যোগ্য দেহপ্রাপ্তির প্রয়োজন বিদেহী জীবাত্মা কিছুকাল অন্তরীক্ষের বিভিন্নস্তর, অর্থাৎ ভুবর্লোক বা স্বর্লোক অতিক্রম পূর্ব্বক পুনরপি ভূর্লোকে বিধিনির্দিষ্ট দেহ ধারণ করে এবং সেই দেহে পূর্ব্বজন্মের সংস্কার আহিত 'আমিবোধ' অর্পিত হয়। নবীনদেহে আবার নূতন করিয়া জীবন আরম্ভ হয়, পুনরায় মরণের অপেক্ষায়।

যেইক্ষণে মাতৃগর্ভে দেহ জন্মে, সেই মুহূর্ত্ত মৃত্যুও দেহের সাথী হয়। নশ্বর দেহের বিনাশ হইবেই,- এর চাইতে সংশয়াতীত সত্য, আর কিছুই নাই। কিন্তু দেহাতিরিক্ত 'আমি' অবিনশ্বর। তাই 'আমি আখ্যাত' জীবাত্মা কি বস্তু,- ইহার স্বরূপ কি,- দেহের কোথায় কিভাবে তাহার অবস্থান,-এই জ্ঞাতব্য বিষয় পরবর্ত্তী নিবন্ধে ক্রমমান।

—ঃ—

"ঋতু বসন্তে আপনা আপনি শাখে শাখে অনুরূপে
নব কিশলয় বলিবার আগে যেমন করিয়া জাগে,
সেইরূপ ভাবে দেহীর দেহেতে পূর্ব্বকর্ম ফল,
আপনি আসিয়া উদিত হবেই, যথাকালে অবিকল।"

(মনুসংহিতা)

"The man dwelling xon sense objects. develops attach ment for them and from attachment springs up desire and unfulfilled desire ensures anger"

Gita 2/62

আমি ও আমার ধর্ম

আমি—কে

"আছি আমি, একথা স্মরিলে মনে মহান বিস্ময়,
আকুল করিয়া দেয়, স্তব্ধ এ হৃদয় প্রকাণ্ড রহস্যভারে।"

আমি কে,-ইহা অতীব মহত্তর প্রশ্ন। মানব সমাজে জ্ঞান বিকাশের সঙ্গে সঙ্গেই চিন্তাশীল ব্যক্তি গণের মনে এই প্রশ্নের সূত্রপাত এবং পরবর্ত্তী কালে নানা গ্রন্থে ইহার বিশদ আলোচনা হইয়াছে। বিস্মৃত অতীতে সঙ্কলিত 'বেদ' গ্রন্থের প্রথমেই এই আত্মতত্ত্ব উপস্থাপিত। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব বিবেক বৈরাগ্য লাভের ও ব্রহ্মজ্ঞান উপলব্ধির সহায়ক সিদ্ধপীঠ, কাশীধামে ভক্তপ্রবর শ্রীচন্দ্রশেখরের আবাসে অবস্থান কালে, সংসার মায়া মোহ বিমুক্ত শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী, হৃদয়ের আত্যন্তিক আবেগে, নানা বিঘ্নবিপত্তি অতিক্রম পূর্ব্বক তথায় উপনীত হইয়া, শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর সমীপ 'কে আমি' এই গুরুতর জিজ্ঞাসাই সর্ব্ব প্রথম উত্থাপন করিয়াছিলেন,- যাহার ইতিবৃত্ত শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থে সবিস্তার বর্ণিত রহিয়াছে।

অস্থি মাংস রক্ত সমবায়ে গঠিত দেহ এবং তাহাতে সঞ্চারিত প্রাণ-মন ইন্দ্রিয় বুদ্ধি প্রভৃতির নিত্য সম্বন্ধের হেতু হইতেই একটি সজীব মানুষ। কিন্তু স্বতঃপ্রবৃত্ত জিজ্ঞাসা আসিয়া যায়,- যদি ঐ সমুদয়ের সমষ্টিই 'আমি' বলিয়া বিবেচিত হয়, তবে মৃত অবস্থায় দেহ অবিকৃত থাকে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ও অটুট,- কিন্তু শায়িত শব-দেহটির আর 'আমি' জ্ঞান হয় না,- হয়ত পরিচয় প্রদানের কালে 'তাহা অমুকের মৃতদেহ' উল্লেখ করা হয়। এই অবস্থায় দেহের আমিত্ব কোথায় গেল,- কে দেহের অধিকারী ও আমিবোধের অনুভবয়িতা,- কাহার অবস্থানে দেহ ছিল সচল, জীবিত, পরিচিত এবং অন্তর্দ্ধানে মৃত বলিয়া পরিত্যক্ত। ইহাই যথার্থ জিজ্ঞাসা এবং 'আমি কে' ইহাও পরিপ্রশ্ন।

'আমি' দেহ ইন্দ্রিয়াদির সংঘাতে উদ্ভূত কার্য্য বিশেষ হইতে পারেনা। কারণ দেহেন্দ্রিয়াদির বস্তুগত অনুধাবনায় ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, দৈহিক পদার্থগুলি অচেতন এবং কোন চেতন, অথচ প্রজ্ঞাবান শক্তির দেহে অবস্থানকাল পর্যন্তই ইহারা ক্রিয়াশীল। পক্ষান্তরে অচেতন বস্তু হইতে চেতনার উদ্ভব কোন যুক্তিতেই সম্ভব নয়। যাহা যাহাতে নাই,- অর্থাৎ জ্ঞানহীন জড়বস্তু হইতে জ্ঞানবান চৈতন্যসত্তা 'আমি'র উদয় হইতে পারেনা। তাছাড়া তিলে তৈল পদার্থ রহিয়াছে বলিয়াই তাহা নিষ্পেষণ করিয়া তেল উৎপন্ন হয়,- ধান্য নিষ্কাশিত করিয়া নয়। সুতরাং যেই দ্রব্যগুণ যাহাতে নাই, তাহা হইতে সেই দ্রব্য লাভ হয় না এবং অজৈব পদার্থ হইতে প্রাণশক্তি বিশিষ্ট জীব বা 'আমি'র উৎপত্তি হইতে পারে না। উল্লেখযোগ্য যে, বিশ্ব ও মানব প্রকৃতি নিয়া গবেষণারত জড় বিজ্ঞানের পদ্ধতি অনুসরণে তর্ক বিচার দ্বারা অতীন্দ্রিয় আত্মতত্ত্বের আলোচনা চলেনা। কারণ বিজ্ঞানীর অনুসন্ধান পরিবর্ত্তনশীল ব্যবহারিক

সত্যের এবং দার্শনিকের দৃষ্টি স্থিতিশীল পারমার্থিক সত্যের প্রতি। সুতরাং আপন প্রত্যক্ষ ও তন্মূলক অনুমানের উপর নির্ভর করিয়াই নিঃশ্রেয়কর তত্ত্ববিদ্যা আয়ত্ত করিতে হয়। সর্ব্বোপরি অপৌরুষেয় বেদের অনুধাবনা।

আমার চিন্তন, মনন, অনুভাবন প্রভৃতি চেতনার পরিচায়ক। যখন চিন্তা করি, ভালমন্দ বুঝি, রাগদ্বেষাদি প্রকাশ করি, তখন এই 'আমি' যে চেতনসত্তা সেই বিষয়ে সংশয় থাকে না এবং চেতনা দেহের ধর্ম নয় বলিয়া, এই চৈতন্যবস্তুর সংযোগেই দেহেন্দ্রিয়াদি সচেতন হইয়া থাকে। সুতরাং নশ্বর ও অচেতন দেহ ইন্দ্রিয় প্রাণমন বুদ্ধি, ইহার কিছুই 'আমি' নহে। ইহাদের কোন একটি ইন্দ্রিয় বিশেষের অভাব, বা অক্ষমতা ঘটিলেও 'আমি' জ্ঞানের বিলোপ হয় না,- অর্থাৎ কোন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কর্ত্তিত, অসাড়, চক্ষু দৃষ্টিশক্তি রহিত, এমন কি মস্তিষ্কের বিকৃতি হইলেও,- আমিত্ব জ্ঞানের বিন্দুমাত্রও বিনষ্ট ঘটে না। সুতরাং আমিত্ববোধ অবশ্যই দেহেন্দ্রিয়াতিরিক্ত অপর কোন সত্তা হইতে উত্থিত হয়। জন্মলাভের সাথেই ইন্দ্রিয় জ্ঞানাদির সংস্কার সেই সত্তায় বিন্যস্ত থাকে এবং বয়োবৃদ্ধির সহিত পূর্ব্বজন্ম বাসনার ঝোঁক, হয়ত কতকটা পরিবর্ত্তিত হয়,- অথবা সাধুজন সংসর্গে উৎকর্ষ সাধন ঘটে। পরন্তু ইন্দ্রিয়াদি সহায়ে দেহদ্বারা কৃত কর্ম্মের অথবা অভিজ্ঞতা দ্বারা আরব্ধ যে সকল জ্ঞান উপলব্ধ হয়,- ইন্দ্রিয়ের অতীত হইলেও, তাহাদিগকে আমরা অনুভাবে ধরিয়া রাখিতে পারি এবং যে ইন্দ্রিয় সহযোগে বিষয় বিশেষ ধারণায় আসিয়াছিল, তাহা নষ্ট হইয়া গেলেও,- অর্থাৎ চক্ষুদ্বারা দৃষ্ট দৃশ্য কিংবা কর্ণদ্বারা শ্রুত বিষয়,- চক্ষু দৃষ্টিহীন, কর্ণ বধির হইয়া পড়িলেও, তাহার গুণগ্রাম আমাদের দেহস্থিত যেই পদার্থ বা সত্তায় অঙ্কিত রহিয়া যায়,- তাহাই জীবাত্মা বা সংস্কারাচ্ছন্ন 'আমি'।

এই জীবাত্মাই জন্ম জন্মান্তরের বিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া দেহের 'আমি' সত্তাটিকে ধারণ করিয়া থাকে। আত্মার জন্ম মৃত্যু নাই,- ইনি চৈতন্যসত্তা এবং আমি অভিমানী জড় দেহে চেতনা প্রদায়িকা শক্তি। 'আমিসত্তা' জীবনের অভিজ্ঞতা সমূহের সারাংশ আহরণ করিয়া চলে দেহের জীবিতকাল পর্য্যন্ত এবং আপন ক্রমবিকাশের ধারায়, উহাকেই আত্মবিকাশের ভিত্তি স্বরূপে, পরবর্ত্তী জন্মের জীবনে সঞ্চারিত করিয়া দেয় স্থূলদেহের অন্তর্ব্বর্ত্তিন মনোময় কোষের মধ্য দিয়া,- যেমন শীত ঋতুতে পত্রশূন্য বৃক্ষ, বসন্ত সমাগমে স্বীয় সত্তা হইতে প্রাণ সঞ্চার করিয়া পত্র পুষ্প ফলের সমারোহে পুনর্জন্ম লাভের মতই পুনরায় সৌন্দর্য্যের শোভায় বিকশিত হয়। উল্লেখযোগ্য যে, স্থিরবস্তুর অবস্থান্তর তাহারই ধারা,- যেমন সমুদ্রের তরঙ্গ, ফেনা। সরলার্থ এই রূপ,- যাহার সৃষ্টি ও লোপ হইতেছে, তাহার মূলে একটি স্থিরবস্তু বিদ্যমান, যেমন ঘটের উৎপত্তি ও

বিনাশ হইতে গেলে, মৃত্তিকারূপ স্থিরবস্তু আবশ্যক। অতএব জীবদেহের জন্মমৃত্যু লক্ষ্য করিয়া, ইহার মূলস্বরূপ বা স্থিরবস্তু 'জীবাত্মা' বা 'আমি'র নিত্যত্ব স্বীকৃত হয়।

আমরা সচরাচর লক্ষ্য করিয়া থাকি, অতি অতীতে দৃষ্ট বা আস্বাদিত কোন বস্তু, প্রত্যক্ষের ন্যায় উপলব্ধ হয়,-যেমন পূর্ব্বে অনুভূত কোন তিক্ত ঔষধের কথা মনে পড়িলেই, বিস্বাদে রসনা আপনা হইতে বিকৃত হয়,- কাহারও বিবমিষাও আসিয়া যায়। পদার্থের অনুপস্থিতিতে, কেবল স্মৃতিদ্বারা সাধিত এই কার্য্য, নিশ্চয়ই কোন চৈতন্যসত্তার প্রতিক্রিয়া, যাহা জড়পদার্থে নাই। সুতরাং ইহাই প্রতিপাদিত হয় যে, প্রত্যেকটি জীবনের মূলে জড়াতিরিক্ত একটি পরমচেতনা শক্তি বিদ্যমান,- যাহা 'জীবাত্মা' অভিহিত হইয়া জীবিত মানব শরীরে 'আমি' সজ্ঞায় সংজ্ঞিত। পক্ষান্তরে চরাচর নিখিল বিশ্বে এক চৈতন্যময় আত্মপুরুষ চির বিরাজিত,- তিনি পরমাত্মা, অর্থাৎ জীবাত্মারও আত্মা। তাই জীবাত্মা ও পরমাত্মার মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রহিয়াছে এবং ইহাই ভারতের আধ্যাত্মিক বা ধর্মীয় সনাতন তত্ত্ব।

রূপরস গন্ধ প্রভৃতি জড়ীয় বাহ্যিক গুণের আধার হিসাবে জাগতিক জড়দ্রব্য পরিচিত। পক্ষান্তরে সুখদুঃখাদি অতীন্দ্রিয় গুণের আশ্রয় 'আত্মা' এবং সর্ব্ব শক্তিমত্তা, সর্ব্বজ্ঞতা পরম জ্ঞানের অধিষ্ঠান ক্ষেত্র, ঈশ্বর বা পরমাত্মা,- যিনি 'আমি' রূপে প্রতিভাসিত জীবাত্মার পরিচালক। সুতরাং জড়ত্ব ও জ্ঞানত্ব,- এইরূপ দুইটি পৃথকভাব জগতে সুস্পষ্ট। জড়ভাব অচেতন,- প্রকৃতি পরিচালিত। জ্ঞানভাব সচেতন,- 'আমি' ইহার ধারক। আমাদের ইন্দ্রিয় বৃত্তি, মনেরবৃত্তি, হৃদয়বৃত্তি প্রত্যক্ষানুভূতি,- জড়ীয়শক্তির কার্য্য হইতে পারে না। কারণ আমি ও আমার জ্ঞান প্রসারিত হইয়া, আমাদের অনুভূত সুখদুঃখাদি যে অপর ব্যক্তিরও সুখদুঃখদায়ক হয় ইহা প্রত্যক্ষজ্ঞান নহে,- অনুভবের বিষয়। অর্থাৎ নিজ দেহে আঘাত পাইলে আমার যেরূপ ক্লেশ হয়,- অনুরূপ আঘাত প্রাপ্ত ব্যক্তিরও সেইরূপ ক্লেশ হইবে,- এই আত্ম প্রত্যয়, অন্যান্য প্রত্যেক 'আমি'র জ্ঞান দ্বারাই উপলব্ধ হইয়া থাকে। অপিচ কাহারও বাক্য দ্বারা অপমানিত হইলে, দেহ তাহা অনুভব করেনা,- অপমানবোধ, ব্যক্তি বিশেষের আমি বোধক সত্তার ব্যক্তিগত জ্ঞান। পরন্তু ইন্দ্রিয় লভ্য জ্ঞান কেবল মাত্র ইন্দ্রিয়াদির মাধ্যমেই জ্ঞাত হওয়া সম্ভব নয়। তাৎপর্য্য এই, চক্ষু না থাকিলে দেখা যায় না,- কিন্তু চিত্ত যখন কোন বিশেষ ভাবনায় দৃঢ় বদ্ধ থাকে, তখন চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের সম্মুখে বৃহৎ ব্যাপার ঘটিয়া গেলেও তাহার প্রত্যক্ষ অনুভূতি হয় না। সুতরাং ইন্দ্রিয়সমূহে বাহ্যজগতের সম্বন্ধ হইলেও, চিত্তবৃত্তি তাহাতে নিয়োজিত না থাকিলে, দৃষ্ট বা শ্রুত বিষয়, জ্ঞানে পরিণত হয় না। কাজেই স্বীকার করিতে হয়, ইন্দ্রিয়াতিরিক্ত 'চিত্ত' বলিয়া কোন স্বতন্ত্র

পদার্থ আছে, যাহা হইতে সংবিদ্‌ বৃত্তির, অর্থাৎ চেতনার সঞ্চরণ হইয়া জ্ঞানক্রিয়া নিষ্পন্ন হয় এবং এই চিৎবৃত্তির ধারকই আমিভাবাপন্ন, দেহাতিরিক্ত 'জীবাত্মা'।

প্রজ্ঞাই আত্মার যথার্থরূপ এবং শুদ্ধ সত্তারূপে জীবাত্মা দেহের সহিত যুক্ত হইলে, আমিত্ব সংলগ্ন সংস্কার দেহেন্দ্রিয়াদিতে পরিস্ফুট হইয়া 'ইহা আমার দেহ' এরূপ অভিমান হয়। যেহেতু আত্মা দেহাতিরিক্ত সত্তা এবং এক অযৌগিক বস্তু, যাহা কোনমতেই বিশ্লিষ্ট হইতে পারে না বলিয়া ধ্বংশশীল বা পরিবর্ত্তনীয় নয়,- অর্থাৎ সততই শুদ্ধমুক্ত এবং জীবের 'আমি' বাচক। তথাপি নশ্বর দেহে অধ্যাসিত 'আমিত্ব' বা দেহাত্মপ্রত্যয়, আধাত্মিক অনুধাবনার অনুক্ষণ অনুশীলনে অতিক্রম করা যায়। ভাবার্থ এই, দেবপ্রবৃত্তিরূপ আত্মস্বরূপে অবস্থান অর্থাৎ মনুষ্যত্ব অর্জ্জনই জীবের নৈতিক ও পারমার্থিক জীবনের আদর্শ। কিন্তু পাশবিক সংস্কার বিমোচিত হইয়া আত্মোন্নতি পরিপূর্ত্তি লাভ না করা পর্য্যন্ত, মানুষের ভিতরকার দেবত্ব বা দেবসত্তা, অর্থাৎ মানবধর্ম সম্যক প্রকাশিত বা পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় না এবং কলুষ কামনায় আবিল 'আমি'র মলিন সংস্কার অপসারণ করিয়া, প্রজ্ঞায় বা তত্ত্বজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হইতে,- অর্থাৎ 'আমি' সত্তাকে আত্মিক চেতনার ঊর্দ্ধভূমিতে উত্তরণ করিতে,- কিংবা নিম্নগামী প্রবৃত্তিকে, ঊর্দ্ধগামী নিবৃত্তিমুখী নিশ্চল রাখিতে, ক্ষেত্রবিশেষে জন্ম জন্মান্তরের সাধনা সাপেক্ষ। সুতরাং পরবর্ত্তী জন্মেও অন্তরের ঈপ্‌সা বহনকারী জীবাত্মায় 'আমি' ভাবের অমরতা অপরিহার্য্য।

'আমি' বা 'আমার' সুখদুঃখাদির অনুভূতি রহিয়াছে,- আছে বিষয়বিশেষে ঔদাসীন্য, ইন্দ্রিয়াদি সংঘাতে উৎপন্ন জ্ঞান,- ইচ্ছাঅনিচ্ছা, সঙ্কল্পবিকল্প আছে,- নিজের ইচ্ছানুযায়ী অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সঞ্চালনের সামর্থ্য বা যোগ্যতা সর্ব্বদাই পরিলক্ষিত,- হেয় উপাদেয় নির্ণয়ে ত্যাজ্য-গ্রাহ্য করিয়া, কর্ম করিবার প্রয়াস অব্যাহত,- ভালমন্দ, হিত-অহিত, সুবিধা-অসুবিধা, প্রীতিকর-অপ্রীতিকর, নির্দ্ধারণের নিপুনতা স্বতঃই বিদ্যমান। যেখানে জীবচৈতন্য বিরাজিত, সেইক্ষেত্রেই এইরূপ জীবনলক্ষণ বা চৈতন্যের ক্রিয়া দৃষ্ট হয়। যদিও জন্তু জানোয়ার, কীটপতঙ্গ, এমনকি লতা বৃক্ষ, গুল্মাদিতেও চৈতন্যশক্তি বর্ত্তমান,- কিন্তু ইহা কেবল ভোগদেহ বলিয়া, তাহাতে স্বতন্ত্র ইচ্ছাশক্তির প্রকাশ নাই। একমাত্র মনুষ্যজাতির মধ্যেই ইচ্ছার বিকশিত প্রয়োগ পরিস্ফুট এবং আত্মতত্ত্বের পরিচায়ক ইচ্ছাবৃত্তি,বুদ্ধিবৃত্তি,হৃদবৃত্তি সহায়েই 'আমি' সংজ্ঞিত জীব, জীবনের সর্ব্বোত্তম মহিমায় উত্তীর্ণ হইতে পারে। যেহেতু বেদবাক্য অনুসরণে 'আপন আত্মাকে জান' বা নিজেকে জানিব,- এই আত্মিক অঙ্গীকার হইতেই আসে, সাধনার অভ্যাস,- তাই 'আমি'র মনন শক্তিতেই ঈশ্বর বৈমুখ্য পরিণত হয়, অভিমুখিতায়,- মানসিক উৎকর্ষ

সাধনেই, জ্ঞানের প্রাখর্য্য হইতে, ভগবৎ ভক্তিরূপ স্নিগ্ধতার কারুণ্য জ্যোৎস্নার আন্তরিক অনুরাগে, অনুরঞ্জিত হয় হৃদয়। বলশালী মনই ধারণ করে, বিশ্বাসের নিষ্কম্প বর্ত্তিকা,- মনের বলেই দুস্ত্যজ প্রকৃতির পরাক্রম অতিক্রম করিয়া, প্রাক্তনের গতি পরিবর্ত্তন সম্ভব,-যেমন প্রখর রৌদ্র শিশির নাশ করে। সুতরাং 'আমি'ই 'আমার' জীবন নির্দ্ধারক ও মনের গতি নিয়ামক।

উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে, অর্থাৎ পরমাত্মা বা ঈশ্বর হইতে জীবাত্মা বা আমি সর্বদাই স্বতন্ত্র সত্তায় অধিষ্ঠিত,- এই সম্পর্কে এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুর উক্তি "সর্ব্বত্র প্রমান দিবে শাস্ত্রের বচন" অনুসারে দিগদর্শনরূপে উপনিষদও গীতার বাণী উল্লেখ করা যায় যে, শ্বেতাশ্বতরের প্রথম অধ্যায় ষষ্ঠ, নবম, দশম শ্লোক অনুমতে অল্পজ্ঞ জীব,- সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বনিয়ন্তা, একমাত্র শাসক কর্ত্ত, পরমেশ্বর হইতে ভিন্ন। তৈত্তিরীয়ের দ্বিতীয় অধ্যায়, প্রথম অনুবাকের প্রথমেই কর্ম ও জ্ঞানের অধিকারী উপাসক জীব ও বিপশ্চিৎ ব্রহ্মের পৃথকত্ব নির্দ্দেশ রহিয়াছে। কঠোপনিষদে দ্বিতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় বল্লীর ত্রয়োদশ শ্লোকে পরমেশ্বর বহু জীবের কাম্যফল বিধানকর্ত্তা ও সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা বলা আছে। মুণ্ডকের তৃতীয় মুণ্ডক প্রথমখণ্ড তৃতীয় শ্লোকে ভগবৎ সাক্ষাৎ প্রার্থী সাধক, তাঁহাকে দর্শন করেন জানা যায়। ছান্দোগ্যের অষ্টম অধ্যায় তৃতীয়, চতুর্থ সূক্তে দেহত্যাগের পর জীবাত্মার পরমজ্যোতিঃ সম্পন্ন স্বীয় পৃথক স্বরূপে অবস্থিতি স্বীকৃত। বৃহদারণ্য চতুর্থ অধ্যায় তৃতীয় ব্রাহ্মণের ত্রিংশ কণ্ডিকায় জ্ঞাতা বা আমি-র জ্ঞান বিলুপ্ত হয়না উল্লেখ। উপরন্তু শ্রীগীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের দ্বাদশ শ্লোকে, জীবের আত্মস্বরূপে নিত্য বিদ্যমানতা,- চতুর্থ অধ্যায়ের পঞ্চম শ্লোকে, জীবের বহু জন্ম এবং দশম শ্লোকে ভগবৎ শরণাগতিদ্বারা ভগবদ্ভাব প্রাপ্তি,- অষ্টম অধ্যায়ের বাইশ শ্লোকে, ভগবান অনন্যা ভক্তি দ্বারা লভ্য,- চতুর্দ্দশ অধ্যায়ের দ্বিতীয় শ্লোকে, ব্রহ্মজ্ঞান আশ্রয়ে নিত্য ভগবৎভাবে স্থিতি,- পঞ্চদশ অধ্যায়ের পঞ্চম শ্লোকে পরমপদ অন্বেষণকারীর পরমধাম প্রাপ্তি,- যেই মহাবাক্য কঠোপনিষদের দ্বিতীয় অধ্যায় দ্বিতীয় বল্লীর পঞ্চদশ শ্লোকের,- শ্বেতাশ্বতরের দ্বিতীয় অধ্যায় চতুর্দ্দশ শ্লোকের এবং মুণ্ডকের দ্বিতীয় মুণ্ডক দশম শ্লোকের যথাবৎ প্রতিধ্বনি। উদ্ধৃত শাস্ত্রবাক্য অনুধাবনায় ইহা সুস্পষ্ট হয় যে, ঈশ্বর ও জীবে নিত্য ভেদ রহিয়াছে এবং অবিনশ্বর জীবাত্মায় আমি বোধও নিত্যস্থির।

বৈদিকযুগে ব্যবহৃত ভাষা ও তাহার প্রয়োগ প্রণালী হইতে আমরা এত অধিক দূরে সরিয়া আসিয়াছি যে, অতি আধুনিক যুগে বেদের বহু শব্দই অপ্রচলিত। দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা যায় যে,- কেদার খণ্ডের অযোধ্যারাজ সগরের অনুপ্রেরণায় তদীয় পৌত্র ভগীরথ কর্ত্তৃক, গাড়োয়াল হিমালয় প্রদেশের চিরতুষারাচ্ছন্ন হিমবাহ পর্ব্বত শীর্ষে

আমি—কে

অবরুদ্ধ অন্তঃ সলিলা, অথচ প্রশান্ত বাহিতা কম্পিত কলনাদিনী সুরধুনী নামীয় গাঙ্গেয় জলধারা স্রোতবহারূপে, আপন সাম্রাজ্যে আনয়ন করিবার প্রচেষ্টা প্রসঙ্গে মহাপুরাণে যে "অশ্ব" শব্দ, মহাভারতে "শিবের জটা" "অশ্বমেধ" এবং,, ইন্দ্রকর্ত্তৃক অশ্বঅপহরণ" বাক্যের উল্লেখ পাওয়া যায়,- ঋগবেদ মণ্ডলের তৃতীয় | চতুর্থ সূত্র অনুযায়ী, এই ক্ষেত্রে অশ্ব বলিতে ভূপৃষ্ঠ খনক যন্ত্র অর্থবোধক। তৎসময়ে ব্যবহৃত ঐরূপ যান্ত্রিক কৌশল যান অবরোধ মুক্ত জল প্রপাতবেগে মহাসাগর তীরবর্ত্তী পাতাল আশ্রম কথিত, কপিলমুনি তপোবনে আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল। উক্ত যন্ত্রের অনুসন্ধানরত, পুত্রস্নেহে লালিত সংশ্লিষ্ট কর্মীগণ, হয়ত তপঃভূমি সন্নিহিত সাগর সঙ্গমে অকস্মাৎ উৎপন্ন জলস্তম্ভের টানে গভীর সমুদ্রে ভাসিয়া গিয়াছিল,- যাহা পরবর্ত্তী কালের উপাখ্যানে, অনধিকার পূর্ব্বক সাধন ক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া তপশ্চরণের বিঘ্ন ঘটাইবার অপরাধে, কপিলমুনির তপঃ প্রভাবের কোপানলে, সগররাজার ষাট হাজার পুত্রের ভস্মীভূত হইবার রূপক।

মহাভারতে বর্ণিত, মহাদেব কর্ত্তৃক তদীয় জটাজুটে তীব্র বেগশালী গঙ্গার পতনশীল গতি সংযত করিবার ভাবার্থ সম্পর্কে বলা যায়,- 'জটা' অর্থে অতি উন্নত বৃক্ষ হইতে প্রলম্বিত প্রলম্ব বা গাছের ঝুরিও নির্দ্দেশ করে এবং তদানীন্তন কৈলাসাধিপতি শিবের অধিকারভুক্ত দুরধিগম্য হিমালয় শিখর বেষ্টিত গঙ্গা জলরাশির অবতরণ স্থান, বক্রভাবে উত্তরাভিমুখী বলিয়া 'গঙ্গোত্রী' যেন দেবাদিদেব মহাদেবের শিরোরুহ সাদৃশ্য নগাধিরাজ শীর্ষদেশ হইতে জটার ন্যায় লম্বমান এবং হয়ত ইহারই পরিপ্রেক্ষিতে কাব্য সাহিত্যের মাধুর্য্যসাধক রচনাভঙ্গীর আলঙ্কারিক ভাষায় "মহাদেবের জটা হইতে গঙ্গার অবতরণ" কিংবদন্তি সংযোজিত। উল্লেখযোগ্য যে, আকাশের মত অতি উচ্চ-স্থান হইতে উন্নত মহিমার অমৃত প্রবাহিনী মনোমোহন গতিতে পতিত বা অবতীর্ণ বলিয়াই যেন, মহাদেবের তৎকালীন নিবাসস্থলের নিকটবর্ত্তী 'কেদারনাথ অংশের অন্ত-বর্ত্তী স্বচ্ছ সলিলা জলপ্রবাহ,- "আকাশগঙ্গা" এবং বদ্রীনাথ অংশের অপেক্ষাকৃত নিম্নভাগ দিয়া প্রবাহিত কপিশবর্ণের স্রোতোধারা "পাতাল গঙ্গা" আখ্যাত।

অভূত পূর্ব্ব প্রযুক্তি বিদ্যা, তথা কঠিন কঠোর শ্রমসাধ্য গঙ্গার উৎস সন্ধান কার্য্যে প্রথমেই পুত্র দিলীপকে হিমালয় প্রদেশের স্বর্গভূমি অঞ্চলে প্রেরণের প্রাক্কালে, সম্রাট সগর কর্ত্তৃক 'অশ্বমেধ' অনুষ্ঠানের উদ্যোগ সম্পর্কে বলা যায় 'মেধ' শব্দের আভিধানিক অর্থ 'যজ্ঞ' বা বৃহৎ ক্রিয়া কর্ম,- প্রকারান্তরে বিশিষ্ট কোন কর্মারম্ভের বৈদিক ধর্মানুযায়ী মঙ্গলাচার,- যাহা অদ্যাপিও প্রচলিত। তৎকালে অশ্বপৃষ্ঠে রাজ পতাকা শোভিত করিয়া, রাজদূত কর্ত্তৃক রাজন্যবর্গকে নিমন্ত্রণ লিপি প্রদানের রাজকীয় প্রথা প্রচলিত ছিল এবং সম্রাট সাক্ষরিত আমন্ত্রণপত্র প্রত্যাখ্যানকারী রাজদ্রোহী গণ্য

হইত। হয়ত ঐ সময় কোন বিরুদ্ধাচারী সামন্ত র জ অনুচরদ্বারা বিপথে পরিচালিত হইয়া, রাজ প্রতিরূপ স্থানীয় পতাকা বাহিত যজ্ঞীয় অশ্ব পর্ব্বতমালার হিম-শিলায় প্রোথিত হইয়া গিয়াছিল,- যাহার কাল্পনিক ইতিবৃত্ত বহু পরবর্ত্তী সময়ে প্রবর্ত্তিত রসাল কথকতার রসালাপে 'ইন্দ্রকর্ত্তৃক যজ্ঞাশ্ব অপহরণ' রূপকথায় বিন্যস্ত হইয়া বাংলা প্যারে রচিত মহাকাব্য মহাভারত গ্রন্থে প্রক্ষিপ্ত হইয়া যায়।

প্রণিধান যোগ্য যে, পুরাণ সংহিতায়, হিমালয়স্থ গোমুখী অংশকে, অর্থাৎ গরুর মুখের মত গুহা বা গহ্বর হইতে নিঃর্গতা গঙ্গাবিধৌত মানসসরোবর এলাকার হিম-শীতল নীরবতার নৈসর্গিক শোভায় রমণীয়, অবাধ দুর্লঙ্ঘ গিরিকন্দরে সাধনায় রত সংসার বিরক্ত যোগীগণের তপস্যা কেন্দ্রকে "স্বর্গভূমি",- সংসারাসক্ত বিষয়ী জনগণের পশুপালন ও কৃষিযোগ্য ভুভাগকে "মর্ত্ত্যভূমি" এবং সাগর প্রান্তবর্ত্তী নিবিড় অরণ্য ও শ্বাপদ সঙ্কুল বনচারী অধ্যুষিত ভূখণ্ড অঞ্চলকে "পাতালভূমি" উল্লেখ রহিয়াছে। ইহার পরিপোষকে মহাভারত আদিপর্ব্ব হইতে উল্লেখনীয় যে,- যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত পাণ্ডু, স্বর্গস্থলী পথপ্রান্তের শৈলাবাসে অবস্থানকালে, দলে দলে লোক স্বর্গভূমি অভিমুখে গমনরত দেখিয়া জিজ্ঞাসায় জানিয়াছিলেন,- ঐদিন স্বর্গলোকে ব্রহ্মার পৌরহিত্যে এক মহতী সম্মিলনে পিতৃস্থানীয় ব্রহ্মর্ষি, মহর্ষি, ঋষিগণ আগমন করিবে ,-(সেখানে প্রজাপতি ব্রহ্মার দর্শন মানসে তাহারা যাইতেছে) সমবায়ো মহানদ্য ব্রহ্মলোকে মহাত্মানাম্ দেবানাঞ্চ ঋষিনাঞ্চ পিতৃনাঞ্চ স্বয়ম্ভুবম্। বয়ং তত্র গমিষ্যামো দ্রষ্টুকামাঃ প্রজাপতিম্),- যেখানে জিজ্ঞাসুর মৌন জিজ্ঞাসা এবং আচার্য্যের মৌন উত্তর।

তাৎপর্য্য এই,- ব্রহ্মজ্ঞপুরুষ দর্শনেই সকল সংশয় নিরসন হইয়া, অন্তরে ব্রহ্মজ্ঞান স্বতঃ স্ফুরিত হয়, যাহা শ্রীমদ্ভাগবতে ঋষিবাক্য (দর্শনাদেব সাধক)। কুরুক্ষেত্রের মহা আহব অবসানের পর হৃদয়ের সন্তাপে বিষাদগ্রস্ত যুধিষ্ঠির, যে গবলে আয়ুষ্মান, সর্ব্ব-জন বন্দিত' ত্রিকালজ্ঞ, সাধকগণের সান্নিধ্যে বাস করিবার জন্য, মহাপ্রস্থানের প্রাণ সংশয় পথে, সারমেয় সঙ্গীসহ তপস্তব্ধ পুণ্যধন্য এই স্বর্গভূমিতেই উপনীত হইয়াছিলেন। বেদবিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী গৌতম ঋষি, তদীয় পুত্র উপনিষদোক্ত মহামতি শ্বেতকেতুকে ব্যবহারিক শিক্ষা অর্জ্জনের জন্য মর্ত্ত্যভূমির পাঞ্চালরাজ প্রবাহণের নিকট প্রেরণ করিয়া ছিলেন,- যেহেতু সেই যুগে মর্ত্ত্যলোকেই জ্ঞান এবং কর্ম্মের মিলনে বিবিধ প্রকার লৌকিক বিদ্যা চর্চ্চার ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল।

কঠোপনিষদের বাজশ্রবস ঋষিপুত্র, দৃঢ় প্রতিজ্ঞ বালক নচিকেতার জটিল পরলোক তত্ত্ব,- অর্থাৎ মৃত্যুর পরপারে জীবাত্মার অস্তিত্ব বিষয়ক জ্ঞান বা নিঃব্যাধি, জরা, দুঃখশোক আকীর্ণ, ক্ষণস্থায়ী মর্ত্ত্যজীবন যবনিকার অন্তরালে জীবের অমর জীবনধারা

রহস্য,- বিদিত হইবার অভিলাষে দক্ষিণ দিকপতি,- অর্থাৎ পাতালভূমিতে অবস্থিত 'যমপুরী' নামক কারাগার অধ্যক্ষ বা অধিপতির নিবাসে, অর্থাৎ যমালয়ে,- হৃদয়ের উৎসাহ ও ব্যাকুলতার ঐকান্তিক আগ্রহের তন্ময়চিত্তে উপনীত হইয়া,- তিনদিবস অভুক্ত অবস্থায় তথায় অবস্থান করিবার আখ্যায়িকা, এরূপ ইঙ্গিতবহ যে,- ত্রিবর্গ বিদ্যায় চরম ও পরম বিকাশ প্রাপ্ত তত্ত্বদর্শী ধর্মরাজ যম, গভীরভাবে নিবিষ্ট অন্তর্মুখী তপস্যার তত্ত্ব ধ্যানে,- বড় গূঢ়, সকলের হৃদয়ে অন্তরাত্মারূপে অবস্থিত শব্দ-স্পর্শ-রূপের অতীত, অনাদি-অনন্ত অব্যয়, শুদ্ধ-অমৃত জ্যোতির্ময়,- আত্মার স্বরূপ পরিজ্ঞাত ছিলেন,- যাহা ক্ষণিক জীবনের সম্ভোগ সর্বস্ব মানসিকতার আপাত উল্লাসে, ব্যক্তিক মতভেদ ও বৈষয়িক ভাবনায় অভ্যস্ত তৎকালীন মর্ত্ত্যভূম বাসী জনগণের আলোচ্য বিষয় ছিল না।

লক্ষণীয় যে, তুষার ধবল হিমবাহ গলিয়া গলিয়া সৃষ্ট, রজত শুভ্র গিরিতীর্থ গোমুখ হইতে বহির্গত হইয়া, উপল বিছান অসমতল জঙ্গলকীর্ণ স্বর্গভূমিপথ অতিক্রম পূর্ব্বক,- মর্ত্ত্যভূমির ছায়াসুনিবিড় পথে উবর প্রান্তর শান্তশীতল জলধারায় উর্ব্বরা করিতে করিতে,- পাতালভূমি পথ জলময় অবরুদ্ধ পতিত জমি স্রোতপ্রবাহে যুক্ত বা উদ্ধার করিয়া, পতিতোদ্ধারিণী আখ্যাত, সাগর মোহনা অভিমুখে বহমান,- এই ত্রি-পথ লঙ্ঘনকারী, গঙ্গার বেদোক্ত নাম, ত্রিপথগা"। অপরন্তু মন্দার বৃক্ষশোভিত মন্দরপর্ব্বত মধ্যস্থল দিয়া, গঙ্গাপ্রবাহের 'স্বর্গপথ' অংশ,- মন্দাকিনী,- মহারাজ ভগিরথ কর্ত্তৃক, স্বীয় শৌর্য্যের দক্ষতা কৌশলে আনীত বলিয়া, 'মর্ত্ত্যপথ' অংশ,- ভাগিরথী,- এবং ভোগসর্ব্বস্ব 'পাতালপথ' অংশ,- ভোগবতী,- কথিত হইয়া, পুরাণসংহিতায় সমগ্র গঙ্গাবারি ধারার বিশেষ নাম,- "ত্রিধারা" সংযোজিত। ইহাদ্বারা অবশ্যই অনুমিত হয়, বৈদিকযুগে ভারতভূমি,- স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল, এই ত্রিধা সংজ্ঞায় বিশেষিত হইত,- যাহা যথাক্রমে সাধক, শাসক ও শ্রমিকের নিজ নিজ কর্ত্তব্য সাধনের অন্তর্গত ছিল।

বেদ সঙ্কলন পূর্ব্ব সময়ে, মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিগণের মানস নেত্রে উদ্ভাসিত 'বেদসূক্ত, শ্রুতিধর বিদ্যার্থী কর্ত্তৃক শ্রুত বা শুনিয়া স্মৃতিতে ধরিয়া রাখা হইত বলিয়া, বেদের বিশেষ নাম,- স্মৃতিশাস্ত্র বা 'শ্রুতি'। বিভিন্ন সময়ে বিচিত্র পরিবেশে সূত্রাকারে গ্রন্থিত, শব্দ ব্রহ্মের মর্মার্থ যথাযথ অনুধাবন, তাই অতীব দুরূহ। উত্তরকালের পৌরানিক যুগ বেদবাক্যের তত্ত্ব বিশ্লেষণ অলৌকিক রূপকর আড়ালের অর্থালঙ্কারে রূপায়িত। মহাভারতে বর্ণিত মূলশ্রুতি রহস্য, শব্দালঙ্কার ভূষিত উপাখ্যানে আচ্ছাদিত। প্রাদেশিক ভাষায় রূপান্তরিত রামায়ণে আঞ্চলিক জনপ্রবাদ প্রভাব ও মনোরঞ্জক কল্পিত বৃত্তান্তের অনুপ্রবেশ অনুভবযোগ্য। এই কারণে যুক্তিনির্ভর বিজ্ঞান মানসিকতার অতি আধুনিক কালে, অপৌরুষেয় বেদবাক্যের অন্তর্গূঢ় তাৎপর্য্য নিরূপণ,- প্রাসঙ্গিক প্রসঙ্গের নিরিখে ও তৎকালে ইঙ্গিতবহ সম্ভাব্য অর্থবাদ বিবেচনা ব্যতীত যেন গত্যন্তর নাই।

আমি ও আমার ধর্ম

ঋষিগণের অতুলনীয় বিদ্যা ও অলৌকিক জ্ঞানের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন ও ব্রহ্মবিদ্যার আকর 'বেদ' দুইভাগে বিভক্ত,- সংহিতা ও ব্রাহ্মণ। সূক্ত সকল সংহিত, অর্থাৎ সংগৃহিত করিয়া, সূত্রাকারে গ্রন্থিত বলিয়া 'সংহিতা',- যাহা ঋক, যজু সাম, অথর্ব্ব নামে চারি শ্রেণীতে পৃথককৃত। তন্মধ্যে ছন্দোবদ্ধ রচনা,- পৃথিবীর প্রাচীনতম গ্রন্থ ঋক্‌বেদে, আর্য্য বা হিন্দুজাতির বাসস্থান, জীবনযাত্রা প্রণালী ও সামাজিক রীতিনীতির বিবরণ অধিক। ইহাতে পঞ্চনদ ও সিন্ধু প্রদেশের বিশেষ উল্লেখ থাকায়, তৎকালে সেই অঞ্চলে, এই বেদ সঙ্কলিতাগণের বসতি ছিল, এরূপ অনুমান করা হয়। ঋক বেদেই 'বিশ্বদেব' বা মহাশক্তির প্রতীক 'ব্রহ্ম' উপাসনা প্রবর্ত্তিত। যজুর্ব্বেদ প্রধানত যজ্ঞানুষ্ঠানের মন্ত্র ও শ্রদ্ধ পদ্ধতি প্রকরণ। তৃতীয় সঙ্কলন সমাবেদে আত্মোন্নতিমূলক স্তব বাক্যের প্রাধান্য। সর্ব্বাপেক্ষা অপ্রাচীন অথর্ব্ববেদে, উচ্চভাবের ব্রহ্মজ্ঞানসূচক মন্ত্রাদি থাকিলেও, বিশেষভাবে রোগনাশ, শত্রুনিধন, কবচধারণ, ঔষধ প্রয়োগ প্রভৃতি তথ্যই সমধিক। এতৎব্যতীত বেদ অনুসরণে বিভিন্ন ঋষিকর্ত্তৃক রচিত, বেদাঙ্গ বা কল্পসূত্রে যাগযজ্ঞাদির, গর্হস্থ্য ধর্মের ও হিন্দুধর্ম ব্যবস্থার নিয়মাবলী বিধিবদ্ধ,- যাহার ভিত্তি অবলম্বনে সপ্তম মনুর অনুশাসন বা 'মনুসংহিতা' এবং চানক্যের 'অর্থশাস্ত্র', বাৎস্যায়নের 'কামসূত্র' প্রভৃতি উদ্ধৃত।

বেদসংহিতায় লিপিবদ্ধ ব্রহ্মবিষয়ক পরমসূক্ষ্ম অনুভূতির সূক্ত বা বেদমন্ত্রের উত্তম উক্তি 'ব্রাহ্মণ' নামীয় টীকা সংগ্রহ,- বিশেষভাবে বৃহদারণ্যক উপনিষদে অন্তর্ভুক্ত। মন্ত্রাত্মক সংক্ষিপ্তাক্ষর দুর্জ্ঞেয় বেদবাক্যে ব্যাখ্যা বিভ্রাট আশঙ্কায়, জ্ঞান ও কর্মমার্গে ভগবদুপাসনা, প্রবর্ত্তিত করিয়া, বৈদিক ভাষা হইতে স্বতন্ত্র 'পুরাণ সংহিতা' সঙ্কলিত,- যাহা ছান্দোগ্যোপনিষদে সপ্তম অধ্যায়ের প্রথম ও দ্বিতীয়খণ্ডের প্রারম্ভে 'পঞ্চমবেদ' আখ্যায়িত। পরবর্ত্তী কালে সুসমৃদ্ধ লৌকিক প্রাঞ্জল সংস্কৃত ভাষায়, পুরাণ সংহিতা বিশদ ও সরল করিয়া, সহজবোধ্য ও সুখপাঠ্যরূপে ক্রমশঃ অষ্টাদশ পুরাণ বিরচিত হয়। অতঃপর প্রত্যাসন্ন ক্ষীয়মান ধর্ম কলিযুগে, বেদবিধিমতে জটিল যজ্ঞ ক্রিয়াদির সুষ্ঠু সম্পাদন বিশেষ কষ্টসাধ্য এবং উপযুক্ত ঋত্বিকের অবিদ্যমানতা ঘটিবে,- এইরূপ সংশয়েই প্রবৃত্তি বহুল ভোগাদির সঙ্কোচ বিধান করিয়া,- ঋষিসঙ্ঘদ্বারা অধিকারী-ভেদে পুরুষার্থলাভের,-অর্থাৎ,ধর্ম,অর্থ,কাম ও মোক্ষপ্রাপ্তির বেদবিহিত সহজ মতবাদ রূপে, পৌরাণিক কীর্ত্তন, বেদোক্ত বিবিধ ভগবৎ নামজপ সাধনা ও শাস্ত্রসম্মত বিগ্রহ উপাসনা, কলিকালে 'সনাতন ধর্ম' নির্দ্ধারিত হয়। পরিশেষে যুগসন্ধিকালে ভগবৎ অনুজ্ঞায় লিখিত,- সর্ব্বাভিষ্টপ্রদ, বেদরূপ কল্পবৃক্ষের অমৃতফল, অষ্টাদশ পুরাণের অন্তর্গত, বিপুল সংস্কৃত সাহিত্যের মধ্যমণি "শ্রীমদ্ভাগবত" গ্রন্থে,- ব্রহ্মতত্ত্ব, পরমাত্ম

তত্ত্ব ও ভগবৎতত্ত্ব পরিব্যক্ত করিয়া, বেদোক্ত, অখণ্ড, অনন্ত, জ্ঞানময় ব্রহ্মকে, লীলাময় রসময়, সর্ব্বগুণাধাররূপে স্থাপনাদ্বারা,- অসীম ঐশ্বর্য্যময়, অনন্ত শক্তিময়, আনন্দ রসময় শ্রীকৃষ্ণস্বরূপকেই, পরাৎপর তত্ত্ব বা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ একমাত্র পরিপূর্ণ তত্ত্বস্তু,- প্রতিপাদিতক্রমে 'ভক্তিযোগ বা ভগবদ্ভক্তি অথবা ভগবানের প্রতি পরম অনুরক্তিকে "পঞ্চম পুরুষার্থ" নির্দ্দিষ্ট হয়। উল্লেখযোগ্য যে, এই তত্ত্বসিদ্ধান্ত, তৈত্তরীয় উপনিষদের দ্বিতীয় বল্লীর সপ্তম অনুবাকে বর্ণিত (জীব হৃদয়ে আনন্দধারা রহিয়াছে বলিয়াই, আনন্দ রসস্বরূপ ব্রহ্মকে লাভের নিরন্তর ব্যাকুলতা, অর্থাৎ জীবের নিত্যোপলব্ধ আনন্দ আছে,- অতএব আনন্দ কারণ আনন্দময় ব্রহ্ম আছেন) মন্ত্রবাণীরই সম্প্রসারণ।

পাঁচশত শতাব্দী পূর্ব্বে প্রকটিত, শ্রীকৃষ্ণমুখনিঃসৃত ভগবদ্গীতার পঞ্চমঅধ্যায়ের, উনত্রিশশ্লোকে ভগবদোক্তি এই,- সর্ব্বপ্রাণী হৃদয়ে, প্রত্যুপকার নিরপেক্ষ উপকারী সুহৃদরূপে তিনি অবস্থিত,-পরমাত্মার প্রতি নিষ্কাম প্রেমরূপ সাধনাদ্বারা এই তত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত থাকাই, পরাশান্তিলাভের পথ,- যেহেতু পরমাত্মারূপে তিনি-ই পুরুষোত্তম (১৫ । ১৭) এবং জাগতিক যাবতীয় বন্ধন হইতে মুক্তিদাতা (১৮ | ৬৬)। কিঞ্চিদধিক পাঁচশত বৎসর পূর্ব্বকালে, জীবের অন্তর্নিহিত রসস্তর প্রতিমাস্বরূপে নবদ্বীপধামে আবির্ভূত,- শ্রীচৈতন্যদেব,- সরসহৃদয় বাঙ্গালীর ভাগবত জীবন, বেদসম্মত পরাভক্তির অমৃত প্রবাহে পরিপুষ্ট করিতে,- মর্যাদা পুরুষ গোলকবিহারী শ্রীকৃষ্ণকে,-প্রভু, সুহৃদ, পিতা বা পতিভাবে অর্থাৎ ঐরূপ প্রীতির ভাবাবিষ্ট অনুভাবনারূপ প্রেমধর্ম্মের অভিনিবেশে, ভজন সাধনই, তাঁহার সহিত সতত যুক্ত থাকিবার সর্ব্বোত্তম উপায়,- বেদসম্মত, অথচ পূর্ব্বে অপ্রকাশিত, এই মহাবাণী উদঘাটন করিয়া,-ঘোষণা করিয়াছিলেন, বিলাস বহুল অনুষ্ঠানের পরিসর মুক্ত, একমাত্র নামজপ এবং অন্ত্যজ অবহেলিত জনগণকে ভ্রাতৃবোধে, একত্রে নামকীর্ত্তনই, মুক্তিপ্রদ প্রকৃত ধর্ম্মাচরণ।

বেদের বিশেষ শব্দাদি, তথা মূলশ্রুতি অনুসরণে পুরাণে নিরূপিত কতিপয় দুর্ব্বোধ্য শব্দের অর্থান্তর ও তৎকালে ব্যবহৃত পরিভাষার ক্রম বিবর্ত্তিত আধুনিক বর্ণনের তাৎপর্য্য প্রসঙ্গে, দৃষ্টান্ত স্বরূপ পুরাবৃত্তান্ত হইতে বহুজন বিদিত, অথচ ভিন্ন অর্থাবোধে প্রচলিত, "সোমরস" সম্পর্কে, স্মৃতিশাস্ত্রের উদ্ধৃতি উল্লেখে বলা যায় যে, চরক সংহিতা মতে, ইহা দীপ্তিশীল শ্রেষ্ঠ মহৌষধি, (সোমনামৌষধিরাজ , এবং ক্রমশ বৃদ্ধি পাইয়া, পুনরায় ক্ষুদ্র হইয়া যাওয়া পনেরটি পত্র যুক্ত 'সোমলত' নামীয় (পঞ্চদশপর্ণঃ স সোম ইব হীয়তে বর্দ্ধতে চ) ওষধির নির্য্যাস। আয়ুর্ব্বেদ রচয়িতা ঋষির সুশ্রুত সংহিতায়, আয়ুবৃদ্ধিকরও জরাবিনাশক সবুজবর্ণ ঐ রসায়ন, দুগ্ধ ও মকরন্দ (মধু) মিশ্রিত করিয়া বৎসরাধিককাল কলস রক্ষার নির্দ্দেশ, হরি নামরূপে নবুঝাতে

সং বৈস্থভিঃ কলশে সোমো অজ্যতে। বেদের নবম মণ্ডলে ইহাকে সূর্য্যের উজ্জলতার সহিত উপমা রহিয়াছে,- সোমো দেবো ন সূর্য্যঃ। বৈদিকযুগে বিশেষ সমাবেশ বা যজ্ঞানুষ্ঠান কালে, অতি পবিত্র জ্ঞানে (গবাশির সোমা শুদ্ধ), পীযুষ সদৃশ দেব ভোগ রাজাধিরাজ (সোমং রাজানং বৃণীমহে) ঐ পানীয়, প্রথমেই বায়ু অভিমানী দেবতাকে উৎসর্গ করিয়া (তুং নো বায়বেষামপূর্ব্ব্যঃ সোমানা প্রথমঃ পীতিমর্হসি),- অর্থাৎ বায়ু সংস্পর্শে,-শীতলতার পর, সূর্য্যাদেবকে প্রদান পূর্ব্বক (ভানুং ত্বামংত্বং ত্বা হবামহে) অর্থাৎ সূর্য্যাগ্নি সংশ্লেষে বিশুদ্ধি সম্পাদনের পর, সমস্ত পুত্র স্থানীয় ববাহুত গণকে নিবেদিত সোম, পান করিতে আহ্বান করা হইত,- সোম আ পীতয়ে সুতঃ সুতবাং। তৎকালীন ব্যবস্থা পদ্ধতি পর্য্যালোচনার ব্যুৎপত্তিগত অর্থে সোমরস কোন অবস্থাতেই মাদক দ্রব্য বিবেচিত হইত না, ইহাই প্রতীয়মান হয়।

প্রাচীন ঐতিহ্যমণ্ডিত ভারতের সাহিত্যকীর্ত্তি বেদে আকাশকে 'পিতা, এবং পৃথিবীকে 'মাতা' (দ্যাবা পৃথিবী, দ্যৌষ্পিতঃ পৃথিবী মাতঃ) বর্ণনা, বৈদিক পূর্ব্ববর্ত্তী. কৃষিবিদ্যা উদ্ভাবক পৃথু রাজের নামানুসারে 'পৃথিবী' নাম প্রদত্ত ভূলোক, জন্মাবসে ধরিত্রীমাতা এবং অবকাশে অবস্থিত অন্তরীক্ষ বা আকাশ, পালকপিতা, কল্পনার প্রতি-ভাস ধারণা করা যায়। অর্থাৎ সেই প্রাক বৈদিক যুগে গিরিকন্দরবাসী আদি মানব-জাতি, পদতলে বিস্তৃতভূমি, যাহাতে তাহাদের মনুষ্য সত্বার উদ্ভব এবং মাথার উপর অনন্ত অম্বর, যাহা সূর্য্য ও মেঘকে ধারণ করিয়া, আলোক ও বৃষ্টি দ্বারা প্রাণীমাত্রকেই পালন এবং খাদ্যশস্যাদি পোষণ করিতেছে, তাহারই অনুভবে আকাশকে 'পালয়িতা' 'পিতা' এবং পৃথিবীকে 'বন্ধু স্বরূপিনী মাতা' কল্পিত হইয়াছিল, তাহাই বেদ সঙ্কলন সময়ে হয়ত গ্রহণ যোগ্য হয়,- দ্যৌর্মে পিতা জনিতা নাভিরত্র বন্ধুর্মে মাতা পৃথিবী মহীয়ম।

পরবর্ত্তী সময়ে ছান্দোগ্যের (বায়ো তৃপ্যত্যাকাশ স্তৃপ্যতি ৫।২৩।২) বায়ু তৃপ্ত হইলে আকাশ তৃপ্ত হইয়া বৃষ্টি ধারাতেই ভোগ্য অন্নাদি পরিপুষ্ট হয়, হয়ত এই মতানুসারে, অথর্ব্বভাষ্যের 'পৃথিবী সূক্তে' জড় আকাশ পিতৃ ভাবের গুরুত্ব হারাইয়া ফেলে এবং বেদোক্ত 'বসু' শব্দার্থ 'রত্ন' নির্ণয়ে, রত্নধারক পৃথিবী 'বসুধা' আখ্যাত হইয়া, পুরাণের আলকারিক ভাষায় ভূমণ্ডল 'বসুন্ধরা' বা 'বসুমতী' নামে কীর্ত্তিত হয়। প্রাসঙ্গিক উল্লেখ করা যায় বিবাহাদিতে অথবা কত্তব্য আভ্যুদয়িক অনুষ্ঠানে, গৃহস্বামী কর্ত্তৃক ঘরের দেওয়ালে পাঁচটি কড়ি স্থাপন করিয়া তদুপরি ঘৃতদ্বারা পাঁচটি দাগ বা 'বসুধারা' প্রদান এবং গৃহদ্বারে পাঁচটি শোলার ফুলস্থাপন, শুভকার্য্যে মঙ্গলচিহ্ন স্বরূপ মাঙ্গলিক পঞ্চরত্ন শোভিত করারই প্রতীক। অতঃপর জীবনধারণে অপরিহার্য্য

খাদ্য জল উৎপত্তি ক্ষেত্র ভূভাগ, মুনিমানসে 'ভূমিমাতৃকা' আরাধনারূপে স্থান লাভ করে, যাহা লোকানুভূতি অনুসারে ক্রমশঃ জমিচাষের প্রাককালে 'হালপূজা' বা হলকর্ষণ,- উৎসব, নূতন ধানে প্রস্তুত নবান্ন উৎসর্গ দ্বারা 'ভূমিলক্ষী' উপাসনা,- ভূমি ক্রয় করিয়া তথায় "বাস্তুদেবতা অর্চ্চনা" নবগৃহ নির্মাণে ভিত্তি খনন সময়ে প্রথমেই 'ভিতপূজা' ইত্যাদি মাধ্যমে মাতৃস্থানীয়া ভূমি দেবতার শুভেচ্ছা প্রার্থনারই আনুষ্ঠানিক অভিব্যক্তি,- প্রজাঃ অমৃতং ববীমহে ।

সংস্কৃতে 'মিত্র' অর্থে বন্ধু, বা সুহৃদ, কিন্তু বেদে 'সূর্য্য অর্থবোধক (অহরভিমানী দেবঃ মিত্র অদিতিং দিতিংচ) যেন যুগপৎ অসীম ও সীমাবদ্ধ জগৎ মিত্ররূপে আলোকন কারী । তাই ঋগে্দে বলা হইয়াছে,- এই মিত্র তীক্ষদৃষ্টিতে পৃথিবী এবং দ্যুলোক ধারণ করিয়া অমৃতময় করিয়া রাখিয়াছেন,- মিত্রো দাধার পৃথিবীমুত দ্যাম । উল্লেখযোগ্য যে, ইরাণীয় পার্শিদের ধর্মগ্রন্থ 'জেন্দাবেস্তা' অনুশাসন মতে, সর্ব্ব প্রকাশক, নিয়ম শৃঙ্খলা রক্ষক ও সত্যবাদীর মিত্র ভাবনায়, সূর্য্যদেব তৎকালে 'মিথ্র' নামে প্রত্যহ উপাসিত হইত,- যাহা ইদানীং কালে 'মিত্রগণ' নামীয় পাঁচদিন ব্যাপী বাৎসরিক উৎসব অনুষ্ঠান । জনশ্রুতি এইরূপ যে,- প্রাচীনকালে পারস্যের মধ্যদিয়া প্রসারিত হইয়া এই সামাজিক রীতি 'মিত্রপূজা' নামে ভারতে প্রবর্ত্তিত হয়,- যাহা ক্রম অনুবর্ত্তনে প্রাদেশিক উপভাষার অপভ্রংশে 'ইতুপূজা' কথিত হইয়া, সুজলা সুফলা ভাবপ্রবণ গ্রাম বাংলার নারীসমাজে হেমন্তকালে, বিশেষভাবে শস্যসংগ্রহ সময় অগ্রহায়ণ মাসের কোন রবিবার দিবসে,- মালসায় বিবিধ বীজাঙ্কুর বা সদ্য উন্মেষিত শস্যচারা বপন করিয়া, ফুল ফল সহযোগে গোময় লিপ্ত গৃহ প্রাঙ্গণে সূর্য্যের উদ্দেশ্যে অর্ঘ্য নিবেদন রূপ ধর্মানুযায়ী পারিবারিক ক্রিয়া পদ্ধতিতে পর্যবসিত ।

বেদে প্রযুক্ত অপর একটি শব্দ 'গো' পৃথিবী এবং, সূর্য্যরশ্মি নির্দ্দেশক,- যেমন পৌরাণিক উৎপ্রেক্ষায়, পবনদেব কর্ত্তৃক গাভীর বন্ধনদশা মোচন করায় পৃথিবীতে সূর্য্যের প্রকাশ। ভাবার্থ এই, বায়ু বেগে মেঘ অপসারিত হওয়ায় সূর্য্যকিরণের অভিব্যক্তি বা সূর্য্যরশ্মির আবরণ উন্মোচন। বেদে বায়ুকে 'পূর্ব্বপা' শব্দে, অর্থাৎ সততই জলস্পর্শিত পানকারী (ত্বম্ভ্যংহি পূর্ব্ব পীতয়ে) রূপে বিশেষিত । পরন্তু, যাহা ব্যতীত কেহই জীবিত (তত নো দেহী জীবসে) থাকিতে পারে না,- সেই অদৃশ্য অথচ দেহস্পর্শে অনুভূত, ঔষধের মত হিতকারী (বাত আ বাতু ভেষজং) বায়ু কিভাবে সর্ব্বত্র বিরাজিত ঋগে্দ দশম মণ্ডলের 'অনিল' ঋষি এই ভাবনায়, ইহা অপ বা ব্যাপনশীল (ব্যাপ্ত্যর্থক আপধাতু) জলের বন্ধু (অপাং সখা প্রথমজা) অর্থাৎ সূর্য্য তাপে উত্থিত জলীয় বাষ্পবেগেই, ইহার গতিশীল অবাধ বিচরণ এবং বায়ুস্থিত অন্নজান ও জলযান

বিক্রিয়া ফলেই, বৃষ্টিরূপে জলের উৎপত্তি ও বৃদ্ধি, এইরূপ নির্ণয়ে, বেদে তাঁহার নামানুসারে বায়ুর প্রতিশব্দ 'অনিল' সংযোজিত। কিন্তু দিবোদাস ঋষিপুত্র, পুরুচ্ছেদের ইহার উৎপত্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসার আগ্রহ কুত আ বভুব) নিরসনে, তাঁহার মানসীনেত্রে, ইহা মরীচিমালি ব্রহ্ম হইতে জাত 'মরুৎদেবতা' উদ্ভাসিত হইয়া, পৌরানিক উপাখ্যানে স্তুতিযোগ্য নির্দ্ধারিত হয়।

ঋগ্‌বেদে 'বিশ্বকর্মা শব্দ সৃষ্টি শক্তির রূপক,- যাহা পরবর্ত্তী সময়ে কারুজীবি গণের আরাধ্যদেবতারূপ রূপান্তরিত। যজ্ঞস্থলে দুইটি কাষ্ঠের বা বংশদণ্ডের ঘর্ষণে উৎপন্ন হইত বলিয়া, বেদে অগ্নির নাম 'প্রমন্থ' এবং ইহার প্রবর্ত্তক স্বর্গভূমি নিবাসী মাতরিশ্বা ঋষির নামানুসারে 'মাতরিশ্বা' নামে দেবতাজ্ঞানে অগ্নিহোত্রী সম্প্রদায় কর্ত্তৃক হোমাগ্নিতে ঘৃতাহুতি দ্বারা পূজিত ঋগবেদ দশম মণ্ডলের পঞ্চ বিংশতি শততম সূক্তে, দেবি সরস্বতী বাক্যের অধিপতি বা বাগ্দেবীরূপে 'পরমাত্মা' জ্ঞাপক। বেদে 'অয়ন'অর্থ আশ্রয় এবং সমগ্র জীবের আশ্রয়স্থল বলিয়া ব্রহ্মণ্য দেবই 'নারায়ণ'। শতপথ ব্রাহ্মণ মতানুসারে, প্রতিভা দ্বারা দীপ্তি প্রাপ্ত ব্যক্তিই দেবতা পদবাচ্য,- বিদ্বাংসা বৈদেবাঃ, দিব্যতে প্রতিভয়া দোতন্তে ইতি দেবো দেবতা বা। বিশল্যকরণী, অর্থাৎ বি-গত শল্যকারী অথর্ব্ববেদে এইরূপ শব্দার্থ বোধে দেখা যায়, ইহা কোন এক প্রকার ওষধিলতা বা বৃক্ষ নয়,- বরং বনজাত বিবিধ গুল্‌মের মিশ্রণে প্রস্তুত আয়ুর্ব্বেদীয় অবলেপন,- যাহা দেহে প্রবিষ্ট শল্য বহিস্কার করিয়া, রক্ত রোধ ও সত্বর ক্ষত নিরাময়ে অব্যর্থ। মহাদেবের বাহন 'বৃষ' অর্থে তিনি চতুস্পাদ ধর্ম্ম ধারক। বেদে ব্রহ্মবিদ্যার নাম 'মধুবিদ্যা' অর্থাৎ যে বিদ্যায় আনন্দ চিন্ময় রসের আস্বাদন হয়।

মূল রামায়ণে হয়ত আকৃতির সহিত সঙ্গতি রাখিয়া নাম উল্লেখে গুরুত্ব আরোপ হইয়াছিল,- যেমন উন্নত হনু বা চোয়াল ছিল বলিয়া 'হনুমান' কিংবা উত্তম গ্রীবা থাকায় 'সুগ্রীব' যাহা বহু পরবর্ত্তী কালের বর্ণনায় বানরজাতি কল্পিত। উল্লেখযোগ্য যে, আদিকবি বাল্‌মিকীকৃত রামায়ণ মূলগ্রন্থে, হনুমানের দেহ যেন স্বর্ণশৈল সদৃশ এবং মুখমণ্ডল তরুণ সূর্য্যের আভার ন্যায় দীপ্তিশালী উপমা রহিয়াছে,- ততঃ কাঞ্চন শৈলাভ স্তরুণার্ক নিভানন। কিষ্কিন্ধাকাণ্ডের তৃতীয়সর্গে, লক্ষণের প্রতি শ্রীরামের মুখোক্তিতে প্রকাশ,- বাক্‌পটু, মধুর ভাষী, সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ,- সুগ্রীব সচিব হনুমানের সহিত আলাপে, তিনি সন্তুষ্ট, (তমভ্যভাষ সৌমিত্রে সুগ্রীবং সচিবং কপিম্‌,- বাক্যজ্ঞং মধুরৈ বাক্যৈ : স্নেহযুক্ত মরিন্দমম্) যেহেতু অপশব্দ প্রয়োগ হীন দীর্ঘ জ্ঞানগর্ভ বাক্যালাপে, তাঁহাকে ত্রিবিদ্যায় পারদর্শী ও সমগ্র ব্যাকরণ শাস্ত্রাভিজ্ঞ, মহা পণ্ডিতব্যক্তি বোধ হইয়াছে,-

নানৃগ্‌বেদ বিনীতশ্য না যজুর্বেদ ধারিণঃ,- না সামবেদ বিদুষঃ শক্যমেবং প্রভাষিতুম্‌। নূনং ব্যাকরণং কৃৎস্নমনেন বহুধা শ্রুতম্‌,- বহুব্যাহতানেন ন কিঞ্চিদপ শব্দিতম্‌ ।

শ্রেষ্ঠ কপি হনুমান কর্তৃক সাগর উল্লঙ্ঘন সম্পর্কে, বাল্মিকীমুনি বিবরণে ইহাই প্রতীতি হয়,- ঐক্ষেত্রে অতি বেগশালী কোন প্রকার আকাশভেলা ব্যবহার করা হইয়াছিল, বায়ুবেগে যাহার পক্ষ ও ও পুচ্ছদেশ হইতে মেঘ গর্জ্জন ন্যায় বিচিত্র শব্দ হইতেছিল (উৎপপাতাথ বেগেন বেগবান বিচারয়ন্‌,- সুপর্ণমিব চাত্মানং মেনে স কপিকুঞ্জর,- তস্য হনুমান সিংহস্য প্লবমানস্য সাগরম,- পক্ষান্তর গতো বায়ু জীমূত ইব গর্জ্জতি) । শ্রীমদ্ভাগবত দশমস্কন্দ ছেয়াত্তর অধ্যায়ের তথ্য সূত্রে, উমাপতি আশুতোষ অনুচর পুরঞ্জয় দানব লৌহময় নভচারী বিমান নির্ম্মাণ কৌশল জ্ঞাত ছিল,- যাহা অলাতচক্রের ন্যায়, ভূমিতলে, আকাশে, পর্ব্বতের উপবিভাগে, জলে পরিচালিত হইত এবং এই তত্ত্ব উপরোক্ত সিদ্ধান্তের প্রতিপোষক । রামায়ণে সুগ্রীবের সভাগৃহ বর্ণনায় রাজপ্রাসাদতুল্য রাজসিক আড়ম্বরের আভাস রহিয়াছে (বানরেন্দ্র গৃহং রম্যং মহেন্দ্র সদনোপমম্‌,- স সপ্তকক্ষা ধর্মাত্মা যানাসম সমাবৃতাঃ। দদর্শ সুমহৎ গুপ্তং দদর্শান্তঃ পুরমহৎ,- তন্ত্রীগীত সমাকীর্ণং সমতাল পদাক্ষরম্‌ । ততঃ সুগ্রীব মাসিনং কক্ষে পরমাসনে,- মহার্হাস্তারনোপেতে দদর্শাদিত্য সন্নিভম্‌),- যাহা সমৃদ্ধ কলানৈপুণ্যের পরিচায়ক । সুতরাং রামায়ণের ভাষাগত মর্মার্থ যথাবিধি বিচারে, ইহাই অনুমিত হয়, শ্রীরামের সেনাবাহিনীর কেহই প্রাকৃত বানর ছিল না,-হয়ত 'কপি' নামীয় সম্প্রদায়ভুক্ত, যুদ্ধক্ষেত্রে লাঙ্গুল সমেত পশুচর্মে নির্মিত, বর্মজাতীয় অঙ্গাবরণ পরিহিত, বস্তুতত্ত্ব অভিজ্ঞ, বনচারী আদিবাসী বিশেষ। উল্লেখযোগ্য যে, ত্রিপুরা রাজ্যের সম্প্রতি অতি সংখ্যালঘু দুর্মদ যোদ্ধা, প্রাচীনকালে দিগম্বর 'কুকি' সমাজ, মন্ত্রপূত তীর প্রয়োগে ও মন্ত্রশক্তিবলে আশ্চর্য্যজনক কলা কৌশল প্রদর্শনে নিপুণ,- যাহা অধুনা চক্ষুস প্রত্যক্ষ ।

কঠোপনিষদের প্রথম অধ্যায়, তৃতীয় বল্লীর তৃতীয় শ্লোকে, জীবাত্মাকে 'রথী' ,- দেহ যেন 'রথ' ,- বুদ্ধি 'সারথি' ,- মনকে 'লাগাম' এবং ইন্দ্রিয়াদি 'অশ্বসমূহ' এইরূপ রূপক লক্ষণায় আত্মতত্ত্ব উপদিষ্ট । বেদে প্রতিপাদ্য নিরাকার ব্রহ্ম অর্থে, স্তুতি বা প্রার্থনাও নির্দেশ করে,- যাহা উপনিষদে 'ব্রহ্মবিদ্যা' বা সকল প্রাণীহৃদয়ে সদা সন্নিবিষ্ট 'পরমাত্মা' সংজ্ঞিত এবং বেদভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবত মতে, এই শব্দ 'পরমপুরুষ' বাচক,- যাঁহাকে নিদিধ্যাসন, অর্থাৎ একান্তচিত্তে ধ্যানদ্বারা অনুধাবনীয় । পক্ষান্তরে প্রথমস্কন্দ দ্বিতীয় অধ্যায়ের একাদশ শ্লোকে বিশেষ উল্লেখ রহিয়াছে, অদ্বৈততত্ত্বই ব্রহ্ম, পরমাত্মা বা ভগবান নামে অভিহিত । শ্রীগীতার পঞ্চদশ অধ্যায়ের একাদশ শ্লোকে এই তত্ত্ব 'পুরুষোত্তম' নামে প্রখ্যাত । রসশাস্ত্রে শ্রীহরিকে অদ্বিতীয় পুরুষোত্তমরূপে (হরির্যথৈকঃ

পুরুষোত্তম স্মৃতঃ) উল্লিখিত। ভক্তিশাস্ত্রমতে, করুণাবশতঃ অর্জ্জুনকে স্বীয় ভগবদৈশ্বর্য্য প্রদর্শনকারী, তথা পারমার্থিক অনাসক্তি যোগের মহিমা প্রবক্তা নররূপী নারায়ণ (শ্রীকৃষ্ণ) সচ্চিদানন্দ স্বরূপ পুরুষোত্তম,- কারুণ্যাতো নরবদাচরতঃ পরার্থান্ পার্থায় বোধিত তো নিজমীশ্বরত্বম্। সচ্চিৎসুখৈকবপুষঃ পুরুষোত্তমস্য নারায়ণস্য মহিমা ন হি মানমেতি। বৃহদারণ্যকোপনিষদে চতুর্থ অধ্যায়, চতুর্থ ব্রাহ্মণের সপ্তম মন্ত্রে,- মানব বুদ্ধিতে আশ্রিত যাবতীয় কামনারূপ তৃষ্ণা, সমূলে বিনষ্ট হইলে ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত সেই ব্যক্তি 'পুরুষোত্তম' গণ্য হয়। পরন্তু ছান্দোগ্যের অষ্টম অধ্যায় দ্বাদশখণ্ডের তৃতীয় কারিকা কথা প্রমাণে,- সাধনাদ্বারা অন্তরে বাহিরে ভগবৎ উপস্থিতি অনুভব প্রবোধিত ব্রহ্মজ্যোতি সম্পন্ন জীব,- আত্মাভিমান ত্যাগপূর্ব্বক, অর্থাৎ 'আমি' নশ্বর দেহাতিরিক্ত অবিনশ্বর সত্ত্বা,- এই তত্ত্বজ্ঞানে অবস্থিতি লাভ করিয়া, আপন জ্যোতির্ময় স্বরূপে 'পুরুষোত্তম' পদবাচ্য হয়। এইক্ষেত্রে বৈদিক শব্দের মর্ম্মার্থ জীবের 'আমিত্ব' প্রাধান্যসূচক।

বিস্মৃত প্রাগৈতিহাসিক যুগ,- উদিত ও অস্তগত সূর্য্য, দিনরাত্রি, পর্য্যায়ানুক্রমে ষড়ঋতু আবর্ত্তন, অনুধাবন করিয়া,- সমস্তের মধ্যে ব্যপ্ত থাকিয়াও নামচিহ্নের অতীত, সৃষ্টিস্থিতি ও জগৎ রক্ষা কর্ত্তার প্রসন্নতা লাভের প্রয়াস, তৎকালে তত্ত্বসন্ধানে তৎপর চিন্তাশীল ব্যক্তিবর্গের চিত্তকে আলোড়িত করিতে লাগিল। যেহেতু বেদে 'অজ' শব্দ বীজাঙ্কুর অর্থে প্রযুক্ত,- তাই বৈদিক ঋষিগণ অঙ্কুরিত যব, মুদগ প্রভৃতি পঞ্চশস্য, ইহা ইষ্টপোষণকারী বস্তুর উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করিবার প্রথা প্রবর্ত্তন করেন। ইহার বহু পরবর্ত্তীকালে সংস্কৃত ভাষায়, ইহা 'ছাগ' অর্থবোধক গণ্য হওয়ায়, মাংসাশী অনুন্নত মানবগোষ্ঠী, পশুবলি দ্বারা সাগর পর্ব্বত, অতি উন্নত বৃক্ষাদিকে, বিশ্বশক্তির মূর্ত্ত প্রকাশরূপ ভয় ভক্তিতে শ্রদ্ধায় পূজা করিতে প্রবৃত্ত হইল। অবশেষে পৌরাণিক যুগে এই রীতি স্ত্রী-দেবতা পূজনে বিশেষ প্রাধান্য লাভ করে,- দ্বিতীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে রচিত কুলার্ণব তন্ত্র রক্তপাতদ্বারা শক্তি আরাধনা অভিহিত বলা হইয়াছে এবং তৎপূর্ব্ববর্ত্তী পদ্মপুরাণে শিবের প্রতি পার্ব্বতীর উক্তি উল্লেখ রহিয়াছে যে, ভগবতীর প্রত্যর্থে তামসিক ব্যক্তিগণ জীবহত্যা, অর্থাৎ বলিদান পূর্ব্বক পূজা নিরয়গামী হয়, (মদর্থে শিব কুর্ব্বন্তি তামসা জীবঘাতনম্,- আকল্প কোটি নিরয়ে তেষং বাসো ন সংশয়) ইহাতে সংশয় নাই।

উল্লেখযোগ্য যে, উপনিষদের ঋষিগণ, আনন্দঘন এবং প্রকাশ স্বরূপ পরমেশ্বরের উদ্দেশ্যে চরু বা পায়স উৎসর্গদ্বারা পরিচর্য্যা পদ্ধতি বেদসম্মত গণ্য করিয়াছেন,- কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম (শ্বেতাশ্বতর ৪ | ১৩) এবং এই সময়ে এ উপনিষদের ঋষি বিভিন্ন

বেদে বর্ণিত পূর্ব্বাহ্ন সর্ব্ব প্রাণীতে প্রাচ্ছন্নভাবে অবস্থিত (সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভুতান্তরাত্মা) ও সংসার গহন মধ্যে সাক্ষী স্বরূপ অবস্থান করিয়া, সমুদয় বস্তু মধ্যেই প্রাণ রূপে বিরাজমান (সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট) 'পরম-ব্রহ্মতত্ত্ব' উদ্ভাসিত হইল,- যাঁহাকে বহু বেদাভ্যাস বা মেধারদ্বারা জানা যায় না বলিয়া (নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো, ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন) মুমুক্ষু তাঁহাকে অন্তরে বরণ (মুণ্ডক ৩ । ২ | ৩) করিয়া উপলব্ধি করে (কঠ ১ | ২ | ২৩) । অধিকন্তু একমাত্র নিয়ন্ত্রণকারী না থাকিলে, সূর্য্যচন্দ্রাদির সুশৃঙ্খল ও নিয়মিত গতি, তথা জীবের যথানুরূপ কর্মফল ভোগ সম্ভব নয় (কঠ ২ । ৩ | ২) এবং সেই 'মহাপ্রাণ' হইতে নিঃসৃত 'মহাশক্তি' বশেই, জাগতিক যাবতীয় বস্তু প্রাণবান,- সূত্রাত্মা, অর্থাৎ বায়ু ক্রিয়াশীল,- (ঈশ চতুর্থ শ্লোক),- এই অনুমান যুক্তি নির্ভরে ও ঋগ্‌বেদের মর্মার্থ অনুসরণে, বিশ্বপুরুষ ও তাঁহার শক্তিস্বরূপা প্রকৃতি, যুগ্মদেবতারূপে,- জীবের অন্তরে বাহিরে সতত ভগবৎ উপস্থিতি অনুভবের উদ্বোধক,- উপাসনা গৃহীত হইল ।

অপরন্তু বেদমতে বিশ্বনিয়ন্তার অভিপ্রায় ব্যতীত, কেহই তাঁহাকে জানিতে পারেনা এবং সেই রসস্বরূপকে না জানিলে জীব আনন্দ লাভ করিতে পারেনা (তৈত্তিরীয় ২ | ৭),- এই বিধিমতে বৃহদারণ্যক প্রবক্তা ঋত্বিক কণ্ঠে ধ্বনিত হইল, নিত্যকালের উপাসনারূপ অতি উন্নত মহিমার প্রার্থনা,- অজ্ঞান ও অবিদ্যার অন্ধকার হইতে, পরমব্রহ্মজ্ঞান প্রাপ্তির আলোকে আমাকে উপনীত কর (১ম অধ্যায়, তৃয় ব্রাহ্মণ, অষ্টাবিংশতি মন্ত্র) এবং এইরূপ উপাসনা পদ্ধতি, ছান্দোগ্যপনিষদের তৃতীয়অধ্যায় চতুর্থখণ্ডে বর্ণিত শাণ্ডিল্যবিদ্যা প্রসঙ্গের প্রথমেই, ইহা মানসিকভাবে ব্রহ্মসান্নিধ্যে তদ্ভাবভাবিত হইয়া আসীন থাকা নির্দ্দেশক। তদনন্তর ঐ তৈত্তিরেয়োপনিষদ ঋষিচিত্তে, ইন্দ্রিয়াতীত অথচ পরমানন্দধামে স্বমহিমায় অবস্থিত ব্রহ্মোপাসনা (আবিরাবর্ম্মি এধি) সংযোজিত হইল,- স্বপ্রকাশ ব্রহ্ম স্ব-স্বরূপে আমার অন্তরে প্রকটিত হউন। পরন্তু উপাসনা অনুশীলন, ব্যক্তি বিশেষের, অর্থাৎ 'আমি'র ইচ্ছা বা প্রচেষ্টা সাপেক্ষ । ছান্দোগ্যপনিষদ মতে (৩।১৪।১) উপাসনা বলিতে সগুণ-ব্রহ্ম বিষয়ক মানস ক্রিয়া বুঝায়। বৃহদারণ্যক (১।৩।৯) বলেন,- বেদের উপাস্য বিষয়ক দেবতার জ্ঞাপিত স্বরূপ, মনের দ্বারা চিন্তা করাই উপাসনা । শতপথ ব্রাহ্মণে (১০।৫।২।২০) রহিয়াছে,- উপাস্যকে যেমন ভাবে উপাসনা করা হয়, উপাসক তাহাই হইয়া থাকেন। অপিচ, শ্রীগীতায় (৫।৬) ফলাকাঙ্খাবর্জ্জিত, ঈশ্বরে সমর্পিত চিত্তে বেদবিহিত কর্মের (১৮।৪৬) অনুষ্ঠান, সকল মতাবলম্বীগণের পক্ষেই সার্থক উপাসনা বলা আছে।

প্রণিধান যোগ্য যে, সর্ব্বক্ষেত্রেই উপাসনা করা বা না করা পুরুষ বা কর্ত্তা, অর্থাৎ আমি'র ইচ্ছাধীন। চিত্তের একাগ্রতা উৎপাদক ও চিত্তশুদ্ধি সম্পাদক উপাসনা পদ্ধতি, সংস্কার মূলক বা গুরুআজ্ঞা ও শাস্ত্রবাক্য নির্ভর। পক্ষান্তরে ধ্যান বা নিদিধ্যাসন মানসসাধিত হইলেও, তাহা জ্ঞাননির্ভর প্রমাণমূলক বলিয়া 'আমি'র ইচ্ছা সাপেক্ষ নহে,- বরং স্বতঃ উৎসারিত প্রজ্ঞায় 'আমি'কে তদনুযায়ী ক্রিয়ায় প্রবৃত্ত করা। সুতরাং জ্ঞাননিষ্ঠ অথচ স্বকপোলকল্পিত নয় এরূপ উপাসনাই উত্তম,- যাহাতে উপাসক বা 'আমি'র উপাস্য প্রতি তীব্রভক্তি (ভাগবত ৩।২৫।৫৪) সঞ্চালিত হয়। শ্রীগীতায় (৬।৪০) শ্রীকৃষ্ণের উক্তিতে রহিয়াছে, এরূপ শুভকর্মকারীর কখনও অধোগতি হয় না। এবং ইহার অল্পমাত্র অনুষ্ঠানও (৩।৪০) জন্মমরণরূপ সংসারের মহাভয় হইতে পরিত্রাণ করে। অপিচ উপাস্য ও উপাসক মধ্যে ভেদ বোধ না থাকিলে উপাসনা ও ধ্যানে আত্মাভিমান আসিয়া পড়ে এবং চঞ্চল মন অন্তরের নির্জ্জনতায় একান্ত মনে নিরাকার ব্রহ্ম ভাবনায় সুস্থির থাকিতে পারে না বলিয়া,- অনন্তসত্ত্ব অনন্তশক্তি, অনন্তগুণ, অনন্তরূপ, অনন্তমহিমা,- বিশ্বপ্রপঞ্চের মহাধ্যক্ষ, পরমাকাশের পরমধামে নিত্যলীলারত, সকল সুন্দর সন্নিবেশ, ভক্তের ভগবানকে পরমপ্রেমরূপ ভক্তিতে অন্তরে অনুক্ষণ উদ্দীপিত রাখিবার প্রয়াসে কল্যাণ করুণাময় মূর্ত্তি নির্দ্দেশ করিয়া নিত্য পূজার ব্যবস্থা,- সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মাণাং রূপকল্পনা।

উল্লেখযোগ্য যে, ঋগ্‌বেদ পঞ্চম মণ্ডলের তৃতীয় অধ্যায় চৈয়াল্লিশ সূক্ত ও অষ্টম মণ্ডল সপ্তম অপ্তম অধ্যায় অষ্টাদশ সূক্তে, প্রতিমাপূজার বিশেষ উল্লেখ পাওয়া যায়। অথর্ব্ববেদ দ্বিতীয় কাণ্ড, তৃতীয় অনুবাকের চতুর্থমন্ত্রে, মৃত্তিকা নির্ম্মিত ও প্রস্তর দ্বারা প্রস্তুত মৃন্ময় প্রতিমায় চিন্ময় ভগবৎ শক্তিকে অবস্থানের আহ্বান (এহ্যশ্মানমাতিষ্ঠাশ্মা ভবতু : তে তনু : রহিয়াছে। যজুর্ব্বেদের এয়োদশ অধ্যায়, একচল্লিশ মন্ত্রে পরমেশ্বরের বহুবিধ প্রতিমার (সহস্রস্য প্রতিমাং বিশ্বরূপম্) উল্লেখ বিদ্যমান। ঋগ্‌বেদ ষষ্ঠমণ্ডল চতুর্থ সূক্তের অষ্টাদশ মন্ত্রে, রূপে রূপে তাঁহারই রূপ (রূপং রূপং প্রতিরূপং বভুব) স্বীকৃত। শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্দ, সপ্তবিংশতি অধ্যায়, দ্বাদশ শ্লোকে বর্ণিত আট প্রকার প্রতিমা (স্বর্ণ রৌপ্য লৌহাদি ধাতু, মণি প্রভৃতি রত্ন, প্রস্তর, মৃত্তিকা কাষ্ঠ, চন্দন ও বালুকাদি নির্ম্মিত এবং অঙ্কিত চিত্রপট) প্রসিদ্ধ। পরবর্ত্তী বাহান্ন শ্লোকে প্রতিমা প্রতিষ্ঠার প্রশংসা এবং প্রতিমা পূজায় সত্বর ভক্তিলাভের উল্লেখ। প্রাসঙ্গিক মন্তব্য করা যায়,- সাধকের সহজে মনঃসংযোগ ও উপাস্যের প্রতি ধ্যানাবস্থিত চিত্ততা প্রাপ্তির সহায়তা জন্য বিবিধ মূর্ত্তিপূজা বেদসম্মত হইলেও অন্তরের সঙ্কীর্ণতাবশতঃ মন যদি মূর্ত্তিতেই সীমাবদ্ধ হইয়া থাকে,- পূজন প্রকরণই প্রাধান্য লাভ করিতে থাকে।

আমি—কে

ফলতঃ হৃদয়বৃত্তি পরমার্থের প্রতি উন্মুখ হইয়া, মনোরাজ্যে 'আমি' জাগ্রত চৈতন্য প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না ।

উল্লেখযোগ্য যে, সত্য দুই প্রকার। প্রথমত: যাহা পঞ্চেন্দ্রিয় গ্রাহ্য ও অনুমান নির্ভর এবং এই প্রণালীতে 'সত্য' উদ্ভাবন, বি-জ্ঞান বা বিশেষ জ্ঞান,- যাহা পরিবর্ত্তনশীল। দ্বিতীয়তঃ যাহা অতীন্দ্রিয় যোগশক্তি গ্রাহ্য এবং ঋষিমানসে আবির্ভূত অলৌকিক জ্ঞান, তাহা 'বেদ'। বিজ্ঞানের বিচিত্র আলোকে যেমন জড়জীবন আলোকিত,- অপৌরুষেয় বেদমন্ত্র উচ্চারণে তেমনি অন্তর হয় উদ্ভাসিত। রুচি অনুযায়ী বেদার্থের ভাষ্য অনুভাষ্য অবলম্বনে, বিভিন্ন উপাসক সম্প্রদায় উদ্ভব হইলেও, ভগবৎ নাম জপই শ্রেষ্ঠ উপাসনা বিবেচিত। মুণ্ডক উপনিষদে ১ম মুণ্ডক ১ম খণ্ড ৯ম মন্ত্রে হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্ম হইতে ভগবৎ নাম আবির্ভূত বলা হইয়াছে। ভক্তি রসামৃতসিন্ধু গ্রন্থে, ইষ্টমন্ত্রের মৃদু অথচ স্বচ্ছন্দ উচ্চারণই 'জপ' (মন্ত্রস্য সুলঘুঃ উচ্চারো জপ:) উল্লেখ আছে। শ্রীগীতার দশম অধ্যায় পঞ্চবিংশতি শ্লোক অনুযায়ী যজ্ঞাদি মধ্যে জপরূপ নামযজ্ঞই শ্রেষ্ঠ। অধিকন্তু নবম অধ্যায়ের ছাব্বিশ শ্লোকে ভগবদোক্তি এইরূপ যে,- ভক্তিপূত পত্র, পুষ্প,ফল, জল শ্রীভগবান প্রীতির সহিত গ্রহণ করেন,- যদিও পরবর্ত্তী চৌত্রিশ শ্লোকে ভগবৎ পরায়ণ হইয়া, তাঁহাকে প্রতিনিয়ত নমস্কার, অর্থাৎ তাঁহার নামজপেই গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে। অপরন্তু অষ্টাদশ অধ্যায়ে পঁয়ষট্টি শ্লোকে পুনরায় ভগবৎ প্রতিজ্ঞা অনুসারে ভগবানে দৃঢ়মতি ভজনশীল, কেবলমাত্র নমস্কাররূপ জপসাধনদ্বারা তাঁহাকে প্রাপ্ত হইতে পারে। নারদপুরাণে উল্লেখ রহিয়াছে,- কৃষ্ণ প্রণামীর পুনর্জন্ম হয় না (কৃষ্ণ প্রণামী ন পুনর্ভবায়)- ইহার ভাবার্থ এই, সগৃহীতনামা শ্রীকৃষ্ণনাম জপকারী অভীষ্ট ধাম প্রাপ্ত হয় বলিয়া, মর্ত্তালোকে তাহার আর পুনরাবর্ত্তন ঘটে না। এই সম্পর্কে শ্রীগীতার চতুর্থ অধ্যায়ের চল্লিশ শ্লোকের ভগবৎ বাক্য অনুধাবনীয় যে, পারমার্থিক বিষয়ে ও শাস্ত্রে শ্রদ্ধাহীন বা সন্দিগ্ধচিত্ত ব্যক্তি পুরুষার্থ লাভে অযোগ্য হইয়া বিনাশ প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ বার বার দুঃখময় সংসারগতি প্রাপ্ত হয়। অপিচ, মহাভারতের অশ্বমেধ পর্ব্ব উনিশ অধ্যায় সপ্তম শ্লোকে, বলা হইয়াছে, ধর্মাধর্ম সম্পর্কে জ্ঞানহীন ব্যক্তির আত্মজ্ঞান লাভ হয় না। অর্থাৎ 'আমি' অবশ্যই শাস্ত্রযুক্তি নির্ভর হইবে।

বেদমতে ভগবান বাক্যে ও মনের অগোচর,- অবাঙমনসো গোচরম্। তাই আমাদের জপ, তপ, আরাধনা তাঁহার নিকট পৌঁছাতে পারে না। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভু স্বরচিত শিক্ষাষ্টকের প্রথমেই বলিয়াছেন,- নিরবচ্ছিন্ন ভগবৎ নামজপে চিত্ত দর্পণ মার্জ্জিত (চেতোদর্পণ মার্জ্জনম্) হয় এবং বিশ্বপতি সেই বিশুদ্ধ অন্তরে স্বয়ং স্ফুরিত হইয়া, এমন শুভবুদ্ধির প্রেরণা প্রদান করেন (গীতা ১০।১১) যাহাতে

তাঁহার জাতি ও বুদ্ধিতে ও ইহার সংগতিতে যুক্ত থাকিতে পারে। বৃহদারণ্যক দ্বিতীয় অধ্যায় চতুর্থ ব্রাহ্মণের পঞ্চম কারিকা মতে, শাস্ত্র বাক্যাদির শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনের দ্বারা জীবাত্মায় অধ্যস্ত অবিদ্যার বিনাশ হয়,- অর্থাৎ 'আমি' নিজ মহিমায় প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্ত্তী উনিশ কারিকায় বলা হইয়াছে, সংস্কৃত মনদ্বারাই ব্রহ্ম অনুদ্রষ্টব্য,- অর্থাৎ শুদ্ধমনে ব্রহ্ম 'বৃত্তিব্যাপ্য' বা মনের তদাকারাকারিত,- কিন্তু 'ফলব্যাপ্য' বা মনের প্রাপ্তবস্তু নহেন, পরবর্ত্তী বাইশ কারিকা, সকলের নিয়ামক, সকলের ঈশ্বর ও সকলের অধিপতিকে জানিবার ইচ্ছা জাগরিত করিবার জন্য, স্বাধ্যায়, দেহরক্ষার্থে যথালব্ধ বস্তুতে সন্তুষ্ট থাকিয়া 'আমি' অভিমানী জীবাত্মা আশ্রিত 'মন' শুদ্ধ করিবার নির্দ্দেশ। শ্বেতাশ্বতর দ্বিতীয় অধ্যায়ের অষ্টম মন্ত্রে, 'প্রণব' রূপরূপ ভেলার সাহায্যে 'মন' নিয়মিত করিয়া ভয়াবহ সংসার স্রোত অতিক্রম করিবার উপদেশ রহিয়াছে।

বৈদিক শব্দ বা বেদবাক্যের বিশেষ বিবর্ত্ত কিংবা প্রচলিত অর্থবিন্যাস অথবা মন্ত্রার্থের মূল্যায়ন, এই ক্ষেত্রে আলোচ্য বিষয় না হইলেও, পুস্তকে ব্যবহৃত কতিপয় শব্দের অর্থবাদ প্রসঙ্গে তথা 'আমি'র স্বতন্ত্রতা নিরূপণে ইহার সামান্য মাত্র অবতারণা। এই সম্পর্কে ঋগ্বেদ প্রথমমণ্ডল বাইশ সূক্তের ছেচল্লিশ মন্ত্রের মর্ম্মার্থ,- একই পরতত্ত্বকে পণ্ডিতগণ বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হইতে বহুবিধরূপে বর্ণনা করেন (একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি) অনুধাবনীয়। অপরন্তু, শ্রীমদ্ভাগবত একাদশস্কন্দ একুশঅধ্যায় ছত্রিশ শ্লোকে ভগবদোক্তি এইরূপ, শব্দব্রহ্ম বেদ অতিগূঢ় ও দুর্বিজ্ঞেয় বিধায়, কেবল মাত্র 'ভাগবতোত্তম' অর্থাৎ যাঁহার চিত্তে কামকর্ম্ম বাসনার উৎপত্তি হয় না, সেই জন ব্যতীত (১১।২১।৫০) অন্য কেহই ইহার যথার্থ তাৎপর্য্য জানে না। সুতরাং দেহের 'আমি' পুরুষকার প্রয়োগে তত্ত্বজ্ঞান সংগ্রহ করিতে পারে, ইহাই সিদ্ধান্ত হয়। দৈবায়ত্ত কুলে জন্ম, মম আয়ত্ত হি পৌরুষম্,- মহাভারতে কর্ণের উক্তি।

আমি – কি বস্তু

বৈদিক যুগের ঋষিগণ 'জীবাত্মা' অর্থাৎ দেহস্থ আত্মা বা 'আমি' কিংবা জীব, ব্রহ্ম অথবা নির্গুণ পরমাত্মা হইতে ভিন্ন নয় বলিয়াছেন। "সোহহং" অর্থাৎ 'আমি সেই' "তত্ত্বমসি" অর্থাৎ 'তুমি হও তিনি',- "অহং ব্রহ্মাস্মি" অর্থাৎ 'আমি হই ব্রহ্ম', এবং "অয়মাত্মা ব্রহ্ম" অর্থাৎ 'এই আত্মা ব্রহ্ম',- চতুর্ব্বেদের এই চারি 'মহাবাক্য' উপরোক্ত মন্তব্যের সমর্থক বিবেচিত হইলেও,- পরবর্ত্তীকালে ব্রহ্মসূত্রে তাহা অবতারণা করা হইয়াছে যে,- ব্রহ্ম জীব হইতে অধিক বা অতিরিক্ত এবং পৃথক,- যেহেতু উভয়ের মধ্যে ভেদ নির্দ্দেশ রহিয়াছে। পক্ষান্তরে উপনিষদে উল্লেখ পাওয়া যায়,- ব্রহ্ম ও জীব উভয়ই অনাদি হইলেও ব্রহ্ম প্রাজ্ঞ, জীব অজ্ঞ,- ব্রহ্মের ঈশীত্ব, অর্থাৎ প্রভুত্ব বিদ্যমান জীবের তাহা নাই। ভক্তিসন্দর্ভে সিদ্ধান্ত এইরূপ যে,- ব্রহ্ম ভগবানের নির্বিশেষ

প্রকাশ এবং নিখিল শক্তিবর্গ ও উহাদের ধর্মাতিরিক্ত জ্ঞানই ব্রহ্মবাদ নামে অভিহিত। পক্ষান্তরে মায়াশক্তি বিশিষ্ট জীবে, ঈশ্বরের অন্তর্যামীরূপে প্রকাশিত তাহাই'পরমাত্মা' এবং পরিপূর্ণ শক্তিবিশিষ্ট জ্ঞানই 'ভগবান' যিনি ব্রহ্মাণ্ডের অশেষ বিভূতিদ্বারা অভিন্ন হইয়াও, ভেদবৎ প্রতীয়মান। জগৎ রচনা, ইহার ধারণ, রক্ষণ, পালন,- জ্ঞানময় ও শক্তিবিশিষ্ট পুরুষেরই কার্য্য, যিনি শ্রীগীতায় 'পুরুষোত্তম' না   ক্ত। তিনি মায়াধীশ,- জীব মায়াবশ।

জীব ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন হইয়াও, কিরূপে অভিন্ন হইতে পারে, ইহার সামঞ্জস্য বিধানে মুণ্ডক উপনিষদ দ্বিতীয় মুণ্ডকের প্রথম খণ্ড প্রথম শ্লোকে, বলা হইয়াছে,- যেমন সুদীপ্ত অগ্নি হইতে সহস্র অগ্নির সজাতীয় অগ্নিকণাসমূহ নির্গত হয়, তেমনি অক্ষরপুরুষ ব্রহ্ম হইতে নানা প্রকার জীবসমূহ অদ্ভুত, অর্থাৎ উপমাস্থলে ব্রহ্মকে সম্যক প্রজ্বলিত অনল নির্দ্দেশ করিলে, জীব তাহা হইতে নির্গত বিস্ফুলিঙ্গ। যদিও অগ্নিও স্ফুলিঙ্গ দৃশ্যতঃ একই রূপ, প্রকৃতিও এক রকম, কিন্তু অগ্নি যেমন বৃহৎ জলিত জলন এবং অগ্নিকণা, তাহার ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশ বা প্রকাশ,- সেইরূপ ব্রহ্ম ও জীবের মধ্যে প্রকৃতিগত ভেদ না থাকিলেও, একে অপরের অপেক্ষা বরিষ্ঠ বা শ্রেষ্ঠ। সুতরাং তত্ত্বতঃ প্রভেদ।

শ্রীগীতাতেও পঞ্চদশ অধ্যায়ের সপ্তম শ্লোকে ভগবদোক্তিতে বলা হইয়াছে,- আমারই অংশ জীব, 'সনাতন' জীবরূপে অর্থাৎ চিরস্থায়ীভাবে জীবলোকে অবস্থিত। এইক্ষেত্রে অর্থালঙ্কাররূপে অতিরিক্ত ভগ্নাংশ শব্দটি পিতা হইতে জাত পুত্র ভাবে গ্রহণ করাই সমীচীন। কারণ সৃষ্টপ্রাণীর ব্যষ্টিভূত জীবাত্মারূপে শাশ্বত অধ্যাত্মসত্তা বহু ভাবাত্মক ভগবানেরই প্রকটিত রূপ এবং 'সনাতন' বাক্যটি জন্মজন্মান্তরের বিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া সজীব সত্তাটির ধারক 'আমি' ভাবাত্মক ব্যষ্টিরূপী 'আত্মা' কেই নির্দ্দেশিত,- যাহা মুক্তিতেও বিলয় হয় না,- যেহেতু তাহা নিত্য, চিরস্থায়ী, চিরন্তন। যদিও পঞ্চম অধ্যায়ের উনিশ শ্লোক অনুসারে ব্রহ্ম নির্দ্দেশভাবে সম,- অর্থাৎ তিনি সর্ব্বতোভাবে, সর্ব্বাংশে একরূপ, অদ্বিতীয়, নিরবচ্ছিন্ন, নিরবয়ব,- সুতরাং তাহার মধ্যে ভেদের চিহ্ন-মাত্র নাই, তথাপি দর্শনশাস্ত্র সম্বন্ধীয় 'স্বগতভেদ' স্বীকার করা যাইতে পারে,- যেমন আমাদের দেহস্থিত অজস্র কোষাণুর সহিত, দেহের বিভেদ অবশ্যই রহিয়াছে।

উপরোক্ত সিদ্ধান্তের ভাবার্থ এই, দর্শনের বিচারে 'ভেদ' তিন প্রকার,- সজাতীয়, অর্থাৎ দুই ব্যক্তির পরস্পর পার্থক্য,- বিজাতীয়, অর্থাৎ মানুষের সহিত পশুর ভেদ,- স্বগত,- অর্থাৎ ব্যক্তি বিশেষের হাতের সহিত যেমন তাহার পায়ের ভেদ। কিন্তু পর 'মাত্মা ব্রহ্ম এই তিন প্রকার ভেদ বর্জ্জিত মনে হইলেও, 'স্বগত ভেদ' আখ্যায়িত করা যায়, যেহেতু যথার্থ সৃষ্টিকর্ত্তার সহিত সৃষ্টজীবের,- অর্থাৎ সৃষ্টিকারী সম্বন্ধে তৎকর্ত্তৃক

স্বাতন্ত্র্য পার্থক্য সর্বদাই বিদ্যমান এবং এই ভিন্নতা অবশ্যই স্বীকৃত। দেহে অবস্থান করিয়াও যেমন কোষাণু স্বতন্ত্রভাবে ক্রিয়াশীল, তেমনি সমস্ত জগৎ স্বরূপতঃ ব্রহ্ম ঈশোপনিষদের প্রথম মন্ত্রের এই সূত্র অনুযায়ী জীব ব্রহ্মে অবস্থান করিয়াও জীবাত্মা, রূপে স্বীয়সত্তায় পৃথক,- যেমন জলে মৎস্য সমূহের অবাধ ও স্বতন্ত্ররূপে বিচরণ কিংবা বায়ুতে বালু কণিকা ভাসমান।

বেদান্তসূত্রে এই সমস্যার এইরূপ সমাধান রহিয়াছে যে,- বিভিন্ন আকারের ঘটমধ্যস্থ আকাশকে বাহিরের মহাকাশ হইতে পৃথক বলিয়া বোধ করিবার ন্যায় একটি দেহমধ্যস্থ জীবাত্মাকে যেমন অন্য সকল দেহস্থিত জীবাত্মা হইতে ভিন্ন বলিয়া জ্ঞান করা যায়,- তেমনি মহাকাশ সদৃশ ব্রহ্মের বিভিন্ন জীবদেহে অবস্থানও, ব্যষ্টি জীবচৈতন্ত হইতে পৃথক। কারণ এই ক্ষেত্রে তিনি পরমাত্মারূপে জীবের পরিচালক। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ ষষ্ঠঅধ্যায়ের দশম শ্লোকে বর্ণিত রহিয়াছে যে,- মাকড়সা যেমন নিজের মধ্য হইতে জাল রচনা করিয়া আপনি স্বতন্ত্রভাবে অবস্থান করে,- তেমনি সর্ব্বব্যাপী, সকল প্রাণীর অন্তরাত্মা, কর্মাধ্যক্ষ, সর্ব্বভূতের নিবাসস্থল, সর্ব্বসাক্ষী, চেতয়িতা, নিরুপাধিক ও নির্গুণ, দেহ সংযোগের কারণ, পাপপুণ্যের হেতুভূত, অদ্বিতীয়দেব,- ব্রহ্মস্বরূপ পরমাত্মা বা পরমেশ্বর মায়াশক্তি (শ্বে-শ্ব-উপ ৪।১০) অবলম্বন পূর্ব্বক, অব্যক্ত প্রকৃতি প্রসূত তত্ত্ব অর্থাৎ নাম, রূপ ও কর্মদ্বারা নিজেকে আচ্ছাদিত রাখিয়া এবং পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশরূপে আপনাকে বিবর্ত্তিত করিয়া,- তাঁহারই স্বতঃপ্রকাশ মহিমায় সংসারমণ্ডলে অখিল রূপধারা ব্রহ্মচক্রে আবর্ত্তন পূর্ব্বক,স্বয়ং স্বমহিমায় বিরাজিত।

উল্লেখযোগ্য যে, পূর্ব্বরূপ পরিত্যাগ করিয়া কোন কার্য্যরূপ ধারণ করাকে 'পরিণাম' বলে,- যেমন ঘট মৃত্তিকার পরিণাম এবং পূর্ব্বরূপ পরিত্যাগ না করিয়া কার্য্যরূপে প্রতিভাত হওয়াকে বলে 'বিবর্ত্ত',- যেমন অন্ধকারে রজ্জুকে সর্প কল্পনা।

সুতরাং মৃত্তিকার লুপ্তিতে ঘটের আত্মপ্রকাশের ন্যায়, জীবজগৎ ব্রহ্মের পরিণাম নয়,- বরং বিশেষরূপে স্থিতির ন্যায় ব্রহ্মের বিবর্ত্ত বলা যায়। অধিকন্তু উপরোক্ত অধ্যায়ের পরবর্ত্তী দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শ্লোকে বিশেষ উল্লেখ রহিয়াছে, যিনি জীবের বীজ বা জীব তাহার প্রতিবিম্ব এবং যিনি অদ্বিতীয় হইয়াও ভক্তদিগকে নিজ কৃপারূপ আনুকূল্য বা ভোগসমূহ প্রদান করেন এবং যিনি ভক্তিরূপ সাধনাদ্বারা উপলভ্য,-সেই জ্যোতির্ম্ময়ের শরণ গ্রহণ করিলে, সকল সমস্যার সহজ সমাধান হইয়া সংসার বন্ধন অচিরে বিনষ্ট হয়।

সুতরাং শরণ্য এবং শরণাপন্ন অবশ্যই পৃথক হইতে হইবে,- যেমন আরাধ্য ও আরাধক আলাদা। পূর্ব্ববর্ত্তী চতুর্থ অধ্যায়ের বিংশতি শ্লোকের মর্মকথা এইরূপ যে,-

আমি কি বস্তু

ইন্দ্রিয়াদির অগোচর এই পরমেশ্বরের স্বরূপ, শুভ বুদ্ধিসহায়ে জ্ঞাত হওয়া যায় এবং তৎপূর্ব্ববর্ত্তী প্রথম অধ্যায়ের দশম শ্লোকে, সংসাররূপ মায়ার নিবৃত্তি জন্য, তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ একাগ্রচিত্তে ধ্যান করিবার নির্দ্দেশ। যেহেতু পৌর্ব্বদৈহিক কর্ম্মের ফলেই বর্ত্তমান দেহ এবং জন্মজন্মান্তরে 'আমি'র বিচারসাধ্য সাধনদ্বারাই ভগবানে আনুরক্তি লাভ হয়,- তাই অন্তঃকরণে উপহিত বা অন্তঃকরণের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন চৈতন্যই আমি সংজ্ঞিত জীব,- যাহা স্বতন্ত্র সত্তা বলিয়াই, কাম্যবস্তু লাভের বা উদ্দেশ্য সিদ্ধির অনুকূল পবিত্র সংযত ভোগবর্জ্জিত জীবন যাপ, তথা জ্ঞানানুশীলন সম্ভব। অর্থাৎ ব্রহ্ম ও জীব, পরস্পর অসম্বন্ধ এবং জীবে স্বাধীনতা রহিয়াছে বলিয়াই স্বীয় প্রচেষ্টায় ব্রহ্মজ্ঞান সংগ্রহ হইতে পারে।

বিশিষ্টাদ্বৈত বাদের মতে চেতন অচেতন যাবতীয় পদার্থ লইয়া যে ব্রহ্মের শরীর এবং ব্রহ্ম সেই শরীরের আত্মা স্বরূপ। অর্থাৎ জীব ও ব্রহ্ম স্বরূপতঃ এক হইলেও বীজে খোসার আবরণের মত বা সমুদ্রে তরঙ্গের ন্যায়, প্রভেদ রহিয়াছে। ইহার স্ফুটতর ব্যাখ্যায় বলা হইয়াছে,- ব্রহ্ম যেন সূর্য্যস্বরূপ এবং জীব তাহা হইতে নিঃসৃত কিরণ। অর্থাৎ ঈশ্বরকে অংশুমালী বলিলে, জীব তন্নিঃসৃত অংশুস্থানীয়,- সুতরাং জীবাত্মা তদংশসম্ভূত (গীতা ১৫।৭) ঈশ্বরের মতই নিত্য এবং ঈশ্বরের সহিত জীবের সম্বন্ধও অচ্ছেদ্য। কঠোপনিষদ প্রথম অধ্যায় তৃতীয় বল্লীর আরম্ভেই উপাস্য ও উপাসকের এই সঙ্কেত পাওয়া যায় যে,- নিজ কর্ম্মের অবশ্যম্ভাবী ফল ভোগকারী ও দ্রষ্টারূপে দুইজন পুরুষ, অর্থাৎ জীব ও ঈশ্বর, ভোগায়তন এই শরীরের মধ্যে প্রবিষ্ট আছেন, আলো ও ছায়ার ন্যায় তাহারা পরস্পর ভিন্ন। পরবর্ত্তী শ্লোকে উল্লেখ রহিয়াছে,- দেহকে রথ এবং দেহস্থিত জীবাত্মাকে রথের সারথি জানিবে এবং শ্রেষ্ঠ আচার্য্য সমীপে এই তত্ত্ব বিশেষ অবগত হইয়া, একাগ্র মনের সহিত যুক্ত, বিবেকবান বুদ্ধি সাহায্যে আত্মদর্শন করিয়া মৃত্যুমুখ হইতে বিমুক্ত হইবে,- যেহেতু পরমাত্মা আত্মসমাহিত মন (২।১।১১) এবং নিজ বুদ্ধিদ্বারা (২।২।১২) উপলভ্য ও দর্শনীয়।

সুতরাং শাস্ত্রাদি যুক্তিসম্মত ও স্বীয় অনুভূতিদ্বারা লব্ধ, ইহাই সিদ্ধান্ত হয় যে,- 'আমি' বা 'আমার আত্মা' দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি হইতে সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন এবং তাহা দেহেন্দ্রিয়াদির বিনাশে বিনষ্ট হইবার নয়। কোনরূপেই হইতে পারে না। পরন্তু পরমাত্মা সদৃশ, অজর, অমর ও চিৎস্বরূপ হইয়াও, জীবাত্মা স্বকীয় সত্তায় পৃথক এবং তাহাতে 'আমি ধর্ম্ম' সংশ্লিষ্ট না হইলে, সুখলাভ ও দুঃখনিবৃত্তির প্রবৃত্তি শিথিল হইয়া পড়ে। কাজেই রাগমূলক ও দ্বেষমূলক প্রেরণার উৎস 'আমি' জীবাত্মার জন্মজন্মান্তরের সঙ্গী,- যাহা প্রাপঞ্চিক বিষয়সমূহে আসক্তি ত্যাগ ও পাপরূপ কামনা পরিহার (গীতা

৩।৪১) করিয়া, বশীভূত ইন্দ্রিয়াদি সহায়ে জগৎ জননাকূল সামর্থ্য, তথা যথোপযুক্ত বিষয় ভোগদ্বারা দেহের স্বাস্থ্য রক্ষায় ও আত্মার উর্দ্ধগতি রূপায়ণে সমর্থ।

প্রত্যুত শ্রীমদ্ভাগবত একাদশ স্কন্ধ দ্বিতীয় অধ্যায়ের সাঁইত্রিশ শ্লোকে স্পষ্টভাবে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে যে- স্বীয় চৈতন্যসত্তা ভুলিয়া 'আমি' বা দেহাশ্রিত জীবাত্মা, যদি মায়া কবলিত অহমিকা প্রভাবে দেহেন্দ্রিয়, তথা স্থূল ও সূক্ষ্মশরীরে অবিদ্যারূপ আত্মাভিমানে অভিনিবিষ্ট হয়, তবে তাহাই পরিণামে চিত্তকে ভগবৎবিমুখ করিয়া আত্মস্বরূপ বিস্মৃত 'আমি'তে মৃত্যুভয় আনয়ন করে। তাৎপর্য্য এই, ত্রিগুণের পরিণতি দেহেন্দ্রিয়াদিতে 'আমি' ও 'আমার' আত্মবুদ্ধি করাই ভ্রান্তিমূলক, যাহা দ্বিতীয়বস্তু'দেহ' বিনাশে, প্রথমবস্তু 'আমি' বিনষ্ট হইব,- এই প্রকার ভয় উৎপন্ন করে এবং অন্তরের নিত্যসিদ্ধ 'আনন্দ'কে প্রাকৃত বিষয়ের সহিত, অর্থাৎ ধনজন, প্রতিষ্ঠা প্রতিপত্তির সম্পর্কযুক্ত জাগতিক কার্য্যকারণ মনে করিয়া অদম্য অতৃপ্ত বৈষয়িক সুখভোগে বাধাপ্রাপ্ত আকাঙ্খাকে, নিজের সর্ব্বতোমুখী অসমর্থতা ভাবিয়া সন্ত্রস্ত ও কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়ে। অর্থাৎ দেহ-গেহ ধন পরিজন বিয়োগ ভাবনা হইতেই ভয়ের উৎপত্তি,- যাহার উদ্ভব ঐ সকল অস্থির বস্তুতে 'ইহা আমার' এইরূপ মানসিক অবস্থার প্রয়োগ এবং 'আমি কি বস্তু' তৎসম্পর্কে অজ্ঞাতা বা অনবধানতা।

আমির স্বরূপ

'আমি' দেহস্থিত আত্মা এবং ত্রিগুণাত্মক কার্য্য কারণ সংঘাতে ক্রিয়াশীল দেহেন্দ্রিয়াদি, নহি এবং 'কর্ম' আমার বা আত্মার নহে,- পরন্তু পূর্ব্বজন্ম বাসনাবশে বা সহজাত প্রবৃত্তি অনুসারে ইন্দ্রিয়াদির ক্রিয়া,- এইরূপে গুণ ও কর্ম হইতে, আমি বা আত্মার বিভাগ করিলে, আমি কেন ও কি বস্তু,- আমার কর্ত্তব্য কি,- অবিরত সংসার দুঃখের হেতু কি,- ইত্যাদি যথার্থ জিজ্ঞাসা অন্তরের অন্তরে,- অর্থাৎ আমি সত্তায় জাগরিত হইয়া, ভগবৎ বিধানে আত্মত্রাণোপায় চিন্তার উন্মেষ হয়,- ইহাই গীতোক্ত আত্মা কর্ত্তৃক আত্মার উদ্ধার করিবার রহস্য,- যাহা ষষ্ঠ অধ্যায়ের পঞ্চম শ্লোকে এবং কঠোপনিষৎ দ্বিতীয় অধ্যায় প্রথম বল্লীর একাদশ শ্লোকে, 'আমি'র বিবেকযুক্ত মনদ্বারা, আপনাকে ভববন্ধন হইতে মুক্ত, তথা ব্রহ্মকে উপলব্ধি করিবার উল্লেখ রহিয়াছে। যেহেতু জ্বলন্ত লৌহপিণ্ডে প্রকাশিত অগ্নির ন্যায়, দেহেন্দ্রিয়াদি সংঘাতে অভিব্যক্ত আত্মচৈতন্যের আভাসদ্বারা অন্তঃকরণ পরিব্যাপ্ত,- তাই সর্ব্বসংস্কার মুক্ত 'আমি' স্বীয় চৈতন্যসত্তায় স্থিত থাকিয়া চিত্তবৃত্তিকে কল্যাণের অভিমুখে পরিচালিত করিতে পারে।

শ্রীগীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ের দ্বিষষ্ঠী শ্লোকে,- জীবাত্মার পরমশান্তিময় শাশ্বত পদ প্রাপ্তির জন্য, 'আমি'র চিন্তা, বাক্য ও কর্মকে, ভগবৎ অভিমুখীন রাখা, নিজ

আমির স্বরূপ

কর্ত্তব্যের অন্তর্গত বিষয় বলিয়া নির্দ্দেশিত। কঠোপনিষদের প্রথম অধ্যায়ের দ্বিতীয় বল্লীর চতুর্বিংশতি মন্ত্রে, আত্মজ্ঞান লাভের উপায় সম্পর্কে,- পাপাচরণ হইতে নিবৃত্ত, ইন্দ্রিয় লোলুপতা হইতে বিরত ও প্রশান্তচিত্ততা অর্জনের যে উল্লেখ রহিয়াছে, তাহাতেও 'আমি'র স্বতন্ত্রতা পরিলক্ষিত। মুণ্ডকোপনিষদ দ্বিতীয় মুণ্ডক দ্বিতীয় খণ্ডের ষষ্ঠ প্রকরণে এবং শ্বেতাশ্বতর প্রথম অধ্যায় এয়োদশ শ্লোকে,- দেখি, শুনি, ক্রুদ্ধ হই, ইত্যাদি বিবিধ প্রকারে প্রতিভাত জীবাত্মাকে 'প্রণবমন্ত্র' জপদ্বারা উপলব্ধির উপায় নির্ণীত। কাজেই অন্তরে লুকায়িত জ্যোতির্ম্ময় উপলব্ধ বিষয় ও অনুক্ষণ উচ্চারিত মন্ত্র উপলব্ধিকারী 'আমি' অবশ্যই আপন মহিমায় পৃথক সত্তা। জড় কার্য্য কারণ সঞ্জাত হইতে স্বতন্ত্র, যাহার ইচ্ছায় প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি বিষয়ে মন ধাবিত হয়, তাহা ইন্দ্রিয়াতীত বস্তু, কেন উপনিষদের প্রথমেই স্থাপিত এই নিরুক্তি অনুসারে, ইহাই সিদ্ধান্ত হয় যে, অস্বতন্ত্র মনের নিয়ন্তা 'আমি'। ভাবার্থ এই যাহার সাহায্যে তপ্ত লৌহ দেহ দগ্ধ করে, তাহা যেমন লৌহখণ্ড নয়,- পরন্তু তাহাতে সংশ্লিষ্ট অগ্নি,- তেমনি যাহার প্রভাবে অন্তঃকরণ রূপরসাদি জানে, তাহা দেহাতিরিক্ত,- অথচ দেহাভিমানী 'আমি' বা জীবের জীবাত্মা।

আমির আয়তন

জীবাত্মার "আয়তন" সম্পর্কে মুণ্ডক উপনিষদে, অণু পরিমান বা অতিসূক্ষ্ম উল্লেখ রহিয়াছে। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে পঞ্চম অধ্যায়ের নবম শ্লোকে বলা আছে যে, একটি কেশাগ্র শতভাগে বিভক্ত করিয়া, তাহার একটি ভগ্নাংশকে পুনরায় শতধা বিদীর্ণ করিলে যাহা হয়,- জীবাত্মা যেন তদপেক্ষাও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম। পরবর্ত্তী শ্লোকের উক্তি এই যে,- এই জীব বা আত্মা, নর কিংবা নারী অথবা নপুংসক নহে এবং যখন যে শরীর গ্রহণ করেন, তাহাতে আত্মাভিমানহেতু নিজেকে সেই পরিসর বা তৎ আকার মনে করেন। একাদশ ও দ্বাদশ শ্লোকের স্ফুটতর বর্ণনার সারার্থ এই,- ভোজনের দ্বারা যেরূপ স্থুল শরীরের বৃদ্ধি হয়, সেইরূপ মানসিক সঙ্কল্প, বিষয় সংযোগ এবং তজ্জনিত লোভ দৃষ্টির আসক্তি বশতঃ সূক্ষ্মশরীরে কর্ম্মফল অনুভবের বাসনা বা সংস্কার সৃষ্টি হয়, যাহার বশবর্ত্তী হইয়া জীব পাপপুণ্যের কর্ম্মানুরূপ বৃহৎ ও ক্ষুদ্র,- অর্থাৎ হস্তী বা মশক শরীরের সহিতও সম্বদ্ধ হন। ব্রহ্মসূত্রের দ্বিতীয় অধ্যায়ে সূক্ষ্মদেহ উপাধিভূত জীবাত্মার লিঙ্গ শরীর অতিসূক্ষ্ম বলা হইয়াছে। শ্রীগীতায় জীবাত্মার সূক্ষ্ম আয়তন সম্বন্ধে বর্ণিত আছে,- ইনি জন্ম, অস্তিত্ব, বৃদ্ধি, পরিণাম, অপক্ষয় ও বিনাশ,- এই ষড়বিধ জড়ধর্ম্ম বিবর্জ্জিত থাকিয়া, বায়ুর ন্যায় অবয়ববিহীন ভাবে সমগ্রদেহের চেতনা সম্পাদনকালে, চিত্তের সমাহিত হইবার সমাশ্রয়।

যেমন শরীরের কোনস্থানে চন্দনবিন্দু স্থাপিত হইলে, সর্ব্বাঙ্গে স্নিগ্ধতা অনুভূত হয়,

সেইরূপ দেহৈক দেশস্থ আত্মা সমগ্র দেহব্যাপী বেদনাদির অনুভব করেন। প্রজ্বলিত প্রদীপ একস্থানে থাকিয়াও তাহার প্রদীপ্ত প্রভা গৃহপ্রসারী হইয়া সমুদয় প্রকাশ্য বিষয় যেরূপ প্রকাশ করে,- তেমনি আত্মা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অণু হইলেও, তাহার চৈতন্যগুণ প্রভাব সর্ব্বদেহে ব্যাপ্ত হইয়া, সকল দেহব্যাপী কার্য্য নিষ্পন্ন করে,- তাই দেহের বিভিন্ন স্থানের প্রদাহ যুগপৎ অনুভূত হইয়া থাকে। অধিকন্তু গন্ধগুণ যেমন গন্ধদ্রব্য হইতে বিশ্লিষ্ট হইয়া, স্থানান্তরে প্রসারিত হয়,- কিংবা গন্ধপুষ্পের অপ্রাপ্তি স্থলেও, তাহার সৌরভ পাওয়া যায়,- তেমনি আত্মা অণু হইলেও, তদীয় চৈতন্যগুণের অন্য স্থানেও সংক্রমণ হইয়া থাকে।

উপরোক্ত শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্ত এইরূপ বিশ্লেষণ করা যায়,- মূলদ্রব্যের কিছুমাত্র ক্ষয় না ঘটিয়া ফুল্লকুসুমের বিশ্লিষ্ট গন্ধবহ পরমাণু হইতে ব্যক্ত, বিভিন্ন গন্ধাদি যেমন বৃক্ষে আরূঢ় ব্যক্তিকর্ত্তৃক উপলব্ধ হয়,- যাহা পুষ্পধর্মের তত্ত্ব বা গুণ,- তেমনি নিত্যস্থির চৈতন্যস্বরূপ আত্মা বিন্দুমাত্র স্খলিত না হইয়া, বৃক্ষের ন্যায় স্তব্ধভাবে (শ্বেঃ ৩।৯) আপন প্রকাশাত্মক মহিমায় শরীরে সমারূঢ় অবস্থায়, নিজেকে দেহের 'কর্ত্তা' বা 'প্রভু' জ্ঞান করা কালীন, স্বীয় গুণ প্রজ্ঞা'র দ্বারা,- অর্থাৎ যেইজ্ঞান দ্বারা বিষয়ের উপলব্ধি হয় তৎসহায়ে 'করণ' রূপে,- অর্থাৎ যাহা কর্ত্তৃক ক্রিয়াদি নিষ্পন্ন হয় তদবলম্বনে সর্ব্বশরীরে ব্যাপ্ত থাকেন। সরলার্থ এই, বৃক্ষে অবস্থিত গন্ধপুষ্প যেমন স্বাভাবিক গন্ধ-গুণ কর্ত্তৃক অন্যত্র প্রসারিত হয়,- তেমনি যেন জীবের হৃদয়দেশে অবস্থান করিয়াও, জীবাত্মা তদীয় চৈতন্যধর্ম অবলম্বনে সর্ব্বশরীরে পরিব্যাপ্ত থাকেন। ভাবার্থ এই,- গন্ধগুণ ধর্মদ্বারা পুষ্পের চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইবার ন্যায়, চৈতন্যগুণ আশ্রয়ে জীবাত্মার জীব-দেহের সর্ব্বত্র ব্যাপিতা। সারার্থ এইরূপ,- পুষ্পের স্থানান্তর না ঘটিয়াও বৃক্ষস্থিত পুষ্প হইতেই চ্যুত গন্ধগুণ দ্বারা, সমীপবর্ত্তী ব্যক্তিবিশেষের ঘ্রাণশক্তি আকর্ষণ করিয়া, মনোরঞ্জন বা সর্ব্বেন্দ্রিয় পরিতৃপ্ত করিবার ন্যায়,- একস্থানে স্থিত থাকিয়াও, জীবাত্মা তদীয় চৈতন্যগুণ কর্ত্তৃক আকর্ষিত ইন্দ্রিয়াদির জ্ঞানশক্তি গ্রহণ পূর্ব্বক সর্ব্বদেহ মনে ব্যাপ্ত হন।

প্রশ্নোপনিষদের সিদ্ধান্তে অণুপরিমাণ জীবাত্মা, পরমাত্মার ছায়াসদৃশ হইয়া জীবদেহে অবস্থান করেন। সাংখ্যদর্শনের উপপাদ্য এই,- অনন্তদেহের চিৎস্বরূপ জীবাত্মাও অন্তহীন,-অর্থাৎ' সংখ্যাতীত এবং জন্মমরণ বিরহিত,- সুতরাং নিত্যবস্তু,- অর্থাৎ চিরস্থায়ী। কারণ 'জন্মমৃত্যু' শব্দ বিনাশশীল দেহ সম্বন্ধেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে,- জীবাত্মা সম্পর্কে নহে। ভোগ্য পদার্থই জাত হয়,- আবার লোপ পায়,-

ভোক্তা জীব নয়। বুদ্ধির সুখদুঃখ মোহাত্মক প্রত্যয়সমূহ,- নিত্য চৈতন্য স্বরূপ আত্মা বা জীব কর্তৃক যেন গ্রস্ত বা অভিভূত হইয়া জাত হয় বলিয়া, জীবাত্মাকে 'ভোক্তা' ভ্রম হয় বা স্বয়ং অপ্রবৃত্ত হইলেও, শরীরেন্দ্রিয়াদির ব্যাপারে যেন প্রবৃত্ত বা ব্যাপৃত, প্রতিভাত হইয়া থাকে। দেহাবচ্ছিন্ন অবস্থায়,- অর্থাৎ জীবাত্মা স্থূলদেহ ত্যাগ করিলে, জীবচৈতন্য সঙ্কুচিত হইয়া, জীবের সূক্ষ্মশরীরে, অর্থাৎ অন্তরাত্মায় লীন থাকে, যাহা পরজন্মে ইন্দ্রিয়াদির মধ্যদিয়া উদ্বোধিত হয়। সুতরাং জীবাত্মার অবস্থিতি পর্য্যন্ত দেহেন্দ্রিয়াদিদ্বারা কৃত কর্মসংস্কার ইহ জীবনেই নিঃশেষ হয় না,- অর্থাৎ মানুষ শস্যের ন্যায় জীর্ণ হইয়া মৃত্যু বরণ করিয়া, পুনরায় শস্যের ন্যায় জন্মাইলেও,- জন্মজন্মান্তরের কর্ম সংস্কার জীবের অতি সূক্ষ্ম চৈতন্য সত্তায়, অর্থাৎ মনোময় সূক্ষ্মদেহে 'কারণ' রূপে নিহিত থাকে,- তাহাই পরবর্ত্তী স্থূলদেহের জীবাত্মায় অধ্যাসিত অহংবোধ বা 'আমি'র মাধ্যমে কর্মভোগ কারণে ক্রিয়াশীল হয় এবং ইহাই জীবাত্মার দেহান্তর গ্রহণের (বৃহ উপ ৪।৪।৬) হেতু। তাই বেদান্তদর্শনে সূক্ষ্ম দেহকে "কারণ শরীর" উল্লেখ।

প্রণিধান যোগ্য যে, হৃদয়স্থিত সকল কামনা হইতে মুক্ত ব্রহ্মানন্দেরত (কঠ ২।৩।১৪) জীবন্মুক্তের, বুদ্ধির বন্ধনসমূহ বিনষ্ট (মুণ্ডক২।২ ৮) হওয়ায়, তাঁহার 'আমিসত্তায়' দেহরক্ষার্থে প্রয়োজনীয় খাদ্য বস্ত্রাদি ব্যতীত অন্য কোনরূপ কামনার উদ্রেক হয়না,- যাহা কেবল ক্ষুন্নিবৃত্তি জন্য, প্রারব্ধবশে অবোধপূর্ব্বক অনুষ্ঠিত বলিয়া কামনা পদবাচ্য নয় তাৎপর্য্য এই পুষ্পের সুবাস, যেমন তৎসংশ্লিষ্ট জড়দ্রব্যাদি,- অর্থাৎ জল, তৈল, বস্ত্রাদিকে সুবাসিত করে,- তেমনি সূক্ষ্মদেহে সংস্থিত জন্মান্তরিণ সংস্কার স্থূলদেহে ব্যাপ্তীশীল হয়। পরন্তু আহার নিদ্রা, মলমূত্র ত্যাগ, যেমন শারীরিক ধর্মবশে আপনা হইতে নিষ্পন্ন হইয়া থাকে,- আত্মজ্ঞানীর সহজাত প্রবৃত্তি বশে শরীর ও জীবন ধারণার্থ ইচ্ছানুবর্ত্তিতা বিহীন বা মমত্বভাব বর্জ্জিত বিষয় ভোগও তদ্রূপ।

ভাবার্থ এই,- প্রকৃতির ক্রিয়ায়, অর্থাৎ শরীরেন্দ্রিয়াদি পঞ্চকর্মেন্দ্রিয় ও পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় (গীঃ ১৮।১৩) সংঘাতে কর্মে পরিণত, পূর্ব্বজন্মাদির ধর্মাধর্ম সংস্কাররূপ অভিব্যক্তিকে (গীঃ ৩।২৭) 'আমি কর্ত্তারূপ' আত্মবুদ্ধি না করিয়া বা প্রিয়বস্তুতে স্বাভাবিক আসক্তি ও অপ্রিয়বস্তুতে বিদ্বেষ পোষণ না করিয়া,- কেবল দেহরক্ষার্থ অপরিহার্য্য বিষয়সমূহ স্ব-বশীভূত ইন্দ্রিয়দ্বারা অনাসক্তভাবে গ্রহণ (গীঃ ২।৬৪) করায়, তাহা ফলাকাঙ্খা পরিত্যাগ পূর্ব্বক ঈশ্বর নির্ভরতায় অনাসক্তভাবে কৃত নিষ্কাম কর্মানুষ্ঠান বলিয়া 'কর্মযোগে' পরিণত হওয়ায়, ফলোৎপাদনে অক্ষম বিশীর্ণ কাম্যকর্মাদির (গীঃ ৪।৪১।১৮।২২) কর্মসংস্কার,- প্রাণ ও সূক্ষ্মশরীরকে স্থূল শরীরাভ্যন্তরে লইয়া যাইবার

কর্ত্তা বা 'প্রাণ শরীর নেতা' (মুণ্ডক ২।২।৭) জীবাত্মাকে, আবদ্ধ করিতে না পারায় (গীঃ ৪।৩৭) স্থূলদেহেই ব্রহ্মানন্দ উপভোগকারী (কঠ ২।৩।১৪) বা ব্রহ্মস্বরূপে অবস্থিত (গীঃ ২।৭২) কর্মযোগী (গীঃ ৬।১) চিত্ত বিক্ষেপের কারণ কর্মফলের বাসনা মুক্ত ও নিষ্কাম কর্মদ্বারা শুদ্ধচিত্ত, ব্রহ্মনামা পুরুষের (গীঃ ৫।২৪) জীবলীলা অবসানে শুদ্ধাত্মার উপনীত (বৃহ-উপ ৪।৪।৬) তদীয় 'আমি' বা জীবাত্মার পরিচায়ক স্বয়ং স্বরূপ প্রকাশক উদিত সূর্যের ন্যায়, পরমজ্যোতিসম্পন্ন স্বীয় স্বরূপে (ছাঃ ৮।১২। ৩) সর্ব্বলোকে স্বচ্ছন্দগতি প্রাপ্ত হইয়া (ছাঃ ৮।৪।৪।৩) নিত্য অভিব্যক্ত (চৈতন্য-জ্যোতির মানসচক্ষু অবলম্বনে (ছাঃ ৮।১২।৫) যাবতীয় কাম্যবস্তু, দর্শন দ্বারা উপভোগ (তৈঃ ২।১।৩) করিয়া, সূর্যাচন্দ্র বিহীন স্বয়ং দেদীপ্যমান (কঠ ২।২।১৫, মুণ্ডক ২।১০) অপ্রাকৃত ব্রহ্মলোকে (ছাঃ ৮।১৫।১) অনির্ব্বচনীয় আনন্দে অবস্থান করেন,- যেই পরমধাম হইতে কর্মবশে জড় জগতে জন্মান্তর গ্রহণ জন্য, প্রত্যাবর্ত্তন (শ্বেঃ ৪।১৫, বৃহ ৬।২।১৫) হয়না,- যাহা গীতোক্ত (২।৫১, ৮।২১, ১৫।৬, ১৮।৬২) শাশ্বত শান্তিপ্রদ চির আকাঙ্খিত পরমানন্দময় ভগবৎ সান্নিধ্য প্রাপ্তি ।

যাহা দৃষ্টিগ্রাহ্য, বা বাহিরে দৃশ্য, সেইটি জীবের স্থূলশরীর,- তাহার অভ্যন্তরে বরফে অবস্থিত অদৃশ্য জলের ন্যায়, কিংবা ধূমাকারে বিদ্যমান বাষ্পের মত, সূক্ষ্মশরীর যাহা মনের উপাশ্রয়,- অর্থাৎ চিন্তা ধারণা, কল্পনা,বাসনা,কামনা, আবেগ, উত্তেজনা, অনুভূতির সূক্ষ্মভূত অবস্থা রূপ তন্মাত্রার আধার এবং এই সূক্ষ্মদেহেই নিহিত থাকে,- পূর্ব্বতন জীবনের অভিজ্ঞতা, স্মৃতি, মেধা, নৈতিক জ্ঞানের সংস্কার । চৈতন্যগুণ বিশিষ্ট জীবাত্মার সূক্ষ্মদেহ আশ্রয়ে, স্থূলদেহে অস্তিত্বের জন্যই, মানুষ নিজেকে জ্ঞাতা, কর্ত্তা ও ভোক্তা অভিমান করে এবং ঐ পাঞ্চভৌতিক জড়দেহ প্রাণহীন হইবামাত্র জীবাত্মা সূক্ষ্মদেহে আবৃত হইয়া, 'আকাশস্থ নিরালম্ব বায়ুভূত নিরাশ্রয়' অবস্থায় কিছুকাল অন্তরীক্ষে অবস্থান করে । এই মনোময় সূক্ষ্মদেহকে 'আতিবাহিক দেহ, বলা হয় । যেহেতু স্থূলশরীর ও জীবাত্মার মধ্যে সংযোগ রক্ষাকারীরূপে সূক্ষ্মভাবে বিদ্যমান থাকিয়া, দেহাদির আত্মরূপে ক্রিয়াশীল, তাই মুণ্ডকোপনিষদের দ্বিতীয় মুণ্ডক প্রথমখণ্ড নবম প্রকরণে, সূক্ষ্মদেহকে 'অন্তরাত্মা' বলা হইয়াছে,- যাহা গাত্রাবরণ ন্যায় জীবাত্মা হইতে পৃথক সত্ত্বা, কেবল সংস্কারাদির বাহক ।

আমির অবস্থানক্ষেত্র

জীবদেহে জীবাত্ম 'অবস্থান ক্ষেত্র' সম্পর্কে, শ্রীগীতার এয়োদশ অধ্যায় অষ্টাদশ শ্লোক, ঈশোপনিষদ ষোড়াশ শ্লোক ; কঠ প্রথম অধ্যায় দ্বিতীয়বল্লীর বিংশতি, দ্বিতীয়

অধ্যায় প্রথমবল্লীর দ্বাদশ ও তৃতীয়বল্লীর সপ্তদশ শ্লোক, মুণ্ডক দ্বিতীয় মুণ্ডক প্রথম খণ্ডের দশম এবং দ্বিতীয় মুণ্ডক প্রথম খণ্ডের দশম এবং দ্বিতীয় খণ্ডের সপ্তম ও নবমপ্রকরণ, তৈত্তরীয় প্রথম অধ্যায় ষষ্ঠ অনুবাকের প্রথম কারিকা, ঐতরেয়ো প্রথম অধ্যায় তৃতীয় খণ্ডের দ্বাদশ শ্লোক, শ্বেতাশ্বতর তৃতীয় অধ্যায় ত্রয়োদশ ও চতুর্থ অধ্যায় সপ্তরশ শ্লোক, প্রশ্নোপনিষদ তৃতীয় প্রশ্ন ষষ্ঠ সূত্র, ছান্দোগ্য তৃতীয় অধ্যায় চতুর্দ্দশ খণ্ডের চতুর্থ ও অষ্টম অধ্যায় প্রথম খণ্ডের প্রথম এবং তৃতীয় খণ্ডের তৃতীয় কণ্ডিকা, বৃহদারণ্যক তৃতীয় অধ্যায় চতুর্থ ব্রাহ্মণ প্রভৃতির সূত্রকার সিদ্ধান্তমতে, জীবাত্মা সর্ব্ব জীবের 'হৃদয়ে' অবস্থিত।

কঠোপনিষদ দ্বিতীয় অধ্যায় প্রথম বল্লীর দ্বাদশ শ্লোক এবং শ্বেতাশ্বতর পঞ্চম অধ্যায় অষ্টম শ্লোকে, জীবাত্মার. স্থূল দেহের হৃদয় পুণ্ডরীকে জ্যোতির্ময় পুরুষরূপে 'অঙ্গুষ্ঠ পরিমাণ' স্থান ব্যাপিয়া অবস্থানের উপমা হয়ত এই,— শ্বেতশুভ্র পদ্মের ন্যায় হৃদয়পদ্ম মধ্যস্থ জ্যোতিসদৃশ আকাশ পদবাচ্য (বৃহ—৩ | ৪ | ২২) চিদাকাশ বা জ্ঞানময় আকাশ অথবা চিন্তা, বিচার, সিদ্ধান্তের কেন্দ্র, চিত্তাকাশ, অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ এবং চৈতন্য জ্যোতিরূপে বা স্ব-স্বরূপ প্রাপ্ত হইযা (ছান্দোগ্য ৬ | ৮ | ১) জীবাত্মার তথায় অবস্থিতি (বৃহ—২ | ১ | ১৭) বলিযাই যেন ঐরূপ সীমিত স্থান নির্দ্দেশিত, যদিও শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ তৃতীয় অধ্যায়ের বিংশতি শ্লোকে, সকল প্রাণী হৃদয়ে আত্মস্বরূপে অবস্থিত জীবাত্মাকে অণু হইতেও অণুতর এবং মহান হইতেও মহত্তর বলিয়া আখ্যায়িত আছে এবং কঠোপনিষদে দ্বিতীয় অধ্যায় দিতীয় বল্লীর দশমশ্লোকে বলা হইয়াছে যে, বায়ুর ন্যায় প্রাণরূপে সমগ্র দেহব্যাপি অবস্থিতির ন্যায়, চৈতন্যসত্তা জীবাত্মা জীবদেহে প্রবিষ্ট থাকাকালীন, সেই শরীরের আকার বিশিষ্ট হইয়া অবস্থান করেন। প্রশ্নো পনিষদ মতে (২ | ৭) চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের সহিত, ইঁহার প্রতি শরীরে বসতি। মুণ্ডক উপনিষদ বলেন (২ | ২ | ৯) হৃদয পদ্মরূপে কোষমধ্যে জীবাত্মা অবস্থিত থাকিয়া সকল ইন্দ্রিয়াদির অবভাসক।

শ্রীগীতায় 'জীব' নিরূপণে, দ্বিতীয় অধ্যায় চতুর্বিংশতি শ্লোকের "নিত্য সর্ব্বব্যাপী স্থির অচল" বাক্যদিকে পরমাত্মাই সর্ব্বগত, জীবাহাতে স্থিত এবং তদাশ্রিত, এইরূপ ভাবার্থ গ্রহণ করিলে, উপরোক্ত আলোচনায় সিদ্ধান্ত বিরোধ না ঘটিয়া, প্রতি জীবহৃদয়ে স্বতন্ত্র জীবাত্মার অবস্থান, ইহাই শাস্ত্র সম্মত গণ্য হয়। বেদান্ত দর্শনে প্রতিপাদিত এই যে, যিনি প্রাণের মধ্যে বিজ্ঞানময়, সেই প্রসিদ্ধ আত্মা অন্তর্জ্যোতি পুরুষরূপে জীবহৃদয়ে প্রকাশিত থাকেন এবং জীব বা দেহধারী আত্মার

ন্যায় সূক্ষ্ম পদার্থ আর কিছুই নাই। এই প্রসঙ্গে শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্যের উক্তিতে,- আত্মা দুর্জ্ঞেয় বলিয়াই সূক্ষ্ম বাচক। সুতরাং ইহাই অবধারণ হয়-সদা জনগণের হৃদয় দেশে অবস্থিত জীবাত্মাও স্বরূপতঃ পরমাত্মার অংশ, তৎকর্তৃক আশ্রিত এবং তাহা হইতেই প্রকাশিত হইয়া তাহাতে সংস্পৃষ্ট থাকিলেও, অংশ বিচারে, অর্থাৎ চিৎকণ। ভগবদংশ বলিয়া জীবের বিভুত্ব ও সর্ব্বব্যাপিত্ব স্বীকার্য্য নয়-যেমন স্থানস্থিত আলোক ও তৎ নিঃসৃত রশ্মি,- অথবা সূর্য্য ও তাহার কিরণমালা, কিংবা মেঘ ও বৃষ্টিধারা,- এক বা অভেদ গণ্য হইতে পারে না। অপিচ, জীব, ও পরমাত্মার ব্যাপ-ব্যাপকত্ব, শাস্য শাসকত্ব, নিয়ম্য-নিয়ন্তৃত্ব ভাব বিদ্যমান।

ঈশ্বর বা পরমাত্মাই স্থান কালব্যাপী,-তিনি উদ্যত বজ্রের ন্যায় শাসক (কঠ ২।৩।২,-) জীব তৎকর্তৃক শাসিত বা নিয়মিত,-তাঁহারই অন্তর্যামশক্তির নিয়মানুযায়ী (শ্বে-শ্ব ১।৩।) জীবজগৎ ক্রিয়াশীল ও কর্মসূত্রে আবদ্ধ। তাই তিনি সদাপ্রকাশ স্বরূপ অদ্বিতীয় পরমঈশ্বর। পক্ষান্তরে প্রতি ব্যক্তিতেই ব্যক্তিগত আত্মবোধ পরিস্ফুট,-অর্থাৎ জ্ঞানস্পৃহা, বিষয়কল্পনা ও বিচারবিবেচনার ক্ষেত্রে পরস্পর অসাদৃশ পরিলক্ষিত। জীবদেহে এই আমিবোধ সম্পন্ন জীবাত্মার, সুখদুঃভোগের অনুভূতি এবং মুক্তিলাভের অভীপ্সাও পৃথক,- অনুভব, বেদনা, আনন্দ ভিন্নরকম,-কেহ সংসারাসক্ত, অজ্ঞ,-কেহবা সংসারবন্ধন হইতে মুক্তিলাভে ব্যাকুল, বিজ্ঞ। অতএব ইহাই স্থির হয়,-ব্যক্তিগত বিবেক বা ধর্মজ্ঞান ও মনের ধর্ম বা ভক্তিবৃত্তির আমিবোধক কেন্দ্র পুরুষ, প্রতিব্যক্তিতে স্বতন্ত্র বা অপরের সহিত অসম্বদ্ধ। যদিও পুরুষ বা জীবাত্মা স্বভাবতঃ শুদ্ধস্বভাব ও গুণাতীত অবস্থায় প্রতি জীবহৃদয়ে পৃথক সত্তায় অবস্থিত। তথাপি স্বপ্রকাশ সূর্য্যের স্বচ্ছ বা মলিন দর্পণে প্রতিফলিত প্রতিবিম্বের পার্থক্যের ন্যায়, বিভিন্ন জীবদেহে আমিভাবাত্মক জীবাত্মার স্বভাব বা চরিত্রগত বৈষম্য বিদ্যমান। সুতরাং বিভিন্ন জীবের পৃথক বুদ্ধিতে সংবোধিত পুরুষ বহু।

জগতে অসংখ্য জীব,-প্রত্যেকেই নিজ কর্মানুযায়ী প্রাপ্ত বিভিন্ন দেহে কর্ম চঞ্চল। কাজেই জীব বিভু নয় এবং একও নহে। পরন্ত বিশ্বময় বিবিধ দেহে অনন্ত জীবের লীলাভূমি এই পরিদৃশ্যমান জড় জগতে জীবাত্মা স্থূলদেহ পরিগ্রহণ করিয়াই ভূমণ্ডলে কর্মরত ও আয়মায় এবং পরমাত্মা চিৎ বস্তু বলিয়া, জীব তাঁহারই সূক্ষ্ম অংশ, অণুসদৃশ বিবেচনায় চিৎ-কণ।

ব্রহ্ম, পরমাত্মা বা ভগবান চিৎ—সিন্ধু,-জীব বা জীবাত্মা, যেন তাঁহারই চিৎ-বিন্দু

সদৃশ। সিদ্ধান্ত এই,-চিৎস্বরূপ একই পরমাত্ম নির্লিপ্তভাবে, যুগপৎ সমষ্টির পৃথকভুত অসংখ্য বিচিত্র স্থূলদেহে বিরাজিত এবং চিদাংশ বহু জীবাত্মা সংখ্যাতীত ব্যষ্টি-দেহে পৃথক পৃথকভাবে দেহাভিমানীরূপে অবস্থান করিয়া 'আমি, ভাবাপন্ন এক একটি স্বতন্ত্রতার স্বকীয়তায় দেহেন্দ্রিয়াদির মাধ্যমে জগতে কর্মতৎপর।

আমির স্বরূপ

প্রাণীগণের দেহে অবস্থিত, সদা অবধ্য (গীতা ২ | ৩০) অব্যক্ত, অচিন্ত্য ও অবিকারী (গী ২।২৫) চিৎ-কণ জীবাত্মা,- জীবের সংস্কার চ্ছন্ন প্রকৃতি প্রভাবে ক্রিয়াশীল কর্ম্মেন্দ্রিয়াদির (গীঃ ১৩ | ৩০) উদ্বোধক বা চেতনা সম্পাদক মাত্র। পক্ষান্তরে পরিপূর্ণ চিৎ—বস্তু, ত্রিভুবনে যাঁহার সমান কেহই নাই (গীঃ -১১ | ৪৩ শ্বেঃ শ্বেঃ—উপ ৬ | ৮) সর্ব্বভূতের হৃদয়স্বরূপে নিত্য ধ্যেয় (গীঃ ১০ | ২০) এক হইয়াও অনেকের কামনাবিধা- কর্ত্তা (কঠ ২ | ২ | ১৩) পরমাত্মা, বহুজন্মের সাধনবলে সুদুর্লভ জ্ঞানী (গীঃ ৭ । ১৯) ঈশ্বর উদ্বোধিত মহামানবের অন্তরায় অসাধারণ প্রতিভার প্রেরণা সঞ্চালক। তাই দেখা যায়, যেন বিধিনির্দ্দিষ্ট কোন ব্যক্তি কর্ত্তৃকই পূর্ব্ব প্রস্তুতি ব্যতিরেকে, অতি আকস্মিক ভাবে, অসামান্য আবিষ্কার উদ্ভাবিত হইয়া যায়। শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকীর্ত্তি বা ঐশ্বর্য্যযুক্ত শ্রীসম্পন্ন কর্মাদিও চিৎ—স্বরূপের প্রবৃত্তি শক্তিরূপ (গীঃ ১০ | ৪১) অংশ সম্ভূত। উল্লেখ যোগ্য যে, এই চিৎ বা চৈতন্য বলিতে কেবলমাত্র চেতনা ও জ্ঞান নির্দ্দিশ করে না,- ইহাতে অলৌকিক প্রেমও বুঝিতে হইবে, যাহা জীবের পক্ষে ভগবানে অনুরক্তি বা ভক্তি,- যাহাতে ঈশ্বর প্রেরণতাসম্পন্ন অন্তরে অপ্রাকৃত আনন্দের সঞ্চরণ হয়।

বৃহদারণ্যকের (৪ | ৩ | ৩২) সিদ্ধান্ত এই, ব্রহ্মই পরমআনন্দ এবং ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন প্রাণিগণ, এই আনন্দের অংশমাত্র অবলম্বনে আনন্দিত হইয়া জীবনধারন করে। অতএব ভগবান আনন্দ সিন্ধু, এবং জীব তাঁহারই স্বজাতীয় ভাবে কিংবা অংশ-বিচারে আনন্দ বিন্দু। যেহেতু এই অনাদি সংসার প্রবাহ ভগবৎ শক্তি হইতে (গীতা ১৫ | ৬) নিঃসৃত হইতেছে,- সেই জন্য চেতন জীবমাত্রেরই জ্ঞানযোগে, জ্ঞানময় ভগবৎ পরমানন্দ প্রেমসিন্ধুতে নিমজ্জিত হইবার সতত প্রয়াস,- যাহা ঐশী অভিলাষ (গী-১৮ | ৬২) বটে। এই জ্ঞান ও প্রেম আত্মার সহিত সমবেতভাবে নিত্য সম্বন্ধ যুক্ত বলিয়া, ঈশ্বরের প্রতি অনুরাগ বা অনন্যভক্তি (গীঃ ৮ | ২২, ১১ | -৫৪, ১৩ | ১১, ১৮ | ৫৫) জীবের আত্মনিষ্ঠ (গী—৮ | ৭, ১০ | ১০, ১২ | ৮, ১৮ | -৬৫) নিত্যধর্ম। তাই শ্রীমদ্ভাগবতে (৭ | ১ | ৩১) যুধিষ্ঠিরের প্রতি শ্রী নারদের উপদেশ, যে কোন প্রকারে হউক, শ্রীভগবানে মনোনিবেশ করা জীবমাত্রেরই কর্ত্তব্য

কর্ম। প্রণিধান যোগ্য যে, সর্ব্বফলদাতা শ্রীভগবানকে যিনি যেই অভীষ্টলাভের জন্য ভাবনা করেন তাহাকে তিনি সেইরূপেই (গী-৪ | ১১, ৭ | ২১, ৯ | ২৩) অনুগৃহীত করিয়া থাকেন।

যেখানে চেতনত্ব আছে, সেখানেই জীবত্ব, স্বীকার্য্য। যদিও চেতনা বিশিষ্ট বস্তু-মাত্রই 'জীব' বলিয়া বিবেচিত এবং যে সকল জীবে প্রাণবায়ুর ক্রিয়া বিদ্যমান, তাহা অপেক্ষ কৃত উচ্চ অবস্থার গ·য় হইলেও 'চিত্ত' বিশিষ্ট· জীব তদপেক্ষা উন্নীত। ইহার ি চ র:ভেদে ইন্দ্রিয়াদি সমন্বিত জীব, তার চাইতে উত্তম নিরূপিত হইয়াও,- তন্মধ্যে দ্বিপদ মনুষ্যজাতিই শ্রেষ্ঠরূপে স্বীকৃত রহিয়াছে, যাহাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠতার বিচারে স্থান, পরিবেশ, আচার, ব্যবহার, শিক্ষা, সংস্কৃতি, সংস্কার, ধর্মজ্ঞান ভেদে, বিভিন্ন মানব সমষ্টির বিষয় বিবেচিত হইয়াছে, ভারতীয় ঐতিহ্যে। অর্থাৎ যেখানে চাতু-র্ব্বর্ণ্যের ব্যবস্থা প্রচলিত সেই সমাজের লোক গণ্যমান্য বিবেচিত হইলেও,- বেদজ্ঞ, সংশয়চ্ছেত্তা, অর্থাৎ দার্শনিক জিজ্ঞাসার মীমাংসাকারী ও স্বধর্মে নিষ্ঠাবান, সদ্বিপ্রকে শ্রেষ্ঠতর আখ্যাত করিয়া, পরিশেষে শ্রী ভগবানের প্রতি প্রাণমন সমর্পণ কারী, পরমাত্মায় যুক্ত, প্রেমিক ভক্তকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া উল্লেখ রহিয়াছে,—শ্রী-মদ্ভাগত তৃতীয় স্কন্দ উনত্রিশ অধ্যায়ের বিস্তারিত আলোচনায়। প্রণিধান যোগ্য যে মানুষরূপে জন্মলাভ করিয়াও, জীবনের সর্বোন্নত মহিমায় উত্তীর্ণ হওয়া জীবের স্বীয় প্রচেষ্টা বা সাধনা সাপেক্ষ।

শ্রীমদ্ভগাবতগীতা ষষ্ঠ অধ্যায় ছেচল্লিশ শ্লোকের ভগবৎ বাক্যে উপরোক্ত তত্ত্বসিদ্ধা-ন্তের এইরূপে সমর্থন রহিয়াছে যে, যিনি সর্বতোভাবে ভগবৎ শরণাগত হইন, অর্থাৎ বিশ্বপতির ইচ্ছার সহিত আপনার ক্ষুদ্র ইচ্ছা সমর্পিত রাখিয়া (১২ | ২) তাঁহাতেই সতত—যুক্ত বা তৎপরায়ণ হইতে চেস্টাবান থাকেন, সেই ভগবদ্ভক্ত, ভগবৎ প্রেমিক, শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত ও নানা দেবতাদির তপঃ পরায়ণ যোগীগণের মধ্যে ভগবানে অধিক যুক্ত বিবেচনায়, সর্বাপেক্ষা সমাদৃত বা সর্বোত্তম। ইহারই মর্ম অনুধাবনায়, পঞ্চম অধ্যয়ের ষষ্ঠ শ্লোক তুলনীয় যে, সংসার কর্মে নিরলসভাবে ব্যাপৃত, অথচ দৈনন্দিন কর্মাদির ফলপ্রাপ্তির আকাঙখায় স্ব ভাববশে নির্লিপ্ত বা অনুরাগশূন্য মানসিকতায় অভ্যস্ত হইলে, সেই শাস্ত্রবিহিত অনাসক্ত কর্মানুষ্ঠানদ্বারা 'আমি' সংসারবন্ধন মুক্ত হইতে পারে। পক্ষা-ন্তরে তৃতীয় অধ্যায় ষষ্ঠ শ্লোকে ভগবদোক্তি এইরূপ,- হস্তপদ বাক্যাদি পঞ্চকর্মেন্দ্রিয় সংযত করিয়াও 'মন' যদি ইন্দ্রিয়াদির তৃপ্তিকর বিষয়াদি ভাবনা করে, তবে তাহাকে 'মিথ্যাচারী' বা কপট বলা যায়।

প্রাসঙ্গিক সপ্তম অধ্যায়ের সাতাশশ্লোক অনুধাবনীয়, যে 'আমি' ইচ্ছাদ্বেষকে বশীভূত করিতে পারে না, তাহার পক্ষে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বাহ্যবিষয়েরই যথার্থ জ্ঞানলাভ হয় না,- পরমাত্মারূপ অতীন্দ্রিয় বস্তুর জ্ঞানপ্রাপ্তিতো দূরের কথা। তাই তৃতীয় অধ্যায় সাইত্রিশ শ্লোকের উপদেশ,- পুরুষকার প্রয়োগে রাগ ও বিরাগ সংযত করিলে 'আমি'র মধ্যে অভ্রান্ত শাস্ত্রীয় দৃষ্টির বা ঐশ্রী অভিপ্রায়ের অণুপ্রবেশ ঘটি া, জীবাত্মা প্রকৃতির অর্থাৎ স্বয়ং নিত্য হইয়াও পরিবর্তনশীল জাগতিক ব্যাপারে বা সংস্কারাচ্ছন্ন স্বভাবের বশীভূত হয় না। এই সম্পর্কে ত্রয়োদশ অধ্যায়ের ত্রিশ শ্লোকে উপমেয়,- কায়মন বাক্যদ্বারাকৃত যাবতীয় কর্ম প্রচেষ্টাই ব্যক্তিগত প্রকৃতি চালিত এবং জীবাত্মা সংস্কারের উদ্দীপক মাত্র। তাই নানাকর্মে ব্যাপৃত থাকিয়াও, আপনাতে কর্মরহিতজ্ঞান আয়ত্ত করাই 'আমি'র যোগযুক্ত অবস্থাপ্রাপ্তি।

ধর্মসাধনা ক্রিয়ামূলক। অর্থাৎ কর্মের মাধ্যমেই ধর্মলাভ করিতে হয়। ক্লান্তিহীন প্রযত্নেও যখন প্রার্থিত ফললাভ হয় না, তখন আশানুরূপ ফলপ্রাপ্তিতে উদাসীন মনে, বিবেকবুদ্ধি প্রেরিত কর্মফল ত্যাগ বাসনা উৎপন্ন হয়,- ইহাই দ্বিতীয় অধ্যায় সাতচল্লিশ শ্লোকের মর্মবাণী এবং অষ্টাদশ অধ্যায় সপ্তম শ্লোকের অনুশাসন। তাই সাধনাদ্বারা,- অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞান প্রাপ্ত বা ভগবৎ সান্নিধ্যলাভে পূর্ণ মনস্কাম মহামানবগণ, যেই প্রকার আত্মানুশীলনে (গী-৩।২১) কাম্যবস্তু লাভ করিয়াছেন, তাহারই অনুবর্ত্তী হইয়া আপনাকে সেই দিব্যভূমিতে উত্তীর্ণ করিবার প্রয়াস সংসার জীবনে কর্ত্তব্যকর্ম।

উপরোক্ত তত্ত্বের বিশদ বিশ্লেষণ রহিয়াছে, শ্রীগীতার দ্বিতীয় অধ্যায় পঞ্চান্নশ্লোক হইতে,- শ্রীভগবানের উক্তিতে,- যাহা 'ভারতের সাধনা' নামে খ্যাত। ইহার এই রূপ মর্মার্থ অনুধাবন করা যাইতে পারে যে,- সাধনা বা শাস্ত্রনির্দিষ্ট পথে উপাসনা বা ভগবৎ অভিনিবেশ দ্বারা অন্তরস্থিত (গী-১৮।৬১) ঐশ্বরিক শক্তি উপলব্ধি করিয়া, তাঁহার সহিত আত্মিক অনুভবে একাত্ম হইলে,- অর্থাৎ ঈশ্বরে পরম অনুরাগ লাভ করিলে, পরমশক্তি হইতে বিচ্ছুরিত জ্যোতির প্রভাব, অন্তরদেশ উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর হইয়া, আত্মায় আহিত মলিন সংস্কার সমূহে অপসারিত করে, অধিকন্তু জন্মান্তর সঞ্চিত শুভ সংস্কার উদ্বুদ্ধ হইয়া সিদ্ধিলাভের সহায়ক হয়। পরিশেষে অষ্টাদশ অধ্যায়ের ছেচল্লিশ শ্লোকে অপূর্ব্ব আশ্বাসন,- যাহা হইতে প্রাণিগণের উৎপত্তি বা কর্মপ্রচেষ্টা, সেই সর্বান্তর্যামী পরমপুরুষকে, স্বকর্ম নিষ্ঠায় অর্চনাদ্বারা,- অর্থাৎ ইহজন্মে যেই কর্মে তিনি নিযুক্ত রাখিয়াছেন, তাহার সার্থক অনুষ্ঠান করি া

জীব অন্তঃকরণশুদ্ধি, তথা অভীষ্ট সিদ্ধিলাভ করিতে পারে।

তাৎপর্য্য এই,- যদি দৈনন্দিন কর্মসমূহে আমিত্বরূপ অহমিকার আস্ফালন, কুহেলিকা বোধে অপসারিত করিয়া,- বিষুদ্ধ বাসনা ও অস্বচ্ছ রসনাকে বন্দী রাখিয়া,- চতুর্দ্দিকের কুটিল আবর্ত্ত, অনবরত অসরল পন্থা, নানাবিধ মালিন্য আর আবিল্য, অনুক্ষণের অবসাদ নৈরাশ্য ও সতত কর্মভারে নিষ্পেষণের মধ্যেও,- পারমার্থিক প্রীতিরূপ ভক্তিদ্বারা, অর্থাৎ ভগবৎ নামসাধনে নিশ্চলাস্থিতির নিষ্ঠায়,- দুঃখভয়, শোক মোহের আকর দেহের আমিকে,- সর্ব্বাবস্থায়, সর্ব্বচিত্তাকর্ষক, সর্ব্বদেহীর সুহৃৎ শ্রীভগবানের প্রতি, মনের অনর্গল মগ্নতারূপ দৃঢ় অবলম্বনে, জাগ্রত বিশ্বাসের সুদীপ্ত নিশান,- অর্থাৎ ঈশ্বর অনুরাগের অঙ্গীকার, সদা উত্থিত রাখিয়া, সর্ব্বান্তঃকরণে, তাঁহার সহিত সর্ব্বক্ষণ মানসিক ভাবে যুক্ত রহিয়া, সংসার কর্ত্তব্য পালন করা হয়, তবে বিষয়কর্মে প্রবিষ্ট থাকিয়াও, পরিচ্ছন্ন পুণ্যরুচির সংযত বাক্য ও সংশয়-খিন্ন পরিষ্কৃত বুদ্ধিদ্বারাকৃত ফলাভিসন্ধানরহিত কর্ম, বন্ধনের হেতু না হইয়া করুণা নিধানের অদৃশ্য করস্পর্শে, সমগ্র জীবন নৈবেদ্যের পূর্ণ ঘটরূপে পরিণত হয়,- যাহা 'আমি'র স্বরূপে অবস্থিতি।

উপরোক্ত আলোচনার সারার্থ এই,- দিব্যশক্তির ইচ্ছার নির্ভরে কৃত কর্মদ্বারা আত্মনিবেদিত ও আসক্তি তিরোহিত মানসিকতার স্থিতি শক্তিতে, কনকপদ্মরূপে রূপান্তরিত জীবসত্তায় ভাগবতী অনুরাগের অস্ফুট কোমল কলিকা, শতদলে বিকশিত হইয়া, সংবেদনের স্বপ্নে দেহমনে ঈশ্বর রোমাঞ্চের মহতী প্রতিশ্রুতিরূপ বৃহতী সম্ভাবনার যেন ভক্তিস্নাত পুষ্প প্রস্ফুটিত করিতে থাকে,- অর্থাৎ অন্তর গহনে, সংসারমোহে আচ্ছাদিত অন্তঃসলিলা ভক্তির উৎস, অর্গলমুক্ত হইয়া আপন অন্তরের দিকেই 'আমি'র করুণনেত্রে দৃষ্টিপাত ঘটে,- সর্ব্বাধিকারী হইয়াও তখন চিত্তে বেদনা জাগে সর্ব্বহারার মত,- হৃদয়মন নিখিল বিশ্বের সর্ব্বজীব প্রতি, সর্ব্বসংস্কার মুক্ত অহৈতুক প্রেমে প্রসারিত হইতে থাকে,- হৃদয় নন্দন বনের নিভৃত নিকেতনে,- সকল আয়ত্তের অতীত, যাবতীয় বন্ধন বেদনার বহির্ভূত, সমস্ত প্রবৃত্তিরূপে থাকিয়াও নিবৃত্তিরূপে নিত্য বিরাজিত, ভববন্ধন মোচনকারী চির অন্তর্য্যামী,- আনন্দময়ের আগমন আসন্ন হয়। ইহাই শ্রীগীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ে প্রথমেই উপস্থাপিত কর্মসন্ন্যাসযোগ,- প্রাপ্ত অবস্থা,- অর্থৎ কর্ম করিয়াও কর্মে অহংভাব বা আসক্তি পরিহার বরণ।

সন্ন্যাস অর্থে ব্যক্তিত্বের বা 'আমি' বোধের বিনাশ, অথবা আত্মচেতনার বা আত্মবুদ্ধির বিলুপ্তি নয় এবং আত্মবিচ্ছেদ বা সংসারজীবনের সঙ্কোচনও নহে। পরন্তু

অবিদ্যাকৃত সর্ব্ব সংশয়মুক্ত প্রাণে, আত্মসমর্পণের তর্পণে আপনাকে সম্যকরূপে বিহিত কর্মে নিযুক্ত রাখিয়া,- অর্থাৎ 'আমি কর্ত্তা নহি' এইরূপ ভাবনার বশবর্ত্তী হইয়া,- অপরূপ ভগবৎ নির্ভরতার লোলুপ কাতরতায়, প্রেমভক্তি রসে রসায়িত অমৃতধাম যাত্রী, দীনতার নির্ঝরিণী, ক্ষণমুগ্ধ আমি'র চির জীবনের প্রার্থিত, দয়া-সারসিন্ধু, ইষ্টদেবতার সহিত মরণোত্তর চিন্ময় উদার তীর্থে, অম্লান নির্মল হৃদয়ে, চির মিলন ক্ষণের প্রস্তুতিপর্ব।

প্রাসঙ্গিক উল্লেখযোগ্য যে, দেহেন্দ্রিয়াদিতে অবিবেক জনিত আমিত্ববোধ বা অস্মিতা জীবের সংস্কারগত,- যাহা মায়া বা অবিদ্যা অথবা বিপরীত ভাবনা। সাংখ্য দর্শনে বর্ণিত ইহার চারিপ্রকার প্রকৃতিগত ধর্ম মধ্যে, অহংবোধ যখন হৃদয়ে সমাহিত বা 'হৃদ্গত' সেই অবস্থা বিষয়মূলক হইলেও সুখকর, শান্তিপ্রদ। প্রাণমনশরীর হইতে পৃথকবোধে অস্মিতা 'মস্তিস্কগত' হইলে, তাহা সাত্ত্বিক দীপ্তির প্রজ্ঞানে পূর্ণ হইয়া, দেহের প্রতি আমিত্বের ভান মাত্র হয়। অহংজ্ঞান মস্তিষ্ক ক্রিয়ার ঊর্দ্ধে বিস্তীর্ণ হইলে, বিশ্বাত্মার পরিজ্ঞানে, ধ্যানদক্ষ ব্যক্তির নিকট অস্মিতার পরিচয় 'বিশ্বগত' বা পরমাত্মায় কেন্দ্রীভূত। বিষয় নিরপেক্ষ অহংবৃত্তি যখন স্বরূপে নিত্য স্ফূর্ত্ত বা আত্মধ্যানে নিমগ্ন, তাহা 'শুদ্ধ অস্মিতা' যাহা শান্ত, দেহে অবস্থিতি ভাব নিদূরিত এবং এই অবস্থা প্রাপ্তিতেই দিব্যসংস্কারের অভ্যুত্থানে অন্তরে দিব্যভাব বা বৈরাগ্য উদয় হয়। তাই বিশুদ্ধ অস্মিতাকে "শুদ্ধাত্মা" বলা হইয়াছে, যাহাতে আরূঢ় হওয়া বা যাহার মগ্নধ্যান, সাধকের পক্ষে পরাবিদ্যা লাভের পথে অগ্রসর হইবার সহজ, অথচ নিশ্চিত পন্থা।

সুতরাং ইহাই নিরূপিত হয়, অন্তরের আন্তরিক প্রসারণ বা অস্মিতার সূক্ষ্মা-দপি সূক্ষ্মভূমিকায় বিচরণ করিয়া, অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা ও প্রীতিপূর্বক, ঈশ্বর অনুকম্পা লাভের প্রচেষ্টাই সম্যক সন্ন্যাস,- যাহা বুদ্ধি,যুক্তি ও শক্তিকে সংহত করিয়া, মর্মচেতনার উন্মেষ ও ঈশ্বরভাবনার ছন্দায়িত চিত্তে, আত্মিক অগ্রগতির সহায়ক। অতএব প্রসারিত অন্তরে প্রকাশিত 'আমি'র অমিততেজ, অমৃতময় মহিমায় কৃতকর্মও মুক্তি প্রদ। কারণ যাহার অহং বা অস্মিতা বিবেক সম্পন্ন, অন্তর সাত্ত্বিক, দীপ্তিতে উজ্জ্বল, তাহার কর্মপ্রচেষ্টায় কোনরূপ ন্যূনতাবশতঃ সঙ্কল্পসিদ্ধি না হইলে কিংবা দিব্যবোধের জাগরণে ভগবৎ সান্নিধ্যলাভের সাধনায়, শক্তি ও বিভূতিলাভের পূর্বেই পার্থিব দেহের অবসান ঘটিলেও অর্জ্জিত সংস্কার অদৃষ্টরূপে অন্তরে সঞ্চিত থাকিয়া যায় এবং জন্মান্তরে সময় ও কাল অনুযায়ী অদৃশ্য মেঘের বারিবর্ষণের ন্যায় যথাকালে

ফল প্রদান করে।

শ্রী গীতায় ভগবৎ বাক্যে বিশেষ উল্লেখ যে কল্যাণ কারীর কখনও দুর্গতি বা অধোগতি হয় না বলিয়া, যোগভ্রষ্ট ব্যক্তির পরবর্ত্তী জন্মে, বিশিষ্ট দেশের শ্রেষ্ঠ জাতির উচ্চকুল ধর্মশীল পরিবারে,-আয়ু, বিদ্যা, সম্পদ, মেধা, নীরোগ দেহে জন্মলাভ হয়। অর্থাৎ ষষ্ঠঅধ্যায়ের বেয়াল্লিশ শ্লোকে বর্ণিত সদাচার সম্পন্ন ধনবান গৃহে অথবা জ্ঞানী অথচ সাধনভজন পরায়ণ ধার্মিক পরিবারে, দুর্লভ জীবজন্ম লাভ করিয়া, জন্মান্তরিণ সংস্কারবশে ভগবৎ অনুধ্যানে চিত্তার্পণ দ্বারা, সহজেই ঈশ্বরীয জ্ঞান, শক্তি ও আত্মিক অভ্যুদয়রূপ অভীষ্ট সিদ্ধিলাভ করে। তৎপর্য্য এই বিগত জন্মের 'আমিবোধ' পরবর্ত্তী জন্মের ইন্দ্রিয়যুক্ত হইয়া বিষয়াদির আনন্দ গ্রহণ করিলেও চিত্ত স্বচ্ছতাবশতঃ সঙ্কল্প অপ্রতিহত থাকায় বিবেকবৈরাগ্য, স্মৃতিজ্ঞান, উজ্জ্বল ও অবধিত থাকে। ফলতঃ স্বভাবসিদ্ধ ঈশ্বর আশ্রয় অভিমুখীন প্রকৃতি, ধ্যানার্পিত চিত্তে ভগবৎ অনুগ্রহ লাভেরই প্রত্যাশী হইয়া, ক্রমে মহিমা, কল্যাণ ও অপ্রাকৃত ঐশ্বর্য্যের দুর্লভ অধিকারী হয়।

যোগদর্শনে বলা হইয়াছে,- ভোগ্যবিষয় ভাবনার বশবর্ত্তী হইয়া, কেবল ঐহিক ব্যাপার অনুধ্যান করিয়াই, যাহার দেহত্যাগ হয়, সংসার মায়াবন্ধনে সতত আবদ্ধ সেই 'আমি' সংমপৃক্ত জীবাত্মার, সেইরূপ কাম্য বিষয়ের মধ্যেই (মুণ্ডক ৩ | ২ | ২) পুনরায় ভোগোপযোগী দেহলাভ হয়। পক্ষান্তরে যেই অস্মিতা বা আমিভাবাপন্ন সত্তা, বুদ্ধির চরম উৎকর্ষে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া 'আন্তর সন্ন্যাস' উপলব্ধি করে, জীবিতাবস্থাতেই বাসনাকামনা বিলীন, সেই ব্যক্তির কর্মাশয় পরবর্ত্তী জন্মের, জাতি, আয়ু, ও ভোগবিধানে অপারক হইয়া থাকে।

মর্মার্থ এই, যেই প্রারব্ধ ভোগজন্য আমির বর্ত্তমান দেহ, সেই 'প্রবৃত্ত' কর্মফল ইহলোকে ভোগেরদ্বারা ক্ষয় করিতে হইলেও, যাহা ফল প্রদানে উন্মুখ হয় নাই, সেই 'অপ্রবৃত্ত' সঞ্চিতকর্ম 'আমি'র প্রযত্ন বাপুরুষকারদ্বারা বিনষ্ট হওয়ায়, জরাব্যাধিমৃত্যু কবলিত নশ্বর জগতে জন্মান্তর বোধ হয়। অতএব প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির মূলে কর্মভাবনাজনিত বাসনাসক্ত মলিন কর্মবীজ দগ্ধ করিয়া, প্রজ্ঞা সংস্কারদ্বারা চিত্ত ঈশ্বরে প্রণিহিত রাখিয়া, অন্তরে দিব্যসংস্কারের উদ্বোধনে, জীবাত্মার রমণীয় বিকাশ তথা মানবসত্তার অতিমানবত্ব প্রাপ্তিই, জীব জীবনের প্রধান লক্ষ্য, যাহাতে 'আমি'র অনলস প্রচেষ্টা সুস্পষ্ট।

আমি—কেন

উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে ইহাই সূচিত হয়, অনুপরিমিত, জন্মাদি রহিত, জ্ঞানাশ্রয়, স্বতন্ত্র ইচ্ছাশক্তি বিশিষ্ট, নিত্য চৈতন্য স্বরূপ, মায়াবশে দেহাভিমানী জীবাত্মা, জীবদেহের হৃদ্দেশে অবস্থান পূর্ব্বক, নিরন্তর সংস্কারাচ্ছন্ন ইন্দ্রিয়াদিকে ক্রিয়াশীল রাখিয়া, চিত্তবৃত্তিকে কেবল কর্মফল ভোগের নিয়তি নির্দিষ্ট পথে পরিচালনা করিয়া চলে তাহাই মাত্র নহে 'পরন্তু তাহাতে বিদ্যুত অহংবোধক 'আমি' বা অস্‌মিতা স্বধর্মনিষ্ঠায় অপ্রতিরোধনীয় প্রচণ্ড শক্তি প্রভাবে, দিব্যভাবে রূপান্তরিত আপনাকে, আত্মাভিমুখীন রাখিয়া, আত্মপুরুষ, পরমাত্মাকে, নিত্য সরস ও নিরভিমান অন্তরে আত্মনিবেদন দ্বারা মন্দানিল স্পর্শে সুগন্ধানন্দ শ্বেতচন্দনের সৌগন্ধ বিস্তার ন্যায়, মনেপ্রাণে আনন্দস্বরূপত্বের অনুভবজনিত, ভক্তিপ্রীতিতে উচ্ছ্বসিত, উল্লাস ঐশ্বর্য্যের ভাবরসময় অনাহত প্রশান্তির এমন নিরবচ্ছিন্নতার প্রাপ্তিলাভ করায়, যারপর আর প্রত্যাশার নিপীড়ন নাই, ইহাই জীবের স্বীয় স্বরূপে প্রতিষ্ঠা অথবা 'আমি'র সর্বোত্তম মহিমায় উত্তরণ, যাহা আমিসত্তাদ্বারা আহরিত। তাই জীবাত্মায় আমিত্ব আরোপের প্রয়োজনীয়তা।

অপর কথা

যিনি অসীম অনন্ত হইয়াও, সৃষ্টজীব ও দ্রব্যাদির সীমা নির্দ্দেশ করিয়া রাখিয়াছেন এবং স্বয়ং কামনারহিত রহিয়াও ভক্তবাঞ্ছা পরিপূরণ করিতেছেন এবং সর্ব্বজীবে চিরবিরাজমান থাকিলেও, কেহই যাঁহাকে প্রত্যক্ষ দর্শনে সক্ষম নয় এবং নিজে স্বয়ম্ভু হইলেও, যাঁহা হইতে বিশ্বচরাচর উদ্ভূত এবং যাঁহার স্বয়ংকৃত অলঙ্ঘ্য নিয়মবন্ধন কেহই লঙ্ঘন করিতে পারে না এবং যেই মহাশক্তির বশবর্ত্তী থাকিয়াই সূর্য্যচন্দ্র, গ্রহউপগ্রহ আপনাপন গতিপথে নিয়ত আবর্ত্তিত হইতেছে,-

বাক্য ও মনের অগোচর, বিশ্বনিয়ন্ত্রণের মহাকর্ত্তা, সর্ব্বভূতের আয়তন, সকলবৃত্তির আশ্রয়, জীবের দেহদ্বারা মত্ততায় স্বপ্নে কৃত কর্মের সাক্ষী, ত্রিগুণের সঞ্চালক অথচ পরমধন প্রদাতা, অনন্তাত্মা মোহোদধি, সকল সুন্দর সন্নিবেশ, সবকিছু প্রকাশিত করিয়াও, নিজে অপ্রকাশিত অবিনশ্বর তত্ত্ব, অর্থাৎ যাহা চিরকালই একরূপ এবং মানবমন বা অস্মৎ প্রত্যয় আমিবুদ্ধি, জন্মজন্মান্তরের পথ বাহিয়া পরমানুসন্ধেয় যাঁহার অনুসন্ধান তৎপর এবং যাঁহাকে জানিলে, জীব জন্মমরণ ভীতি এড়াইয়া, অনির্বচনীয় রূপে উদার ও অবর্ণনীয় মহিমাময় দিব্যগতিলাভের আশায় তাঁহাকে আনন্দের সহিত আত্মনিবেদন করে,-

সেই সর্ব্বান্তর্য্যামী, তেজময়, অমৃতময় সত্যস্বরূপ, নিরতিশয় ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন পরমাত্মা

পরম ঈশ্বরের সহিত,- ক্রমবর্দ্ধমান ভগবৎধ্যানের কি উপায় অবলম্বনের কোন্ দুরবগাহ, তথাপি অনায়াসসাধ্য,- কিরূপ সাধন সহায়ে অবিদ্যা উপরঞ্জিত জীবাত্মার অনবচ্ছিন্ন সংস্পর্শের আত্মিক দিব্যসংযোগ স্থাপনদ্বারা, সাত্ত্বিকী বুদ্ধিরূপ কল্যাণ-অভিব্যঞ্জনার চিত্তপ্রসাদ প্রাপ্তিতে, নরজীবনকে উর্দ্ধতর শক্তির দীপ্ত ও দৃপ্ত আধারের পরিণত করা যায়,- ভারতের সভ্যতা ও সংস্কৃতির মৌলিক ভাবধারার বাহক, তথা সংসার তাপদগ্ধ মনুষ্য সমাজকে, প্রকৃত শান্তি ও শাশ্বত মুক্তিপথ প্রদর্শনের দিশারী তথা জাতির আধ্যাত্মিক জাগরণের ইতিহাস রচনাকারী,- হিন্দু মনীষার বিপুল জ্ঞানভাণ্ডার হইতে আহরিত, তাহারই কিছু তথ্য সন্দেশ বা চিরন্তন মহিমার মর্মবাণী,-

অর্থাৎ বস্তুপ্রকাশের আবরক অন্ধকার, যেমন সূর্য্যোদয়ে অপসৃত হয়,- তেমনি পূর্ব্ববর্তী জন্মের দৈহিক চিন্তাদ্বারা, বিস্মৃত চৈতন্যসত্তা উদ্বোধনের অন্তরায়,- অন্তঃকরণস্থিত মনের পরিণাম ধর্মী অস্মিতার মলিন ভাব ও ক্ষুদ্র আশয়, স্বকীয় প্রযত্নে সেই সদাচার অনুষ্ঠানের মহিম দীপ্ত জ্ঞানোজ্জ্বল আলোকে অপসারিত করিয়া,- উদার ও প্রশান্ত আত্ম উপলব্ধির দিব্যজ্ঞান ও দিব্যৈশ্বর্য্য লাভে, ইহজীবনেই মানবত্ব অতিক্রমণ পূর্ব্বক দেবত্বে পরিণত হওয়া যায়,- মহৎজনের প্রবর্ত্তিত ও আচরিত, সেই সাধন সঙ্কেতের যৎকিঞ্চিৎ অনন্তর পরবর্ত্তী নিবন্ধে বক্ষ্যমাণ।

"একলাই আসে জীব এ জগতে, একেলা চলিয়া যায়,-
একাকী নিজের কর্ম ফলেতে, সুখ দুখ সব পায়।
যাহার যেরূপ কর্ম জীবনে, সে-ই সে কর্মফলে,-
সেই সে রূপেতে জন্ম যে লয়, বিধির বিধান বলে।", (মনুসংহিতা)

"one should lift one self by one's own efforts and should not degrade oneself; for one,s ownself is one,s friend and one,s ownself is one s enemy." gita 6/5

"যে শিক্ষা বাহিরের উপকরণ, তাহা-বোঝাই করিয়া আমরা বাঁচিব না, যে শিক্ষা অন্তরের অমৃত তাহার সাহায্যেই আমরা মৃত্যুর হাত এড়াইব।"

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (শিক্ষা)

——০০——

আমার ধর্ম কি

"ধর্ম নহে সম্পদের হেতু, নহে সে সুখের ক্ষুদ্র সেতু, ধর্মই ধর্মের শেষ।

পূর্ববর্তী অংশে জীবাত্মার স্বরূপ নির্ণয় প্রসঙ্গে আলোচিত হইয়াছে, জ্ঞানক্রিয়া, কর্মশক্তি, সুখদুঃখাদি অনুভব ভেদে, যত জীব তত জীবাত্মা এবং দেহস্থিত মানবাত্মা, চিৎ,- দেহটি জড়বস্তু এবং এই জড়দেহকে ধরিয়া রাখিয়াছে ইন্দ্রিয়াদি, যাহার ধারয়িতা প্রেরণাদাতা আত্মার আশ্রয় বা ধারয়িষ্ণু পরমাত্মা এবং সংস্কার আবদ্ধ জীবের মায়িক ইহজগতে জন্মলাভ ঘটে, পূর্বজন্মার্জিত কর্মফল ভোগের নিমিত্ত কারণে, নিয়তি নির্দিষ্ট ভোগদেহ প্রাপ্তির মাধ্যমে এবং ভোগাবসানে পার্থিব দেহ, জীর্ণবস্ত্র বা ভগ্নগৃহের ন্যায়, দেহী বা জীবাত্মা কর্তৃক পরিত্যক্ত হইলেও, তাহাতে নিত্য বিদ্যুত আমিবোধক ব্যক্তিত্বের বিলুপ্তি হয় না এবং এই অহং এর ধর্মসাধনার বিবেকবান স্থির বুদ্ধি সহায়ে, জীবাত্মায় আহিত মলিন অহঙ্কাররূপ বহির্মুখীন বুদ্ধিকে সংহৃত বা চিরতরে অস্তমিত করিয়া, পুরুষ বা আত্মাকে প্রকৃতি প্রভাবমুক্ত হইয়া, ক্রমমুক্তি লাভের পথে, পূর্ণজ্ঞান স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইতে হয়, যাহা সংসার বন্ধন ও জাগতিক দুঃখের কারণ 'আমি, র স্বরূপ ভ্রান্তির অপসারণ এবং এই তত্ত্ব প্রমাণ বা অপ্রমাণ করা, বিজ্ঞানের কাজ নয়, যেমন মানবমনের প্রেমপ্রীতি অনুরাগ প্রণয় শ্রদ্ধাভালবাসা, আনন্দবেদনা, ভক্তি সৌন্দর্যবোধ প্রভৃতি অনুভবজগতের ভাব বৈভব, বৈজ্ঞানিক প্রমাণ হয় না। কারণ বিজ্ঞান বস্তুনিষ্ঠ বাস্তববাদী, অনুসন্ধিৎসু, কিন্তু দিব্যদর্শী নয় বলিয়া, মানব অন্তরের অপূর্ণতা বা জীবহৃদয়ের অস্থিরতা ঘুচাইবার পথনির্দ্দেশ করিতে পারে না। হিন্দুশাস্ত্রের ইহাই মর্মকথা যে,—এমন এক বিশ্বশক্তি বা বিশ্বচৈতন্য অথবা বিশ্বমন নিত্যকাল অবস্থিত, যাহা সমস্ত সৃষ্টির মর্মবস্তু এবং তাহাকে ধরিয়া বা আশ্রয় করিয়া থাকিলে সেই বস্তু ও আশ্রিতকে ধরিয়া রাখে এবং ইহাই ধর্মাচরণ বা সাধনার মূল রহস্য।

যেই আধ্যাত্মিক প্রক্রিয়ার অনুসরণ, সততা, ন্যায়পরায়ণতা ও বিবেকবোধের জাগরণ ঘটাইয়া, মনকে উর্দ্ধভূমিতে ধরিয়া রাখে, তাহা ধৃ-ধাতুর ব্যুৎপত্তিগত ধারণকরা, অর্থবোধ নিষ্পন্ন করিয়া ধর্ম, শব্দ নিরূপিত। সুতরাং ভগবৎ বিমুখ মনকে ধর্মশাস্ত্রের অনুশাসনে, আত্মচেতনার আত্মচিন্তনে আত্মবিকশিত করিয়া, জীবনের সর্বোত্তম মহিমায় বিধৃত রাখাই, ধর্মের প্রকৃতমর্ম। পক্ষান্তরে যাঁহার চিত্ত নিত্যই ভাবসাধনায় নিমগ্ন, তাঁহার আচার আচরণের আর প্রয়োজন থাকেনা, যেমন যেই পথিক গন্তব্যস্থলে উপনীত, তাহার আর পথনির্দ্দেশ অবলম্বন করিয়া পথ চলিতে হয় না।

উল্লেখ্য যোগ্য যে, ব্রহ্মের অংশ বিশেষ হইলেও, জীব কখনও ব্রহ্ম হইতে পারে না, যদিও ফলকে আবরিত করিয়া থাকাই খোসার ধর্ম, যাহাতেই ইহার স্বীকৃতি অর্থাৎ তুষ যতক্ষণ চাউল আবৃত অবস্থায় বা কেশ মস্তকে শোভিত, ততক্ষণই যেমন ইহার মর্য্যাদা এবং বিচ্ছিন্ন তুষ বা কর্ত্তিত কেশ অকিঞ্চিৎকর বস্তুতে পরিণত, সেইরূপ ক্ষুদ্র চিৎ—বস্তু জীব, বৃহৎ চিৎ—বস্তু ব্রহ্ম হইতে মানসিকভাবে বিচ্যুত হইয়া পড়িলে সেই জীবন আশাহীন, আশ্বাসহীন, আশ্রয়হীন, স্বধর্ম স্খলিত' অন্ধকারময়। পরন্তু নৌকা আরোহণ করিয়াই, যেমন তরঙ্গ সঙ্কুল নদীপথ অতিক্রম করিতে হয়,- তেমনি দেহতরণী আশ্রয় করিয়াই, দুঃখ ও ঝঞ্ঝাট আকীর্ণ সংসারপথে চলিতে হয়। কিন্তু নৌকায় জল প্রবেশ করিলেই, যেমন ভরাডুবি ঘটে, তেমনি দেহে পাপ প্রবেশ করিলেই অধঃপতন হয়। এই শাশ্বত তত্ত্বের পরিপ্রেক্ষিতে, জীবাত্মা বা আমার বস্তুগত ধর্ম, অর্থাৎ জীবের স্বভাব কি, অতঃপর আলোচনার প্রয়াস।

দূরে ধূম উত্থিত দেখিয়া, যেমন সেইস্থানে অগ্নির অস্তিত্ব অনুমান করা যায়,- চুম্বক সন্নিধ্যে লৌহের গতিশীলতা, চুম্বকের আকর্ষণীয় শক্তির অবধারক, সৃষ্টিকার্য্য অনুচিন্তনে, স্রষ্টার স্বীকৃতি, প্রাণীদেহের হৃদস্পন্দনে, প্রাণলক্ষণ অনুমিতি,- চিত্তের স্বতঃসিদ্ধ ঐশ্বরিক ভাবনা হইতে, জগদাতীত সত্ত্বার প্রত্যয়,- দেহেন্দ্রিয়াদি লক্ষ্য করিয়া, আমার দেহ অনুভব,- আমাতে সঙ্কুচিত অহংবোধে 'আমি'র প্রতীতি,- ইহ জীবনের মৃত্যুভয় বিচারে, পূর্ব্বজন্মের মরণভীতি সংস্কারের সিদ্ধান্ত,- অবোধ শিশুর আকস্মিক হাসি-কান্না সহজাত প্রবৃত্তির পরিচায়ক,- সেইরূপ বস্তুবিশেষের স্বভাব অথবা 'তত্ত্ব' অনুধাবন করিয়া, তাহার স্বরূপ ও স্বধর্ম নির্দ্ধারণ করা যায়।

সাংখ্যদর্শনে 'তত্ত্ব' নিরূপণে, বস্তুর দুই প্রকার অবস্থা নির্দ্দেশ করে। প্রথমতঃ একইরূপে অবস্থিত,- অর্থাৎ যেই বস্তুর উৎপত্তি ও বিনাশ নাই এবং জীবদেহের ক্রম পরিবর্ত্তন বা মানব চিত্তের অনবরত অবস্থান্তরের সহিত সম্পর্ক রহিত,- তাহা নিত্য-তত্ত্ব বা 'পুরুষ' অথবা জীবাত্মা। এই একরূপতাই অপরিণামী তত্ত্বরূপ পুরুষের স্বরূপ বা স্বধর্ম। দ্বিতীয়তঃ যাহার ক্রিয়া সঞ্চারে, সৃষ্ট পদার্থাদি সতত পরিবর্ত্তনশীল বা স্বয়ং অপরিণামী রহিয়াও, যাহার প্রভাবে, জীবজন্তু, বৃক্ষলতা, কীটপতঙ্গ, অনাদিকাল হইতে একই নিয়মের বশবর্ত্তী থাকিয়া, অবিশ্রান্তরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া চলিয়াছে,- অর্থাৎ কার্য্যকারণ শৃঙ্খলায়, সৃষ্টির সঙ্গতি রক্ষাদ্বারা, অনিবার্য্য নিয়মবন্ধনে, একটি হইতে অপরটিকে ভিন্নতায় পরিণতি প্রাপ্ত করাইয়া বা পৃথক শারীরিক মানসিক বিকাশ ঘটাইয়া, যথাযোগ্য কর্মফল ভোগের ও বিবিধ কর্ম প্রবৃত্তির অখণ্ড ক্রিয়ার

মূলে, সেই তত্ত্ববস্তু,- তাহা 'প্রকৃতি' বা মায়াশক্তি এবং নিজে অপরিবর্ত্তিত সত্ত্বেও জগৎ সংসার নিত্যই পরিবর্ত্তিত রাখা,- তথা জীবের পূর্ব্বানুভূত জ্ঞানের প্রতিরূপ সংস্কার বিকশিত করিবার উপযুক্ত পরিবেশ ও ভোগানুকূল অবস্থার প্রবর্ত্তনা,- প্রকৃতির স্বভাব বা স্বধর্ম।

বৃক্ষবীজ অন্তর্গত বা মানবজীবন বিন্দুতে অন্তর্ভুক্ত, নিত্যবস্তু প্রাণপুরুষ বা আত্মার অধিষ্ঠানবশতঃ তাহাতে প্রাণক্রিয়া সঞ্চালিত হইলেও, তাহা ফলফুলেশোভিত বৃক্ষে বা ইন্দ্রিয়াদি বিশিষ্ট পরিপূর্ণ দেহরূপে পরিণত হওয়া, প্রকৃতির ক্রিয়া বা গুণ এবং প্রকৃতির গুণত্রয় প্রভাবেই (গী-৩।২৭,১৩।২০) জনগণের মধ্যে কেহ সাত্ত্বিক, কেহবা রাজসিক, অপরকেহ তামসিক ভাবাপন্ন। যেমন বীজ ও মৃত্তিকার গুণ ভেদে, সতেজ ও নিস্তেজ বৃক্ষের পার্থক্য এবং কোনটির ফল মিষ্ট, টক বা কষায়,- তেমনি জন্মগত সংস্কার ও পারিপার্শ্বিক প্রভাবে, কেহ সংসারাসক্ত বদ্ধজীব, অন্যজন সংসার বন্ধন হইতে মুক্তিলাভে প্রয়াসী। পরন্তু সংস্কারাদির ধারক অচেতন প্রকৃতি,- চেতন পুরুষের সহিত মিলিত হইলেই, জীবের সহজাত সংস্কার বা ব্যক্তিগত বৃত্তিবৃত্তির স্ফুরণ হইতে থাকে,- যেমন চুম্বকের নৈকট্য বশতঃ লৌহের গতিশীলতা।

তাৎপর্য্য এই,—সংস্কার ও বিষয়াদি গুণের, প্রতিক্রিয়া বা প্রকৃতির স্বাভাবিক মায়ার ছায়া,-মায়াতীত পুরুষে প্রতিফলিত বা অনুপ্রবিষ্ট হইয়াই, চিৎবস্তু পুরুষকে চঞ্চল, ভোগপরায়ণ বা প্রকৃতি প্রবর্ত্তিত সৃষ্টির সৌন্দর্য্য মহিমার রূপরস গন্ধস্পর্শ প্রভৃতিতে আকৃষ্ট বা আসক্ত প্রতিভাত হয়,- যেমন রক্তোৎপলের সামীপ্যে, স্বচ্ছশুভ্র স্ফটিককে রক্তিমাযুক্ত বোধ হইয়া থাকে। লক্ষ্যনীয় যে, বুদ্ধির প্রতিফলিত বা বুদ্ধিরও প্রকাশক এবং প্রকৃতিজাত গুণাদি হইতে পৃথক হইয়াও, পরোক্ষভাবে বস্তুর গুণ বা স্বভাব এবং বুদ্ধিতে আত্মভাব প্রাপ্ত অবস্থাকেই বলা হয়, 'প্রতিবিম্বিত পুরুষ, পক্ষান্তরে দর্পনের স্বচ্ছতা' মলিনতা ভেদে সূর্য্যপ্রতিবিম্বের উজ্জ্বল্য বা অস্পষ্টতা দৃষ্ট হইলেও, স্বপ্রকাশ সূর্য্য যেমন আয়নার মলিনতা গুণ পায় না, কেবল প্রতিচ্ছায়ার তারতম্য হয়,- তেমনি কালিমালিপ্ত চিম্নীতে ব্যাহত আলোক শিখার ন্যায়,- ব্যক্তিবিশেষে অন্তঃকরণের কলুষতা বা বহির্ম্মুখীনতা বশতঃ স্বভাবত জ্ঞানালোক সদৃশ, গুণাতীত পুরুষের সকল্প বা শক্তির বিকাশ, অর্থাৎ ঐশী অভিপ্রায়ের স্ফুরণ, সেইক্ষেত্রে প্রতিহত হয় মাত্র।

বস্তুতঃ নিষ্ক্রিয় ও নিত্য আনন্দময় পুরুষ, বিষয়াদি ভোগ করেন না,- তিনি ইন্দ্রিয়াদির উদ্বোধক ও দেহদ্বারা কৃত কর্ম্মাদির দ্রষ্টা। জীবাত্মা বা পুরুষের জীবদেহে অবস্থানকালে, চেতনাপ্রাপ্ত দেহেন্দ্রিয়ে, পূর্ব্বজন্মের সংস্কারবশে আমি, আমার বোধ

সংযুক্ত হইয়াই বুদ্ধিতে প্রতিবিম্বিত পুরুষকে, ভোক্তা বা সুখদুঃখ অনুভবকারী বোধ হয়। অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়াদি, বুদ্ধিবৃত্তিতে প্রতিভাসিত হইয়া, আমিত্ব আরোপিত পুরুষে,- আমি জ্ঞাতা, আমি সুখী, আমি দুঃখী, এইরূপ অভিমান উপজাত হয়।

স্বরূপত চিৎস্বভাব পুরুষের বন্ধন বা মুক্তি হয় না। প্রকৃতি পুরুষ সংযোগের নিবৃত্তি ঘটিলে, সংস্কারাদি বা সহজাত বুদ্ধি, স্ফুরিত বা সংক্রমিত হইতে না পারায় বন্ধনদশা সৃষ্টিকারী প্রতিবিম্বের অপসারণ হয়। ইহাই নিত্যশুদ্ধ জ্ঞানস্বরূপ, পুরুষের প্রকৃতি প্রতিবিম্বিত অবস্থা হইতে মুক্তিলাভকরিয়া, স্বরূপের মহিমায় শান্তিযুক্ত স্থিতি। তাৎপর্য্য এই,-মায়াবশে প্রকৃতির সৃষ্টি সম্ভারে উৎফুল্ল জীব,- যখন ইন্দ্রিয়াদিতে 'আমিবোধ, যুক্ত করিয়া সম্ভোগ রত,-তাহা বদ্ধ অবস্থা এবং জাগ্রত বিবেকের অভ্যুত্থানে প্রকৃতির প্রতিবিম্ব হইতে আপন পার্থক্যের নিশ্চয়ে 'আমি দ্রষ্টা, অনুভূত,- তাহা মুক্ত অবস্থা।

প্রকৃতি জড়স্বভাব,- তাই ভোগের উপলব্ধি নাই। অশেষ সংস্কারের আধার, অন্তঃকরণ স্থিত মন ও ইন্দ্রিয়াদিকে স্পন্দিত করিয়া, সৃষ্টিকার্য্যের প্রয়োজনে, ইহাদের চেতনা প্রদাতা পুরুষকে,-ঐশ্বর্য্য ও আনন্দ উপভোগে আকৃষ্ট করাই তাহার অন্তর্নিহিত গুণধর্ম। ইহাই জীবাত্মার সংসারবন্ধন। পক্ষান্তরে পুরুষকে অধ্যাসিক বন্ধ দশা হইতে নিষ্কৃতি দেওয়াও প্রকৃতির অন্যতম ধর্ম। অবস্থান্তর প্রাপ্তি প্রকৃতি নিত্যধর্ম হইলেও, তাহা পুরুষের ন্যায়ই নিত্যবস্তু এবং পুরুষ সম্বন্ধহীনতায় প্রকৃতি ক্রিয়াহীন। যেহেতু প্রকৃতি সংযোগ হইতে বিচ্যুতিই পুরুষের মুক্তি এবং সাধনা ও পুরুষকারদ্বারা মানবত্ব অতিক্রম করিয়া, দেবত্বে উপনীত হওয়া যায়,- তাই পরমাত্মার অনুধ্যানে, আত্মবিশুদ্ধিরূপ বিবেকদ্বারা, অন্ধকারে ছলনার ভূমিকামত প্রাকৃতিক প্রতিক্রিয়ায় বীতরাগ পুরুষে, প্রকৃতির প্রভাব প্রকাশশীল হয় না।

পাতঞ্জলদর্শনে, প্রকৃতি প্রভাবমুক্ত জীবকে 'হিরণ্যগর্ভ'পুরুষ উল্লেখে বলা হইয়াছে,-সাধারণ জীব অপেক্ষা অধিকতর ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন হইলেও, তিনি জীবভাবকে অতিক্রম করিতে পারেন না। পরন্তু যোগযুক্ত, জ্ঞাননিষ্ঠ, কল্যাণ ব্রতে রত ও ঈশ্বরীয় জ্ঞানধারার সহিত সবিশেষ পরিচিত থাকায়, তাঁহার অন্তর তেজোময় ও চেতনায় আমিবোধের সুস্পষ্ট প্রকাশ। তাই তিনি পুরুষোত্তম গণ্য। তাঁহার হিরন্ময় বা জ্যোতির্ময় সত্তা কল্যাণময় ভাগবতীয় প্রজ্ঞায় পূর্ণ এবং ঈশ্বরের ন্যায় নিত্য নিরতিশয় ষড়ৈশ্বর্য্য সম্পন্ন বা চিরমুক্ত অথবা প্রকৃতি সংযোগ তিরোহিত কিংবা প্রকৃতি বশিত্ব না থাকিলেও, তিনি সর্ব্ব সংস্কারবর্জ্জিত আপন বোধেই আপনি দীপ্ত,- বুদ্ধি প্রসন্ন। বুদ্ধির প্রসন্নতায় সকল ইন্দ্রিয়ের প্রশান্তি দ্বারা কর্ম্মেন্দ্রিয় ও জ্ঞানেন্দ্রিয়ব্যাপী

আমার ধর্ম কি

একটি সুখময় অনুভূতি ও অন্তর্মুখী বৃত্তির উদয়ে, জাগতিক যাবতীয় প্রবৃত্তির লয়। এই ভাবারূঢ় অবস্থা প্রাপ্তির জন্যই সাধনার প্রয়োজন। তন্মধ্যে তন্ত্রসাধনা, তনু-প্রধান এবং মন্ত্রসাধনা, মন প্রধান।

মনুষ্যজাতি মননশীল জীব। তাই মানবমন কেবল স্থূল অনুভূতিতে সীমাবদ্ধ থাকিতে পারে না। মানস ও অতিমানস স্তরের সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর উপলব্ধির প্রয়াসে সচেতন মনের সর্বস্তরে অবাধ বিস্তার। যেহেতু মনুষ্যত্বের চরমতম বিকাশ ঘটাইতে-আধ্যাত্মিকতাই প্রধান অবলম্বন এবং ইহাই জীবের সত্তাগত বৈশিষ্ট্য'- তাই ধর্মীয় নীতিবোধে জীবনে সদা জাগ্রত রাখিতে পারিলেই জীবাত্মার স্বরূপে উত্তরণ সম্ভব হয়। উল্লেখ্য, হিরন্ময়গর্ভ পুরুষ কর্মানুসারী জন্মমৃত্যু হইতে মুক্ত হইলেও, তিনি-জীবকল্যাণ জন্য স্বেচ্ছায় পুনর্জন্ম গ্রহণ করেন কিংবা করিতে পারেন।

. জগতে যাহা জন্মায়, তাহা যথাকালে ধ্বংশ হয়। কিন্তু এমন একটি তত্ত্বস্তু' রহিয়াছে,-যাহা জন্মায় না, নির্মিত হয় না, খণ্ডিত বা বিলুপ্ত হয় না। যদি জন্মমৃত্যু বন্ধন বিমুক্ত নিত্যসত্তা না থাকিত, তবে তাহারই অনুপ্রবেশে চেতনা প্রাপ্ত জীবদেহ হইতে, পুনরায় তাহার নিষ্ক্রমনের সম্ভাবনা থাকিত না। এই নিত্যবস্তু মন ও দেহ হইতে ভিন্ন,-সদা বিরাজমান চৈতন্যময় সত্তা বা জীবের জীবাত্মা। পরন্তু ধূমদ্বারা যেমন অগ্নি আচ্ছন্ন থাকে, তেমনি বাসনাকামনাদ্বারা স্ব-প্রকাশ আত্মা অপ্রকাশিত থাকেন বা নিত্য স্বভাবের, ভিন্নতা প্রকাশ পায়। তাই নিত্যবস্তু জীবাত্মার বা আমার নিত্যধর্ম কি, তাহাই অনুধাবনীয়।

বস্তুর নিত্যস্বভাবকেই, তাহার নিত্যধর্ম বা স্বরূপ বলা হয়। কিন্তু সেই প্রকৃতিগত ধর্ম বা বস্তুর আত্মভাব, যখন অন্যকোন বিষয়ের সংযোগে বা প্রভাবে, বিকৃত বা দোষযুক্ত হয় এবং সেই অবস্থা ক্রমে দৃঢ় হইয়া প্রকৃতস্বভাবেরই অন্তর্গত বা সঙ্গীরূপে প্রকাশ পায়,- বস্তুর সেই পরিবর্তিত অবস্থাকে বলা হয়,- নিসর্গ। ইহা বস্তুর সত্তাপরিচয় আবৃত করিয়া রাখে এবং এই অবস্থান্তরকেই প্রকৃত বলিয়া ভ্রম জন্মায়। যথন শৈত্য প্রভাবে জল ক্রমশঃ বরফ বা জমাট জলে রূপান্তরিত কিংবা কর্দম সংযোগে,- শুদ্ধ জলের বিকৃতি, তাহা অবশ্যই বস্তুর স্বভাব নয়,- বরং আগন্তুক বা নৈমিত্তিক ধর্ম। অর্থাৎ আরোপিত অগ্নিদ্বারা লৌহখণ্ডে উত্তাপ সৃষ্টি ন্যায়, ইহা বস্তুতে আরোপিত ধর্ম,-অর্থাৎ নিসর্গ। গঠন হইতে, নিত্যসহচর রূপে যে স্বভাব জাত হয়,-তাহাই সেই বস্তুর নিত্যধর্ম, যেমন ইক্ষুরসে মিষ্টতা কিংবা তিন্তিড়ী টক, লঙ্কামরিচ কটু স্বাদ।

ভক্তিশাস্ত্রমতে 'বস্তু' দুই প্রকার,-বাস্তববস্তু,- যাহা পারমার্থিক তত্ত্ব এবং অবাস্তব বস্তু,-অর্থাৎ দ্রব্যাদির রূপ, গুণ। বাস্তববস্তুর অস্তিত্ব নিত্যবিদ্যমান এবং অবাস্তব বস্তুর

কেবল প্রতীতি হয়,- যেন কথাও সত্য বা প্রকৃত,-কেননা স্বার্থান্বেষীর তা বা ছলনা। শ্রীমদ্ভাগবতে প্রথমস্কন্দ প্রথমঅধ্যায়ের দ্বিতীয় শ্লোকে ব্রহ্ম, পরমাত্মা বা ভগবানকে একমাত্র বাস্তব বস্তু উল্লেখে বলা হইয়াছে,-'জীব' এই নিত্যবস্তুর পৃথক অংশ এবং 'মায়া' বা অবিদ্যাপ্রসূত অজ্ঞানতা তাঁহারই শক্তি বিশেষ। সুতরাং এই শাস্ত্র সিদ্ধান্ত অনুসারে 'বস্তু' শব্দে ভগবান, জীব ও মায়া,- এই তিন তত্ত্বকেই বুঝাইতেছে এবং ভগবান চিদ্বস্তু বলিয়া তদংশ জীব চিৎবস্তু হইলেও, ভগবান বৃহৎ চিৎবস্তু, জীব অনুচিদ্বস্তু। তাৎপর্য্য এই,-চিদ্ধর্মে উভয়ের ঐক্য থাকিলেও, পূর্ণতা ও অপূর্ণতার ভেদ রহিয়াছে। পক্ষান্তরে জীব মায়াবশ,-ভগবান মায়ার নিয়ন্তা,-এই বিচারেও জীব ও ভগবানে নিত্যভেদ বর্ত্তমান। অতএব ইহাই নির্দ্ধারিত হয় যে,-শ্রীভগবানের প্রতি নিত্য আনুগত্য ও তাঁহাকে অবিরত স্মরণই 'আমার' বা জীবের প্রকৃত স্বভাব বা চিরাগত ধর্মবিধি।

মায়াকবলিত পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়া, দুঃখপীড়িত ও সংসার যাতনায় দগ্ধ জীব মায়াবশ হইয়া পড়ে এবং পার্থিব সুখ ভোগের আকর্ষণে ক্রমশঃ বহির্মুখ, অর্থাৎ বিষয়াসক্ত হইতে থাকে। ফলতঃ ঈশ্বরবিমুখ, সতত অল্পমতি লোকের সংসর্গে আসিয়া জীবের নিত্যধর্ম বিকৃত হইয়া যায় এবং দেহগেহ পুত্রপরিবার, আত্মীয় পরিজন, অর্থবিত্ত, মানমর্য্যাদার মোহে লালায়িত চিত্তবৃত্তি, জাগতিক বিষয়ের পরিচর্য্যাতেই নিযুক্ত রত থাকিয়া কালাতিপাত করে,- ইহাই স্বধর্মবিস্মৃত জীবের সংসার বন্ধন। নদীতট যেমন জল ও কূল সংশ্লিষ্ট থাকিয়াও, তটভূমিরূপে পৃথক সংজ্ঞার পরিচয় বহন করে,- কিংবা কটিতট দেহের ঊর্দ্ধাংশ ও নিম্নাংশের সহিত যুক্ত রহিয়াও, স্বকীয়তায় আলাদা,- সেইরূপ উপমার আরোপে, জড়াশ্রিত অথচ চিদ্ধর্ম প্রযুক্ত মানবাত্মাকে বলা হয় 'তটস্থ' অর্থাৎ অচিদ্বস্তু ও চিদ্বস্তু সংলগ্ন হইয়াও, তাহাদের মধ্যবর্ত্তী অবস্থায় স্থিত, স্বতন্ত্রসত্তা।

উপরোক্ত উপমা বিচারে একদিকে জলের টান,-অন্যদিকে তীরের আশ্রয় ন্যায়,- যুগপৎ জাগতিক আসক্তি ও আধ্যাত্মিক অনুরাগে আকর্ষিত জীবচিত্ত দোদুল্যমান। যদিও জীব অণুপরিমাণ এবং প্রকৃতিতে ভগবদংশ বলিয়া জড়াতীত বস্তু,-ফলতঃ শ্রীভগবানের প্রতি বিমল প্রেমই তাহার স্বরূপ বা স্বভাব অথবা স্বধর্ম,-যেমন ভূমিস্থিত সূক্ষ্ম বায়ু স্বাভাবিক অবস্থায় আকাশের [illegible] থাকে,- তথাপি বিবাদ জড়িত ও সংশয় সন্দেহে আন্দোলিত জীব জীবনে স্বতঃ অনুরণিত ভগবৎ অভিনিবেশের আকর্ষণ পারিপার্শ্বিকের প্রভাবে, তথা 'সংস্কার বশে স্তিমিত বা উদ্দীপিত হয় এবং নিরবচ্ছিন্ন ভগবৎ বিস্মৃতি হইতেই জীবের স্বরূপ

বিস্মরণ ঘটিয়া বদ্ধাবস্থা প্রাপ্তি বা সংসারগতি হইয়া থাকে,- অর্থাৎ এই রোগশোক, দুঃখযন্ত্রণা ক্লিষ্ট সংসার ভূমিতে পুনঃপুনঃ গতাগতি বা জন্মমৃত্যুর আবর্তে পতিত হইতে হয়।

শ্রীগীতার অষ্টম অধ্যায়ে উল্লেখ রহিয়াছে যে,-সতত ভগবৎ স্মরণের অভ্যাসই জীবের ধর্ম,-যাহা জ্ঞানলাভের ও ইষ্টভাব প্রাপ্তির উপায়। তাৎপর্য্য এই,- সমস্ত জীবনভরিয়া যে বিশেষ ভাবনা লালন বা পোষণ করা হইয়াছে, দেহত্যাগকালে অর্থাৎ মৃত্যুসময়ে, সেই বিষয়ের চিন্তা অবসন্ন অন্তরে আপনা হইতে প্রবল হইয়া,- তাহার অনুসরণে পরবর্ত্তী জন্ম নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে। তাই পঞ্চমশ্লোকের উক্তি,- মোহান্ধকারের অতীত, সকলের কর্মপ্রদাতা, নিত্য চৈতন্য প্রকাশ, জ্যোতির্ময় পরম পুরুষকে ভক্তিযুক্ত চিত্তে স্মরণ করিতে করিতে, যাহার জীবলীলার অবসান হয়,- সতত ভগবদগত চিত্ত, সেই বিদেহী জীবাত্মা চিন্ময়দেহে অভীষ্ট পুরুষের সান্নিধ্য উপনীত হইয়া থাকেন। তাই পরবর্ত্তী শ্লোকে নির্দ্দেশ,- অতএব অবস্থা, সকল সময়ে ইষ্টদেবতা বা উপাস্যকে সতত স্মরণরূপ 'অন্তরঙ্গসাধন', করিতে হইবে,-যাহা জীবের নিত্যধর্ম বটে। অর্থাৎ বৃহৎবস্তু পরমেশ্বরের প্রতি অণুবস্তু জীবের যে প্রকৃতিগত আকর্ষণ তাহা সতত সম্প্রীতি রাখাই জীব, তথা আমার ধর্ম।

শ্রীমদ্ভাগবত প্রথমস্কন্দের প্রথমঅধ্যায়ে আলোচিত হইয়াছে যে,-চিত্তের প্রসন্নতা লাভই জীবের ধর্ম এবং যাহাতে বা যে উপায় অবলম্বনে এবং যেই সকল কার্য্যের সমষ্টি হইতে, শ্রীভগবানের প্রতি অহৈতুকী ও অপ্রতিহত ভক্তিভাব,- অর্থাৎ হৃদয়-জাত অনুরাগ উদয় হইয়া, জীবাত্মা সম্যকরূপে সর্ব্বদা প্রসন্ন থাকে,-তাহাই পরমধর্ম। শ্রীগীতা ষষ্ঠঅধ্যায় বাইশশ্লোকের মর্মার্থ অনুধাবনীয় যে,-পরমচৈতন্য ও পরমানন্দ স্বরূপ পরমাত্মার উপলব্ধি হইলে, দেহমনপ্রাণে যে অলৌকিক প্রসন্নতার আবির্ভাব হয়, তাহার প্রভাবে অনিবার্য্য সাংসারিক মহাদুঃখও, চিত্ত অবিচল থাকে এবং সেই আত্মপ্রসন্ন অবস্থায় জাগতিক কোন কিছুকে অধিকতর প্রেয় বা বাঞ্ছিত মনে হয় না। দ্বিতীয় অধ্যায়ের পয়ষট্টি শ্লোকে বলা হইয়াছে,-চিত্ত প্রসন্নতার দ্বারা প্রিয়বস্তুতে স্বাভাবিক আসক্তি এবং অপ্রিয়বস্তু প্রতি বিদ্বেষভাব দূর হইবার ফলে আত্মস্বরূপে নিশ্চল বুদ্ধি স্থিরভাবে অবস্থান করে। পরবর্ত্তী শ্লোকে তাই, বিষয়তৃষ্ণাকে সকল দুঃখের মূল উল্লেখে, বিষয়ভোগ বাসনা বা বিষয় লোলুপতা হইতে ইন্দ্রিয়াদিকে নিবৃত্ত রাখিতে উপদেশ রহিয়াছে,-যেই অবস্থায় চিত্ত স্থিত হইলেই প্রকৃত সুখ বা 'প্রসন্নচিত্ততা' লব্ধ হয়।

আমি ও আমার ধর্ম

প্রকৃত বিচারে মনুষ্য জাতির মত দুঃখশোকাতুর জীব আর নাই। একে তো প্রারব্ধবশে আগত আকস্মিক বিঘ্নবিপদে জড়িত হইয়া সংসারক্ষেত্রে বিচরণশীল মানবের জীবন নদীস্রোতের মত আপন গতিতে কোথা হইতে কোন পথে চলিতে চলিতে তনুত্যাগ করিবে, তাহার স্থিরতা নাই, তদুপরি বয়োবৃদ্ধির সাথে সাথে অবিরত দুর্ভাবনা দুশ্চিন্তা জর্জ্জরিত জীবনে অপ্রত্যাশিত ভাবে স্বাস্থ্যহানি, মানহানি, কর্মহানি, ধনহানি, প্রিয়জন হানি প্রভৃতি সাংসারিক বিপর্য্যয়ের আশঙ্কা লাগিয়াই রহিয়াছে। সংসার দাবানলে আপন অস্তিত্ব রক্ষার প্রাণপন প্রয়াসের মধ্যে তাই অপ্রাকৃত আনন্দলাভের অনুসন্ধান, অর্থাৎ আত্মচিন্তার সার্থক ভাবনা প্রায়শঃ শূন্যসত্তা মরিচীকায় পর্য্যবসিত হইয়া থাকে। ইহাই জীবজীবনে পরম সঙ্কট এবং দুঃখকর অবস্থা। এই সম্পর্কে শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থের প্রথমস্কন্দ দ্বিতীয়অধ্যায়ে বর্ণিত ধর্ম মীমাংসা এবং ছান্দোগ্যে শাণ্ডিল্য সূত্রের সঙ্কেত অনুসরণীয় অর্থাৎ স্বার্থফলাভিসন্ধানরূপ কৈতববর্জ্জিত বা কপটতামুক্ত চিত্তে ঈশ্বরের প্রতি পরম অনুরক্তি লাভই জীবের ধর্ম, যাহা আপনা হইতে উৎপাদ্য নয়। ইহা অনন্যচিত্তে অনবরত ভগবৎ চিন্তায় উদ্দীপিত ভগবদ্ভক্তের হৃদয়ে ঐশী অভিপ্রায়ে স্ফুরিত হয়। পরন্তু শ্রীগীতার প্রথম অধ্যায়ে সিদ্ধান্ত এই, অন্তরের বিষাদ হইতেই ভগবৎ প্রসাদ লাভে প্রয়াস, ফলতঃ ভাগবতীয় শক্তির আবির্ভাব।

ধর্ম কি বস্তু

শ্রীভগবান এক ও অদ্বিতীয়। তিনি সর্ব্বশক্তি সম্পন্ন,- সর্ব্বাপরক,-ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যের নিলয়,-মায়া ও জীবশক্তির আশ্রয় তিনি। সর্ব্বশক্তিত্ব, সর্ব্বব্যাপিত্ব, পরমদয়া পরমানন্দ,-তাঁহাতে পূর্ণরূপ বিরাজমান। বিশ্বভুবনে তাঁহার তুল্য আর কিছু নাই,-তিনি বিশ্বপাতা, বিশ্বম্ভর, বিশ্বরূপ। জড় জগৎকে বলা হয় 'মায়িক তত্ত্ব,- জীবকে ভগবানের 'অধীনতত্ত্ব' এবং ভগবান স্বয়ং 'প্রভুতত্ত্ব', মায়া ও জীবের আশ্রয় হইয়াও, একটি স্বতন্ত্র স্বরূপে বিরাজিত তিনি। তাঁহার সহিত সম্বন্ধজ্ঞান স্থাপন করিয়া চলাই জীবের জীবনে 'প্রয়োজনতত্ত্ব'। জাহ্নবীধারা যেমন কামনা বিবর্জিত হইয়া তাহার স্বতঃপ্রবৃত্ত প্রেরণাবশে সাগরসঙ্গমে প্রধাবিত হয়,-তেমনি সর্বকল্যাণ প্রদাতা ভগবানের প্রতি ঐকান্তিক প্রীতির দৃষ্টান্তঃকরণের অব্যবহিত ভাবে সকল মনোবৃত্তিকে, তাঁহারই উদ্দেশ্যে সমাহিত রাখিবার নিত্য আচরণই জীবের যথাবৎ ধর্ম।

ভগবান আছেন,-আমরা তাঁহার দৃষ্টিপথে রহিয়াছি,-মনের এই আস্তিক্যভাবই যথেষ্ট নয়। ইহা সংস্কারাচ্ছন্ন চিত্তের একটি অবস্থামাত্র,-যাহা মনে ভরসার ভাব আন-

হয় করে যে,-তিনি বিপদে রক্ষা করিবেন,-সঙ্কটে পথ দেখাইবেন। এই বিশ্বাসে সাংসারিক উদ্বেগ দূর হয়,-কর্মে উৎসাহের উদ্দীপনা জাগে, কৃতকর্মে বিরুদ্ধ ফল লাভ ঘটিলে, মনে সান্ত্বনা আসে যে,-ইহা হয়ত ভগবৎ বিধান। কিন্তু ইহাতেই অন্তরে ভগবানের স্পর্শলাভ ঘটে না,-চিত্ত ভগবৎ অনুরাগে রঞ্জিত হয় না,-মন বিষয়ের আবর্ত্ত হইতে বাহির হইতে পারেনা,-ভগবৎ নির্ভরতা দিবসের আলোকের মত স্বাভাবিকভাবে স্বপ্রকাশ হইয়া 'আমি, কে আপ্লুত করিয়া, ভগবৎ প্রেমে চিত্তকে উদ্বোধিত করিয়া তোলেনা,-'আমি' স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না।

যাহা আমাদের জীবনকে কল্যাণের দিকে ধরিয়া রাখে,-অস্তিত্বকে অস্বস্তির মালিন্যে আবিষ্ট হইতে দেয় না,-তাহাই ধর্ম,-যেমন প্রাণের ধর্ম দেহকে সজীব রাখা,-আত্মার ধর্ম দেহেন্দ্রিয়াদিকে পরিচালিত করা। ধর্মকে বলা হয়, বস্তুর স্বভাব,-যেমন জলের ধর্ম শীতলতা,-অগ্নির ধর্ম উত্তাপ দেওয়া,-সেই বিচারে জীবাত্মার ধর্ম বা স্বাভাবিক গুণ, পরমাত্মার সহিত যোগযুক্ত থাকা। ধর্মকে চিত্তের কোন ভাবাত্মক অবস্থা বুঝাইলে, যেই অবস্থায় স্থিত হইলে চিত্ত ঈশ্বরাভিমুখী হয়,-তাহা আধ্যাত্মিক ধর্ম। সুতরাং যাহাকে জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে সকলেই জানিতে চায়, সেই সত্যস্বরূপ, সুখস্বরূপ, আনন্দস্বরূপ ভগবানকে, প্রভুরূপে, বন্ধুরূপে দয়িতরূপে, বৎসলরূপে অন্তরে উপলব্ধি করিয়া ধরিয়া রাখিবার যে নিত্যকর্ম,-তাহাই জীবের নিত্যধর্ম।

পক্ষান্তরে যে ধারণাত্মিকা শক্তি, ভগবৎ অনুসন্ধিৎসাকে অনুক্ষণ অনুপ্রাণিত রাখিতেছে কিংবা যে সকল গুণশক্তির জন্য, মানুষ পশুভাব হইতে স্বতন্ত্রতা লাভ করে, তাহাই মানুষের স্বভাবগত ধর্ম বলিয়া বিবেচিত। প্রাসঙ্গিক উল্লেখ করা যায় যে, 'ধর্ম কর্ম' বলিতে কোন মতবাদ বুঝায়, অন্তরের সুপ্ত অধ্যাত্ম চেতনাকে উজ্জীবিত করিতে, যেই অবলম্বন আবশ্যক হয়'-'কিংবা তৎসম্পর্কে যাহাকিছু সহায়তা প্রদান করে'-কিংবা অজ্ঞানতায় আবৃত আত্মজ্ঞান ও ঐশ্বরিক বোধের কুহেলিকা আবরণ অপসারিত করিবার পক্ষে, যেই পদ্ধতির অনুসরণ সহায়ক,-তাহাই ধর্মীয়কর্ম।

মানুষ চায় আপন সত্তার সংরক্ষণ, অনাবিল আনন্দ, চিত্তের প্রসন্নতালাভ। শাস্ত্রকারগণ বলিয়া গিয়াছেন, আনন্দময় ভগবানের সহিত জীবসত্তা যুক্ত থাকিলেই অন্তর আনন্দিত হয় এবং বিপৎসঙ্কুল দুঃখময় সংসারগতি প্রাপ্তি হইতে চিরতরে উদ্ধার লাভের বাসনা জাগে। এই আত্মত্রাণোপায় চিন্তায় উন্মেষকে, ভক্তিশাস্ত্রে করুণাময় শ্রী ভগবানের নিরুপাধিক করুণা বলিয়া বর্ণিত। এই আত্মধর্মকে অর্থাৎ ভাগবতীয় ভাবনার প্রবণতা উপেক্ষা করিয়া চলিলে, জীবনপথ হইয়া উঠে অর্থহীন

লক্ষ্যভ্রষ্ট। সুতরাং যে পরমশক্তি জীবাত্মাকে ধারণ করিয়া রহিয়াছে, তাহাকে বরণীয় রূপে গ্রহণ করাই জীবের প্রকৃতিগত ধর্ম।

শাস্ত্রনির্দ্দেশিত পথে জীবনযাপন করা কোন নিগড়বদ্ধ অবস্থা নয় বরং অজস্র প্রবৃত্তি রূপ তরঙ্গ সমাকীর্ণ সংসার সমুদ্রে নিরাপদে অবগাহন করিবার শ্রেষ্ঠ অবলম্বন কিংবা খরস্রোতা ভবসাগর অনায়াসে অতিক্রম করিবার ভেলা বিশেষ অথবা জীবনকে নিয়ন্ত্রণে রাখিবার প্রকৃষ্ট পদ্ধতি। কাজেই অধ্যাত্মজীবনকে ব্যবহারিক জীবন হইতে বিচ্ছিন্ন না করিয়া এই লৌকিক জীবনের প্রতিটি কর্ম ও কর্মের ভাবনাকে ঈশ্বরানুবর্ত্তিতা রূপ ভক্তি বা ঈশ্বরানুরক্তি দ্বারা সতত অভিসিক্ত রাখাই সংসারী লোকের পরমধর্ম।

ফলের মধ্যেকার সূক্ষ বীজ কণাটি বাহিরে দেখা না গেলেও তাহাতেই যেমন বিশাল বৃক্ষের প্রাণ বীজ লুকায়িত, তেমনি ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য না, এরূপ তত্ত্বস্ত ব্রহ্ম হইতেই নাম রূপ রসাদি সম্পন্ন বিচিত্র বিশ্বজগৎ সৃষ্ট। সমুদ্রজলে অদৃশ্য লবণ, যেমন আস্বাদে জানা যায়, সেইরূপ সাধনাদ্বারা বিশ্বপতিকে অন্তরে উপলব্ধি করা যায়। কারণ জ্ঞান জ্ঞেয় ও জ্ঞানগম্যরূপে তিনি সকলের হৃদয়েই অধিষ্ঠিত (গীতা-১৩।১৮) এবং এই বিশ্বেশ্বর বা বিশ্বস্রষ্টা কর্ত্তা এমন এক সর্ব্ব মঙ্গলময় জ্ঞানময় ও কর্মময় নিত্য সত্তা যাঁহার মহারহস্যময় মহা চৈতন্যময় শক্তি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে অসামঞ্জস্য বজায় রাখিয়া সকলের অজ্ঞাত সারে তাহা কেবল চালিত করিতেছে তাহাই মাত্র নহে, পরন্তু পৃথিবীকে জীবনধারণ ও বাসের উপযোগী করিয়া অপূর্ব্ব মাধুরীতে সজ্জিত রাখিয়াছে কত ফুল কত ফল কত নিত্য প্রয়োজনীয় বস্তুর সহজ সমারোহ। তাই তাঁহার প্রতি মানবের নানাভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ও সেবা পদ্ধতির অবধি নাই। পরন্তু প্রত্যক্ষভাবে মানুষের মাথা হইতে আরম্ভ করিয়া পায়ের পাতা পর্য্যন্ত প্রতিটি শিরা উপশিরা তন্তু মাংসপেশী ইত্যাদি যিনি নিপুণভাবে সারাদেহে সাজাইয়া গ্রথিত ও বিন্যস্ত করিয়া তাহাতে রক্ত সঞ্চালন প্রাণবায়ু ক্রিয়া ও বুদ্ধিবৃত্তি অব্যাহত রাখিয়াছেন সেই সৃষ্টিকর্ত্তা, তথা সৃষ্ট জীবের জীবন ধারয়িতা ও ধীশক্তির প্রেরয়িতা পরম ঈশ্বর কোন আত্মসচেতন ব্যক্তির নিকট অপ্রয়োজনীয় গণ্য হইতে পারে না বলিয়াই ভগবৎ অনুধাবনা মানুষ মাত্রেরই সংস্কারগত ধর্ম।

এই বিশ্বরঙ্গমঞ্চের অধিনায়ক তথা বিশ্বপতির ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কণ, অথচ মহাশক্তিধর প্রকৃতির স্বাভাবিক আমক্রিয়া বলপ্রভাবের নিয়মে, (শ্বেঃ শ্বঃ ৬৮) গ্রহ উপগ্রহ, তারকাদি আপনাপন কক্ষপথে আবর্ত্তিত হইতেছে। যথাসময়ে উদিত সূর্য্য অস্তা

চলে গমন করিতেছে। দিন শেষে রাত্রি আসিতেছে। ভোর হইলে পাখীসব কলরব করিয়া, খাদ্য সংগ্রহে বাহিরে যাইতেছে। আবার সন্ধ্যা সমাগমে, নিজ নিজ নীড়ে ফিরিয়া আসিতেছে। এই অনিবার্য্য প্রাকৃতিক শক্তির অন্তর্গত অন্যান্য সহায়ক শক্তি অন্তরীক্ষে সকলের অলক্ষ্যে, এমনভাবে কাজ করিয়া চলিয়াছে, যাহাতে কোনমতেই বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হইতেছে না। নিখিল জগৎ প্রতিদিবসের মত যথা নিয়মে চলিতেছে। শিশু ক্রমে কৈশোর যৌবন অতিক্রম করিয়া বৃদ্ধ হইতেছে। জীবন প্রবাহ যথাবৎ বহিতেছে। দিবা রাত্রির যথাযথ আবর্ত্তনে, সময় সরিতেছে, ছন্দতালে।

এই তাল বা লয়ের ভঙ্গ কিংবা নিয়মের কিছুতেই ব্যতিক্রম ঘটিতেছে না। জগৎ সংসারের ক্রিয়া পদ্ধতি অপরিবর্ত্তিত রহিতেছে। কীটপতঙ্গ, জীবজন্তু জন্মিয়া, আবার মৃত্যুবরণ করিতেছে। অচেতন বস্তুও একটা অপরিহার্য্য নিয়ম শৃঙ্খলা বশে, আপন প্রকৃতিগত ধর্ম অনুসারে চলিতেছে। কালচক্রের আবর্ত্তনে, যথাক্রমে ঋতু পরিবর্ত্তন দেখা দিতেছে। গ্রীষ্মের পরই বর্ষা আসিতেছে। জলপ্লাবন হইলেও, তাহা ক্রম সরিয়া যায়,- ঝড় উঠিলেও তাহা শান্ত হইয়া আসে। উত্তাল সমুদ্র কখনও তীরভূমি গ্রাস করে না। উদ্ভিদ জগতেও আপনাপন অন্তর্নিহিত গুণ ধর্ম্মের পরিস্পন্দনে নিয়মবদ্ধ অবস্থান্তর প্রকাশ পাইতেছে। বীজ বৃক্ষে, ফুল ফলে পরিণত হইতেছে। এই যে অমোঘ প্রাকৃতিক বন্ধন কিংবা বিশ্বের স্থাবরজঙ্গম, ভূচর খেচর জলচর সর্ব্বত্রই একটা অপরিহার্য্য ও অপরিবর্ত্তনীয় নিয়মানুবর্ত্তিতা পরিদৃশ্যমান,- ইহার একজন নিয়ন্তা বা প্রকৃতিরও পরিচালক স্বীকার করিতে হয়। মহাজন তাঁহাকে বিশ্বকর্ত্তা বা জীবন দেবতা অভিহিত করিয়াছেন। কাজেই যাঁহাদের বোধির অনুভব, জীবের জীবন আলোকিত করিতেছে,- জগতের তত্ত্বদর্শী সেই বুদ্ধিজীবিগণের ভাবাদর্শ অনুসরণে, সংসার পথে চলিবার রীতিই সমাজের ধর্ম।

কোন কার্য্যই কারণ ব্যতীত উৎপাদিত হয় না এবং কার্য্যের কারণও নিয়ম বহির্ভূত নয়। প্রকৃতির আকস্মিক ক্রিয়ায় যে সকল সংঘটন আপাত দৃষ্টিতে অঘটন বলিয়া প্রতীয়মান হয়; তাহাও নিয়মের মধ্যদিয়া প্রকটিত। কাজেই নিয়মের নিয়ামক স্বীকার করিতে হয়,- যাঁহার শাসনে (তৈত্তিরীয় ২৮।১) প্রাকৃতিক কার্য্যসমূহ সুশৃঙ্খলভাবে চলিতেছে। বিশ্বকর্ম্মশালার এই কর্ম্মাধ্যক্ষ বিশ্বেশ্বর,- যিনি আপন শক্তিস্বরূপা অব্যক্ত প্রকৃতি মাধ্যমে, কর্ম্মাধীন জীবকে মায়াবশে (গীতা ৩।৫) সংসারলীলায় (গীতা ১৫।৪) মোহগ্রস্ত রাখিয়া, ভবরঙ্গমঞ্চে যন্ত্রারূঢ় পুত্তলিকার ন্যায় চালনা করিয়া

(গীতা ১৮।৬১) যথাযোগ্য ভোগ্য প্রদান করিতেছেন,- তাঁহাকে সদা স্মরণে রাখিলেই তাঁহারই প্রবর্ত্তিত বিধানে (গীতা ৭।১৪) জীবের মায়াপাশ মোচন হয়,- জীবন সহজ সরল হইয়া সংসার পথ অতিক্রান্ত হয়, যান আরোহণে অভীষ্ট স্থানে সত্বর পৌঁছাইবার ন্যায়,- ইহাই মাত্র নহে,- পরন্তু সর্ব্ব জীব হৃদয়ে অধিষ্ঠিত অন্তর্যামী (বৃহদারণ্যক ৩।৭।৩) নারায়ণকে আশ্রয় করিলে, জীবনে পরম শান্তি (শ্বেতাশ্বতর ২।১৪) ও জীবলীলা অবসানে পরমধামে (গীতা ১৫।৬) শাশ্বত পদপ্রাপ্তি (গীতা ১৮।৬২) লাভ হয়।

পক্ষান্তরে মায়াধীশ (শ্বে-শ্ব ৪।১০) যদ্বা বিভূতিপত্তিকে উপেক্ষা করিয়া চলিবার ফলে, দেহাত্মবুদ্ধিকরী প্রকৃতি (গীতা ৯।১২) প্রাপ্ত হইয়া, জীবন পথে চলা হয়, অন্ধের যষ্ঠীহস্তে স্খলিত পদে পথ অতিবাহন করিবার ন্যায়,- যেন পদে পদে বিপদের আশঙ্কা। সুতরাং ইহাই নির্ণীত হয়,- বিশ্বনিয়ন্ত্রণের মহাকর্ত্তা, যাঁহার প্রকৃষ্ট শাসনে, সূর্য্যচন্দ্র ভূলোক দ্যুলোক বিধৃত (বৃহ-উপ ৩।৮।৯) এবং যিনি সর্ব্বজীবের আশ্রয় (শ্বে-শ্বঃ ৩।১৭) ও মোক্ষের হেতু (শ্বে-শ্বঃ ৬।১৭) এবং যাঁহাকে বিবেকযুক্ত শুভ বুদ্ধি সহায়ে হৃদয়ে অভিব্যক্ত রাখিলে (শ্বে-শ্ব ৪।১৭) জন্ম মৃত্যুরূপ সংসারবন্ধন মোচন হয় এবং পরমপদ প্রাপ্তির আর অন্যউপায় নাই (শ্বে-শ্ব ৬।১৫),- সেই ব্রহ্মপুরুষের সদা স্মরণরূপ শরণাগত (গীতা ১৮।৬২) থাকিয়া, শাস্ত্রবিহিত (গীতা ৩।৮) কর্ম করিয়া জীবন ধারণ করা (ঈশ-উপ দ্বিতীয় শ্লোক) মনুষ্যমাত্রেরই স্বতঃ প্রবৃত্ত স্বাভাবিক ধর্ম।

শ্রীমদ্ভাগবত অষ্টমস্কন্দ প্রথম অধ্যায়ের দশমশ্লোক, যাহা ঈশোপনিষদ প্রথমমন্ত্রের যথাবৎ প্রতিধ্বনি, তাহাতে নির্দ্দেশ এইরূপ,- জগতের যাবতীয় পদার্থ যাঁহার সত্তা ও তাঁহার চৈতন্য গুণদ্বারা ব্যাপ্ত এবং জীবের কর্মফল অনুযায়ী, তিনি যাহাকে যেরূপ ধনাদি ভোগ্যবস্তুর বিধান করেন, তাহাই আসক্তিরহিত চিত্তে সন্তোষ সহকারে গ্রহণ করিবে,- তবেই- আত্মানুভূতির পরিপোষক ব্রহ্মজ্ঞান উদিত হইয়া, অন্তর সর্ব্বক্ষণ প্রসন্ন থাকিবে। চিত্ত প্রসন্ন হইলেই, ইন্দ্রিয়াদিতে ওতপ্রোত জীবাত্মা আপনাকে বিশেষভাবে (মুণ্ডক ৩।১।৯) প্রকটিত করেন। ভাবার্থ এই, জীবদেহের স্থির আত্মা, বহির্ম্মুখী বুদ্ধি, মন, ইন্দ্রিয়াদির সংস্পর্শে চঞ্চলতা প্রাপ্ত হইয়া,- অর্থাৎ চঞ্চল প্রাণমনে অবতরণ করিয়া,- আপন আনন্দস্বরূপতা হইতে বিচ্যুত। কাজেই যেই প্রকার কর্মে, চিন্তায়, চিত্তের চঞ্চলতা প্রশমিত হইয়া, প্রাণমন স্থিরত্বে উপনীত হয়, তাহাই গীতোক্ত (৩।১৯,৫।১১) কর্মযোগ বা উপনিষদ মতে সংসার জীবনে কর্ম করিবার

আমার ধর্ম কি

ধর্মীয় অনুশাসন।

মুণ্ডক উপনিষদ তৃতীয় মুণ্ডক প্রথম খণ্ডের পঞ্চমসূত্রে বিশেষ উল্লেখ করা হইয়াছে মন ও ইন্দ্রিয়ের একাগ্রতারূপ পরম তপস্যা দ্বারাই জ্যোতির্ময় শুদ্ধ আত্মাকে আপন হৃদয়াকাশে উপলব্ধি করিতে হয়। ছান্দোগ্য (৮।১।৬) বিশেষ উল্লেখ এই,- ইহজীবনেই জীবাত্মাকে স্বানুভবগোচর না করিয়া, যাহাদের দেহত্যাগ ঘটে, তাহারা অধোগতি প্রাপ্ত হয়। অপিচ কেনোপনিষদ দ্বিতীয়খণ্ড পঞ্চমসূক্ত অনুসারে, ইহ জন্মেই আত্মজ্ঞান লাভ না হইলে, জীবের 'মহতী বিনষ্টিঃ' অর্থাৎ জন্ম-জরা মৃত্যু লাভ রূপ দুঃখময় সংসারগতি হয়। পঞ্চম অধ্যায়ের উনবিংশতি শ্লোকে গীতার বাণী এই, যাঁহাদের মন আত্মনিষ্ঠ, ইহজীবনেই তাঁহারা জন্মমৃত্যুকে জয় করিয়া মুক্তিলাভ করেন।

উপরোক্ত শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্তের সরলার্থ এই-,প্রদীপ যেমন তৈল ব্যতীত আপনাকে প্রকাশ করিতে পারেনা, তেমনি যাহা হইতে অনাদি সংসারপ্রবাহ নিঃসৃত হইতেছে (গীতা ১৫ | ৪) কিংবা এই সংসাররূপ ব্রহ্মভবনে, সকল প্রাণীর একমাত্র অবলম্বনরূপে (মহাভারত অশ্বমেধপর্ব্ব) যেই ব্রহ্মপুরুষ বিরাজমান,-অমৃতস্বরূপ সর্বভূতের হৃদয়স্থ প্রত্যগাত্মা বা চৈতন্যদাতা রূপে নিত্য ধ্যেয় (গীতা ১০ | ২০) সেই অন্তর্যামী নারায়ণের সহিত চিন্তা, বাক্য, কর্মাদিদ্বারা (গীতা ১৮ | ৬২) অনুরাগ যোগসূত্র নিরবধি রক্ষা না করিয়া চলিলে, জীব পুরুষার্থলাভের অযোগ্য (গীতা ১৮ | ৫৮) হয়।

তাৎপর্য্য এই, যাহাদ্বারা প্রদীপের অস্তিত্ব,-সেই তৈল হইতে বিচ্ছিন্ন পলিতা'- যেমন নিজশক্তিতে আলো বিকিরণে অক্ষম হইয়া, ক্রমশঃ নিজেকেই দগ্ধ করিয়া ভস্মে পরিণত হয়,-তেমনি যাহা কর্তৃক (গীতা ৯ | ১৮) জীবনের উৎপত্তি, নিবৃত্তি স্থিতি,-মনের বুদ্ধিশক্তি, প্রাণের জীবনীশক্তি, দেহের কর্মশক্তি (গীতা ৯ | ১০) পরিচালিত,-জীবাত্মারও পরিচালক (গীতা ১৮ | ৬১) যিনি,-সেই পরমাত্মা, পরমপুরুষ, পরমপিতা, পরমেশ্বর (গীতা ১০ | ১২) হইতে বিচ্যুত হইয়া চলিলে, চিত্ত নিরবচ্ছিন্ন সংসারজ্বালায় সন্তপ্ত থাকিয়া, ক্রমে আপন মহিমা হারাইয়া ফেলে। ভাবার্থ এই দৃষ্টি নন্দন প্রদীপ শিখার সলিতা তৈল বর্জ্জিত হইলে, যেমন নিজ অস্তিত্বের দাহক হয়,-তেমনি আত্মজ্ঞানহীন, ভগবৎ বিমুখ জীব হৃদয়ের পবিত্রতা, শক্তির মঙ্গলময়তা ও বুদ্ধির প্রশান্তি হইতে বঞ্চিত থাকে। শ্রীগীতার নবমঅধ্যায় দ্বাদশ শ্লোকে, ইহারা বৃথাশা, বিফলকর্মা, নিষ্ফলজ্ঞানী, অবিবেকী প্রকৃতিপ্রাপ্ত এবং ষোড়শ অধ্যায় অষ্টমশ্লোকে, আসুরিকভাব বিশিষ্ট বলা হইয়াছে, যাহাদের আরও নীচযোনিতে জন্মলাভ ঘটে। বৃহদারণ্যক প্রথমঅধ্যায় তৃতীয় ব্রাহ্মণের প্রথমেই, সুরলোকের আনন্দবিমুখ ইহারা

অ—স্বর নির্ণীত।

শ্রীগীতার পঞ্চম অধ্যায় শেষ শ্লোকে ভগবান সকলেরই উপকারী সুহৃদ বলা হইয়াছে। সুতরাং জীবনরথের নিত্য সারথি, তথা সংসার পথের একমাত্র বন্ধু সতত সাথে রহিয়াছেন, এই রূপ প্রত্যয়ে চিত্তে দুর্ব্বলতা দেখা দেয় না; ধৈর্য্যে ক্লান্তিবোধ হয় না; শ্রমে আসে না উদাসীনতা; বিঘ্নে ঘটে না আতঙ্ক; বিফলতাকে ক্ষতিকারক মনে হয় না। কারণ অনন্ত পথের অদ্বিতীয় বন্ধু, বিশ্বপতিকে সতত হৃদয়ে বহন করিলে, তাঁহার অনন্ত মাধুর্য্যের বিশ্বব্যাপিনী মাধুরী, সংসারের শোক তাপ, দুঃখজ্বালা, বিরোধ বিক্ষোভের কুহেলিকা অপসারিত করিয়া, (গীতা ১৮। - ৬৬, ১০।১০। ১৪) হৃদয়ের চিরন্তন সম্পদরূপে অন্তরের অন্তরে প্রসন্নদৃষ্টিতে বিরাজ করে। ফলতঃ দেহান্তকালেও ভগবৎ বিস্মৃতি না ঘটায়, জীবাত্মার গতি হয় (গীতা ৮। ৫) পরমপদ প্রাপ্তির অভিমুখে।

জীবনেশ্বরকে সতত স্মরণ রূপ এই ধর্ম্মের পথ সহজ বা আচার আচরণ (গীতা-১৮। ৪৮) বহির্ভূত বলিয়াই মানুষ যেন সদা উন্মুক্ত পরম পথের কথা ভুলিয়া দৃষ্টি গোচর বিত্ত বৈভব অনুসন্ধান (গীতা ৩। ২) তৎপর থাকে, যেমন নিঃশ্বাস প্রশ্বাস দেহকে সতত ধরিয়া আছে বলিয়াই, মানুষ তাহা উপেক্ষা করিয়া চলিতে অভ্যস্ত। কিন্তু মানবমন যখন জীবনদেবতাকে (গীতা ৯। ২৪) জীবনের কর্ণধার জ্ঞান করাকেই স্ব-ধর্ম মনে করে, তখনই জীবনে সঞ্চারিত হয় ভগবদ্ভক্তির যথার্থ আবাহন এবং ক্রমশঃ পার্থিব আশা আকাঙ্খারূপ বিস্তীর্ণ লতাজাল ছিন্ন হইয়া, চিত্ত চৈতন্যের জ্যোতিতে বিকশিত হইতে থাকে, যাহা কিছু ভাল তাহার সহিত পরিচয় ঘটে। দুঃখদগ্ধ ও বেদনাপীড়িত সংসার জীবনে ইহাই পরম লাভ। এবং এই ভাবে চিত্তবৃত্তিকে বিষয় ব্যাপারের আকর্ষণ হইতে নিবৃত্ত করিয়া (গীঃ ১৮। ৬৬) ঈশ্বরে সমর্পিত রাখাই প্রকৃত ধর্মাচরণ।

ধর্ম্ম সাধনা কি

বস্তুতঃ ধর্মসাধনায় চরম লক্ষ্য জীবের ঈশ্বর সান্নিধ্য স্ব-রূপে উপনীত হইবার সংস্কার গত অভীপ্সা, কিংবা পবিত্রতার পূর্ণতা প্রাপ্তিদ্বারা জীবাত্মার, কাম্যবস্তু লাভের বা স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত হইবার প্রচেষ্টা। দেহকে সুস্থ সবল কর্মক্ষম রাখিতে যেমন পুষ্টিকর উপযুক্ত আহার্য্য আবশ্যক, জীবাত্মাকে পাপলিপ্ত সঙ্কোচ হইতে উদ্ধারণ করিতে, তেমনি আত্মিক গুণশালী খাদ্য প্রয়োজন। ভোজ্যদ্রব্যের প্রকারভেদে যেমন দেহ ও মনে প্রতিক্রিয়া প্রকাশ পায়, সাত্ত্বিক রাজসিক ও

তামসিক (গীতা ১৭ | ২) সাধনার ফল প্রাপ্তিতে তেমনি তারতম্য হয়।

জড়দেহদ্বারা কৃত পূজাআবধনায় জড়ীয় ইন্দ্রিয়াদি শুদ্ধ হয়, জন্মান্তরকৃত ধর্মাদি সংস্কার হইতে জাত স্বভাববশে অনুষ্ঠিত জপতপ ব্রত উপবাস তীর্থপরিক্রমা যজ্ঞীয় উৎসব অনুষ্ঠান প্রভৃতিদ্বারা জাগতিক প্রতিষ্ঠা লাভ হয়; কামনা কণ্টকিত বিষয়াদি ব্যাপারে ফলাকাঙ্খারহিত কর্মদ্বারা কায়িক বাচিক ও মানসিক শুদ্ধি লাভ হয়। কিন্তু ইহার কোন পদ্ধতিতেই আত্মার তৃপ্তিসাধন হয় না। অন্তরের অমৃতময়, অমিত তেজ আত্মপুরুষকে উন্মোচিত করিতে, দরকার আন্তরিক অনুরাগের বিগলিত ভক্তিপ্রীতিতে গুণময়, পরমকল্যাণময় পরমাত্মার নিরবচ্ছিন্ন প্রণিধান এবং ইহাই জীবাত্মাকে যথাথ আহুতি প্রদান বা জীবনের সাধনা।

বেদান্তদর্শনে ভগবানকে যে নির্গুণ ব্রহ্মরূপে বর্ণন রহিয়াছে,-কিংবা উপনিষদে স্বয়ংজ্যোতি, অনন্ত, অব্যয় নিষ্কল যব ব্রহ্মনামাপুরুষ শব্দাদির উল্লেখ,-তাহা প্রাকৃত গুণ সম্পর্কই গ্রহণীয়,-আলৌকিক গুণ বিষয়ে বিবেচ্য নহে। কারণ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যে দিকেই দৃষ্টিপাত করা যায়, সর্বত্রই সৃষ্টিকর্ত্তার অপ্রাকৃতগুণ বা অচিন্ত্যশক্তিমত্তার মঙ্গলময় প্রকাশ,-অথবা মহান উদ্দেশ্যের অচিন্তনীয় অভিব্যক্তি দেখিতে পাওয়া যায়। শিশুর হাস্য, পাখীর শ্রুতিমধুর কলরবে,বিশ্বের যাবতীয় সুধাধারা, সকল প্রীতিধারা,-এই পরমানন্দস্বরূপ উৎস হইতে উৎসারিত হইয়া চরাচর নিখিল বিশ্বকে সঞ্জীবিত ও সুরসিক্ত করিতেছে। জগতের গন্ধ বর্ণে গানে, তাঁহারই অমল অমৃত অবিরত ঝরিয়া পড়িতেছে। যিনি সকল গুণের আকর,-নিসর্গের শোভা যাহার সৃষ্টি, তাঁহাকে নিগুর্ণ কল্পনা,-পুত্রের গর্ভধারিণী আপন মাতাকে বন্ধ্যা বলার মতই অসমীচীন।

অচেতন প্রস্তরমৃত্তিকাদি হইতে আরম্ভ করিয়া উদ্ভিদ, জীবাণু, জলজকীটজ প্রাণী, বিশিষ্ট জ্ঞান ও প্রেম সমন্বিত মনুষ্য পর্যান্ত বস্তুর মধ্যে, তাঁহার আশ্চর্য্য নির্মাণ কৌশলের মহিমগুণ ও বিস্ময়কর প্রেমের পরিচয় পরিলক্ষিত। বন বনানীতে, কুসুম কাননে, গ্রীষ্মের দহ জ্বালায়, বর্ষার আকাশকোণে দোদুল্যমান মেঘপুঞ্জে শরতের মৃদুমন্দ শীতল সমীরণে, হেমন্তের রমনীয় হিমানীতে, রমনীয় শিশিরসিক্ত শীতঋতুতে, বসন্তের অনির্বচনীয় রূপ সৌন্দর্যময় অনিন্দ্যসুন্দর সত্তার সমারোহে, এই আনন্দময় অমৃতস্বরূপেরই (মুণ্ডক ২ | ২ | ৭) মহিমময় প্রেমিক গুণের, তথা জীবকল্যাণের সমুজ্জ্বল প্রকাশিতরূপ নিত্য বর্ত্তমান। তাই সেই অচিন্ত্য গুণময়কে কৃতজ্ঞচিত্তে সতত স্মরণের মধ্যদিয়া আপনাকে তৎপদে নিয়ত নিবেদিত ও তাঁহার প্রিয়কার্য্যে নিজেকে সদা নিয়োজিত রাখিয়া সমগ্র জীবনটি পূজার অর্ঘ্যরূপে সমর্পিত করাই জীবাত্মাকে যথাযথ আহার প্রদান বা জীবজীবনের ধর্মীয় সাধনা।

অতি সূক্ষ্ম বীজ হইতে উৎপন্ন অঙ্কুরকে ক্রমশঃ শাখাপত্রে বিস্তারিত করিয়া, বিশাল মহীরুহে পরিবর্দ্ধিত করিবার বিচিত্র সৃজন পরিকল্পনা,-কুঁড়িকে কোরক ও বিকশিত পুষ্পে প্রকাশিত করিতে সুমহান কুশলতা -গর্ভস্থ ভ্রূণকে পরিপূর্ণ দেহে পরিণত করার অচিন্ত্যনীয় প্রণালী,-শিশু ভূমিষ্ঠ হইবার সাথেই মাতৃস্তনে উপযুক্ত খাদ্য দুগ্ধের সঞ্চার,- মনুষ্য, পশুপাখী সরীসৃপ প্রভৃতি নানাবিধ সৃষ্টজীবের ক্ষুৎপিপাসা মিটাইবার আশ্চর্য্য জনক কতবিধ ভোজ্যদ্রব্য সদা প্রস্তুত,- কতনা রোগনাশক ভেষজ সমাহার,-নানা বর্ণে গন্ধে, আকারে, আস্বাদে নানারকম ফলের আহার্য্য সামগ্রী,-চন্দ্রসূর্য্য, গ্রহতারকার অসীমশূন্যে যথানিয়মে অবাধ আবর্ত্তন,-অনন্ত আকাশে মেঘমালার স্বচ্ছন্দ বিচরণ,-বিশ্বসৃষ্টিকর্ত্তা বিশ্বেশ্বরের কেবল অনন্তশক্তির পরিচায়ক নহে, পরন্তু তাহার অসীম করুণা, অপার মমতা ও বিশাল ঔদার্য্যগুণের পরিচয় বহন করে। তিনি তাই পুত্র হইতে প্রিয়: বিত্ত হইতেও আপনার,-আত্মার অন্তরতম (বৃহদারন্যক ১।৪৮) আত্মীয় তিনি।

নিখিল প্রিয়তার এই পরমকারণ হইতে উৎসারিত প্রিয়ত্ব দ্বারাই দেহগেহাদি অনাত্মপ্রিয় সকলও প্রিয় অনুভূত হয় এবং প্রিয়তার মূলকারণ এই সর্ব্বকারণ স্বরূপ হইতে নৈকট্য ও দূরত্ব বশতঃই ব্যাষ্টি জীবে আনন্দের ও পরমাত্মার প্রতি প্রীতির ন্যূনাধিক্য,-যেমন কমল বিকীর্ণ সৌরভ,ঘ্রাণ গ্রহণকারীর সন্নিধান ও দূরত্ববশতঃ, স্ফুটতর ও ক্ষীণতর হইয়া থাকে কিংবা অগ্নি তৎসমীপে আগমনকারীর শীত অপনয়ন করিলেও, দূরেস্থিত ব্যক্তির শীত নিবারিত হয় না। অতএব স্বতঃই পরমানন্দস্বরূপ ও অখিল আনন্দের পরম কারণ যেই উৎস হইতে উদ্বেলিত হইয়া নিখিল বিশ্ব সঞ্জীবিত; রসসিক্ত ও আনন্দময়,-হিরন্ময় পাত্র রূপ জ্যোতির্ময় সূর্য্যমণ্ডলের অর্থাৎ লৌকিক আধ্যাত্মিকতার (ঈশ-১৫) আবরণ দ্বারা আবৃত সত্যস্বরূপ কল্যাণতমরূপ (বৃহদারন্যক ৫।১৫ | ১) পরাভক্তির স্নিগ্ধালোকে,দর্শনের দিব্য অভিলাষ সঞ্চারের প্রচেষ্টাই তদীয় আশ্রিত জীবের প্রার্থনা, তথা পরমধর্ম।

সেই পরম পুরুষ সর্ব্বজীবহৃদয়ে (প্রশ্নউপ ৬ | ২) বিরাজিত এবং তিনি কাহারও প্রিয় বা অপ্রিয় (গী ৯ | ২৯) নহেন। পরন্তু এই উপলব্ধির অভাব বশতঃই ব্যক্তি বিশেষ আনন্দময়ের অলৌকিক আনন্দের স্পর্শলাভে অক্ষম হইয়া থাকে;-যেমন আত্মভুরিজন অনর্থ পরম্পরায় পীড়িত হইয়া, অন্ধকর্ত্তৃক পরিচালিত অন্ধের ন্যায় (কঠ ১ | ২ | ৫) অতিশয় কুটিল সংসার পথে পরিভ্রমণ করিতে করিতে (মুণ্ডক ১ | ২) আড়ষ্ট মানস লোক ও জড় প্রজনীশক্তিবশে, জীবনের পরম মূল্যবোধ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া নিয়ত ক্লিষ্ট হয়।

উপরোক্ত শাস্ত্র মীমাংসার নিগূঢ় ভাবার্থ হয়ত এই,-দুষ্পূরণীয় বাসনাময়, তামসিক ভাবাপন্ন ব্যক্তিগণ (গীতা ১৬ ১০) বিবিধ বিষয়ভোগের প্রত্যাশা পূরণের অবিরত তড়িলাভে, বিশ্বপতির অনুহীন বিসুক্ত বিভ্রান্ত বা দিব্য বৈভবকে, দম্ভের সহিত বহুভাবাত্মক দেবতা কল্পনায়,-অর্থ ও ধনমান প্রতিষ্ঠা প্রদাতা ইত্যাদি গুণ আরোপের মনঃকল্পিত বিবেচনায়, তাঁহার সচ্চিদানন্দস্বরূপ উপলব্ধিতে বাধা প্রাপ্ত হয়। যদিও অজ্ঞানতাবশতঃ নানা দেবমূর্তির পূজা, অদ্বিতীয় পরম ঈশ্বরেরই উপাসনা (৯ | ২৩) এবং সর্ব্বফলদাতা পরমেশ্বরকে, যিনি যেই প্রকার অভীষ্ট লাভের কামনায় ভজনা করেন,-তাহাকে তিনি সেইভাবেই অনুগ্রহ (৪ | ১১) করেন এবং ইষ্ট ভাবনায় যেই বিশেষ দেবমূর্তি অর্চ্চনা করা হয়,-বৈষয়িক আশা আকাঙ্খার অভিসন্ধানে চঞ্চল চিত্তের স্থিরতা লাভের জন্য, তাহাতেই তাহার অর্চনা নিষ্ঠা (৭ | ২১) প্রদান করিলেও, ইহাতেই ব্রহ্মধ্যানের অধিকারী হইয়া চিত্তের উপর প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা। না। তাই সর্ব্বশেষ নির্দ্দেশ (১৮ | ৬৫) মনটি কেবল পরব্রহ্মের দিকে নিবদ্ধ রাখ।

এই ভগবৎ বাক্য অনুসরণে, ভক্তিশাস্ত্রে বিশেষ অবতারণা এই,-জাগতিক উৎকর্ষলাভের আকাঙ্খায়, ব্যষ্টি প্রকৃতির মানসবৃদ্ধি জাত অশুদ্ধ প্রাণ স্পন্দনের মোহরূপ মলিন অহমিকার উপাসনায় মুক্তিলাভ সুদূর পরাহত হয়। তাই করুণাময় জীবনদেবতা অন্তরতম রূপে প্রকটিত হইয়া, সর্ব্বেন্দ্রিয় পবিত্র করণে বুদ্ধিকে কল্যাণের অভিমুখীন করুন, ইহাই জীবের বাঞ্ছিত প্রার্থনারূপ উপাস্যের প্রকৃত উপাসনা। অপিচ তৈত্তিরীয় উপনিষদমতে (৩ | ১) শরীর, প্রাণ, চক্ষু কর্ণ,মন বাক্ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়; ব্রহ্মোপলব্ধির দ্বার এবং মুণ্ডক উপনিষদের (৩ || ১ | ৮) সিদ্ধান্ত এই,-বুদ্ধি নির্ম্মল হইলেই ব্রহ্মজ্ঞানের যোগ্যতা লাভ হয়,-অর্থাৎ পরিশুদ্ধ অন্তরে ব্রহ্ম চিন্তা পরায়ণ ব্যক্তি পরমব্রহ্মকে দর্শন করেন।

অংশরূপে জীবভাব প্রাপ্ত, ব্রহ্মাংশ জীবের ধ্যেয় ব্রহ্মের, জীব জীবনে ত্রিবিধ বিকাশ। অর্থাৎ অন্তর্জীবনে বা স্বভাবে আধ্যাত্মিক প্রেরণা দাতা, তথা ভোক্তা রূপে 'অধ্যাত্ম' পদবাচ্য,- নশ্বর দেহেন্দ্রিয়দ্বারা প্রাণীমাত্রকেই অধিকার করিয়া, প্রাকৃত জগতে প্রকাশ হওয়াকালীন 'অধিভূত, বিচারিত এবং অন্তঃ প্রকৃতি ও বহিঃ প্রকৃতি মধ্যে, যে অনবচ্ছিন্ন জীবনধারা প্রকাশিত বা গ্রথিত, তাহার সমন্বয় কেন্দ্রে চৈতন্যের সূক্ষ্মতার দীপ্তিতে বিদ্যমান অবস্থায় 'অধিদৈব' সংজ্ঞিত। এই তত্ত্ব শ্রী গীতার অষ্টম অধ্যায়ে প্রথমেই বিশ্লেষিত। উপনিষদ মতে, অদ্বিতীয় চৈতন্যস্বরূপের বা ব্রহ্মের ইহা ত্রিধা প্রকাশ। অর্থাৎ অন্তরের নানাবিধ ক্রিয়াদ্বারা 'অধ্যাত্ম'রূপ,- বাহিরে শব্দ, স্পর্শ ও পার্থিব ভূতবস্তুর উপাদানরূপে, 'অধিভূত' কথিত,-অন্তরীক্ষে

সূর্য্যচন্দ্রগ্রহাদির মধ্যদিয়া অন্তঃ ও বহিঃ জগতের পারস্পরিক সম্পর্ক বিধানকারী রূপে 'অধিদৈব' আখ্যাত,-যাঁহার গভীরধ্যান বা আন্তরিক উপাসনায়, অবিদ্যা অপসারিত হইয়া, তাঁহার সহিত আত্মিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়।

শ্রীমদ্ভাগবত প্রথম স্কন্দ দ্বিতীয় অধ্যায়ে প্রাঞ্জলই বলা হইয়াছে,-একই পরতত্ত্ব, যিনি স্বতঃ প্রকাশিত বা স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানস্বরূপ,- ব্রহ্মরূপে তিনি সর্ব্বময়,-পরমাত্মাভাবে জীবের অন্তরচারী এবং ভগবৎস্বরূপে গোলকের অধীশ্বর। পরন্তু এই ত্রি-তত্ত্বের একীভূত সৎ-চিৎ-আনন্দের মহিমায়, প্রেমিক ভক্তের হৃদয় গুহায় নিভৃতে বাসকারী হৃদয়েশ্বর জীবনদেবতারূপে তিনি জীবের জন্মমরণ প্রবাহরূপ সংসার নিবর্ত্তক বিধায় (১ | ৮ | ৩৬) স্বীয় মঙ্গলাভিলাষী মানবগণের (২ | ৩ | ৩৬) সর্ব্বত্র, সর্ব্বদা, সকল অবস্থায় তাঁহার কথামৃত সর্ব্বান্তঃ করণে শ্রবণীয়, কীর্ত্তনীয় ও স্মরণীয়। ঋগ্বেদে (১০ | ১২১ | ১) উল্লেখ রহিয়াছে,-বিশ্ব যাঁহার দ্বারা পূর্ণ বা ব্যাপ্ত, সর্বভূতের আশ্রয় রূপে আপন অংশভূত সকল দেবতার অধিপতি হইয়া, যিনি পৃথিবী ও আকাশকে স্বস্থানে স্থাপিত রাখিয়াছেন, সেই অস্তিত্বে স্বরূপ অধিদৈবত বা ব্রহ্মাণ্ডের অধিষ্ঠাত্রী একমাত্র পরমদেবতাকেই 'হবন' বা উপাসনা করি।

বস্তুতঃপক্ষে মানবমাত্রেরই নির্ম্মল আনন্দে বিকশিত হইবার বাসনা বা প্রেরণা বিদ্যমান। কিন্তু দৈহিক স্বাচ্ছন্দ্য হইতে প্রাণের আরাম অধিক সুখপ্রদ বিবেচনায়, জাগতিক স্থূল বিকাশে বা পার্থিব অভ্যুদয়ে তার অন্তরের তৃপ্তি নাই। তাই চিত্তের পরিপূর্ণ উল্লাস, তথা জীবনে পরমসুখ ও শান্তি লাভের জন্য, পরমানন্দময় নিত্যসত্তার সহিত আত্মিক সম্বন্ধ স্থাপন প্রয়োজন। উপাসনা এই ভাববৃত্তিকে স্ফূর্ত্ত বা বুদ্ধিকে প্রাণের সুখময় স্পন্দনের কল্যাণরস সম্পদে দীপ্ত করিয়া চিত্তকে আধ্যাত্মিক ভাবাপন্ন করিবার এবং সাধারণ সঙ্কীর্ণ জীবনের ক্ষুদ্রতা হইতে পরিত্রাণ লাভের উপায় হইলেও,-ইহাতেই অন্তঃকরণ বিষয়াকর্ষণ হইতে বিমুক্ত হইয়া, জ্ঞানের নির্ম্মল বিকাশে মানবাত্মার পূর্ণ মহিমায় মণ্ডিত হইতে পারেনা; অন্তরে বিশ্বের দিব্যরূপের ধারণা প্রতিভাত হয় না; ঈশ্বরে লীন বা নিশ্চল স্থিতির পরিবর্ত্তে, তাঁহার নিত্য পার্ষদরূপে প্রশান্তিতে পূর্ণ আনন্দ ও ঐশ্বর্য্যলাভে অন্তঃ প্রবণা জাগ্রত হয় না।

যেহেতু জড়ীয় সৃষ্টি, উদ্ভিদ সৃষ্টি, প্রাণীসৃষ্টি প্রভৃতি সকল ব্যাপারেই বিশ্বস্রষ্টার অনন্তজ্ঞান, অপরিসীম কৌশল, অশেষ মাধুর্য্য, সীমাহীন দয়া, প্রভূত কর্ম বৈচিত্র্যের পরিচয় পাওয়া যায় এবং মানুষের ইচ্ছা, জ্ঞান, প্রেম এই চৈতন্যপুরুষ হইতেই সঞ্চারিত বলিয়া, তিনি স্বয়ং প্রেমিক ও জীবহৃদয় আকর্ষক,-তাই কেবল বিধিবদ্ধ পূজাঅর্চ্চনা, আচার অনুষ্ঠানের উৎকর্ষ, তথা বাহ্যিক শুচিপরায়ণতা

দ্বারাই, মানবিক বৃত্তিগুলিকে দূরীভূত করিয়া, ভাগবতীয় বৃত্তি স্থাপনাদ্বারা,-মানসিক ধারণার অতীত, কার্যকারণ নিয়ন্ত্রিত বিশ্ব হইতে মুক্ত,-আদ্যন্তহীন সেই মহান প্রেমময় ভগবানের সহিত, জীবাত্মার গভীর সম্পর্কের সংযোগ সম্ভব নয়।

যেই সক্রিয় চৈতন্য বিশ্বের অন্তরে বিরাজিত থাকিয়া, অবিশ্রান্ত আত্মপ্রকাশের গতিতে সৃষ্টির বিকাশে ক্রিয়াশীল,-সেই অতীন্দ্রিয় শক্তির প্রভাব যাহার মধ্যে যতটুকু প্রকাশিত, সেই জনেরই অধ্যাত্মবহ্নি ততটুকু উদ্দীপিত এবং সেই ব্যক্তিই উচ্চ অবস্থা প্রাপ্ত। সুতরাং এই শ্রেষ্ঠ কাম্যবস্তুর সহিত অলৌকিক অনুরাগের ভাব রক্ষা বা অন্তরের গভীরতম প্রদেশে তাঁহার প্রেমময় শক্তি স্ফুরণ জন্য, উপাসনা বা বিগ্রহের আরাধনাই যথেষ্ট নয়। এইরূপ প্রক্রিয়া চিত্তমার্জ্জনের একটি সোপান বিশেষ,- অন্তরের কৃত্রিম আবরণ অপসারণের অন্যতম উপায়,-মনের মালিন্য দূর করিয়া, চিত্তকে পারমার্থিক বিষয়ে নিত্য নিয়োজিত রাখিবার শাস্ত্রোক্ত নৈমিত্তিক প্রণালী।

জীবনে ভগবানের প্রতি প্রেমের অনুভূতিই যথেষ্ট নয়। তাঁহাকে জীবনের অঙ্গীকরণ করিতে হইবে, প্রিয়তম পরমাত্মীয় বোধের প্রতিষ্ঠায়। কারণ সাধারণ ধর্মাচরণে ভগবানের সহিত যেরূপ সম্বন্ধবোধের জ্ঞান হয়, তাহা মানসবুদ্ধি প্রসূত,- পরন্তু জীবসত্তার মধ্যে পূর্ণের প্রকাশ উপলব্ধি করিবার যে অন্তর্নিহিত প্রেরণা রহিয়াছে, সেই অধ্যাত্ম অনুভূতিতে সেব্য সেবক ভাবের মধ্যদিয়া, অন্তরে যেই ভাব রসের অবর্ণনীয় আনন্দ সঞ্চার হয়,- ঈশ্বরানুরাগের মধুরসম্পূর্ণ সেই অনুভাব মানস বুদ্ধির অতীত। এই ভগবৎ প্রীতি বা ভগবানে রতি যত পুষ্ট হয়, পরমাত্মার প্রতি আত্মভাব ও নির্ভরতা ততই দৃঢ় হয়। এই অনুরাগের আবেগ কখনও এত গভীর হয় যে, জীব ও ঈশ্বরে ভেদবোধ পর্যন্ত বিস্মরণ হয়,- যদিও এই উপলব্ধিতে জীবের ব্যক্তিত্ব, ঈশ্বরব্যক্তিত্বে লয় বোধ হয় না,-কোন জীবের ইচ্ছা, ঈশ্বরেচ্ছার সহিত অভিন্নবোধ হয় মাত্র,-অর্থাৎ ব্যক্তিক ইচ্ছা, ঐশ্বরিক ইচ্ছা বা ভগবৎ বিধানের সহিত একত্বলাভ করিয়া, সর্ববন্ধন মুক্ত জীবাত্মা মেঘমুক্ত আকাশে পূর্ণচন্দ্রের মত বিরাজ করে আপন মহিমায়।

পক্ষান্তরে বাহ্য আড়ম্বর পূর্ণ বিবিধ উপচারে, হৃদয়ের সঙ্কীর্ণতা বশতঃ ঈশ্বরকে বিশেষ কোন সীমার মধ্যে আবদ্ধ করিয়া উপাসনায় ধার্মিকতার অহঙ্কার আসিয়া, অন্তরকে সঙ্কুচিত করে,-বর্তমান, প্রতিষ্ঠা লাভের আশায় পরমুখাপেক্ষী করিয়া, অন্তহীন পুনরাবৃত্তিরূপ একটি পন্থায় অনুসরণে একই পরিধিতে অনবরত ঘুরায়,- চিত্ত স্থিতিহীন হইয়া পড়ে,-ভগবান অনন্ত কল্যাণ গুণাকররূপে প্রতীত হন না।

কারণ প্রেমহীন হৃদয়ে দয়াময় হরি আসন পাতেন না,-আনন্দকে বিষয়াদি হইতে উৎপন্ন মনে করায়, সংসার তাপদগ্ধ জীবনে আনন্দময়ের অমৃতসুধা বর্ষিত হয় না। গুণ বা ধর্ম, সত্তাকে অধিকার করিয়া থাকে বলিয়াই ঈশ্বরকে বলা হয় গুণাতীত,-তাই সৎ-চিৎ-আনন্দ তাঁহার স্বরূপ, ধর্ম নয়। ভক্তিমিশ্রিত প্রেমের নিগড়েই আনন্দের পূর্ণ প্রকাশ, আনন্দস্বরূপ শ্রীভগবানকে অন্তরে আবদ্ধ রাখা যায়,-যেহেতু ভক্তিরসই তাঁহাকে আকৃষ্ট করিবার উপায় এবং ভক্তিপথই দিব্যজীবন প্রণালী লাভের অতুলনীয় সাধন।

তৈত্তিরীয় উপনিষদ তৃতীয় অধ্যায় ষষ্ঠ অনুবাকের নিম্নলিখিত বর্ণনায় 'আনন্দই ব্রহ্ম' বলা হইয়াছে এবং যাহা কিছু রূপ আনন্দের অভিব্যক্তি, সেখানেই আনন্দময় ব্রহ্মের বিশেষ প্রকাশ। তৎপূর্ববর্তী দ্বিতীয় অধ্যায় চতুর্থ অনুবাকে সিদ্ধান্ত এই,-ব্রহ্মরূপ আনন্দের উপলব্ধিতেই সর্ববিধ ভয়ের কারণ নিবৃত্তি হয় এবং পরবর্তী সপ্তম অনুবাকের মর্মার্থ এই,-রসস্বরূপ ব্রহ্মের অপরোক্ষ আনন্দ সর্বজীবে নিত্য বর্ত্তমান, নতুবা কেহই আনন্দপ্রদ বস্তু, ব্রহ্মের নিত্যোপলব্ধ আনন্দরস অনুসন্ধান করিত না। তাৎপর্য্য এই,-'ব্রহ্ম' অর্থে এমন কিছু নির্দেশ করে, যাহা অন্তরের আনন্দ উজ্জীবিত করিয়া প্রাণকে প্রশান্ত করে। তাই রস সঞ্চয়ের অভাবেই মনে চাঞ্চল্য দেখা দেয়। যেহেতু আনন্দই আত্মার স্বরূপ বা ব্রহ্মই আনন্দ এবং আনন্দই জীবনের মূলসূত্র বা আনন্দদ্বারাই প্রাণমন সঞ্জীবিত'-তাই মানুষ মাত্রেরই আনন্দলাভের আস্পৃহা এবং আনন্দময় আত্মা অন্তরের প্রেমাস্পদ বলিয়া, আত্মলাভ বা আত্মজ্ঞানেই চেতনায় বা অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে অলৌকিক আনন্দরস উদ্ভাসিত হয়। এই দিব্য আনন্দের সঞ্চারে স্বভাবজাত প্রবৃত্তিও শান্তভাব ধারণ করে।

ধনমান বা জাগতিক বিষয়াদিলাভে যে আনন্দ, তাহা ক্ষণিক,- তাহাতে পূর্ণের পদ পরশ নাই বলিয়া, পূর্ণতৃপ্তি হয় না। ধ্যান সমাহিত চিত্ত রসঘন ব্রহ্মভাবনায় অজ্ঞান আবরণ মুক্ত হইয়া, চিত্ত যখন মানসিক আনন্দের অতীত, ব্রহ্মানন্দ উপলব্ধি করে, তখনই পূর্ণপ্রকাশ আনন্দ স্পষ্ট, ভাস্বর ও দীপ্ত। ভক্তিশাস্ত্র বলেন,-বৃক্ষের মূলে জলসেক করিলে যেমন শাখাপত্রাদি তৃপ্ত হয়,-তেমনি সর্বজীবের আশ্রয় ও প্রাণ স্বরূপ, গুণময় নিরাকার পরমব্রহ্মের, মর্ত্যভূমে মূর্ত্তপ্রকাশ, শ্রীকৃষ্ণের ভগবৎস্বরূপের প্রতি ঐকান্তিক আনুগত্য সর্ববিধ কর্মপ্রচেষ্টার অগ্রে পা, তথা আমার আমিত্বকে সমর্পিত রাখিলে, সর্বেন্দ্রিয় পরিতৃপ্ত হইয়া অন্তরে পরাভক্তির উদয়ে পরমানন্দ অনুভূত হয়। কুজ্ঝটিকা যেমন রাত্রির অন্ধকারকে আবরণ করিতে পারেনা; কিংবা খদ্যোতের আলো, সূর্য্যের কিরণে বিলীন হইয়া যায়,-সেইরূপ সদানন্দ ভগবদ্ভক্তের

উপর মায়া প্রভাব বিস্তার করিতে (ভ: ১০ | ১৩ | ১৫) পারেনা এবং পরমানন্দময়ের আশ্রিত এই জনের সংসারজীবনেও কোন বিপদ (১০ | ১৪ | ৫৮) ঘটে না।

শ্রীগীতা অষ্টাদশঅধ্যায় সপ্তমশ্লোকে ফলাকাঙ্খা বর্জিত নিত্যকর্মের অনুষ্ঠান, চিত্তশুদ্ধির হেতুজ্ঞানে ত্যাজ্য নহে উল্লেখে; পরবর্তী পঞ্চান্নশ্লোকে ভক্তিমহিমা প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে,-ভক্তিদ্বারাই শ্রীভগবানের সচ্চিদানন্দস্বরূপ জানিয়া, ভগবদ্ভক্ত নিজেই পরমানন্দ হইয়া থাকেন,-ইহা ভক্তিতত্ত্বের নিগূঢ় রহস্য। নারদসংহিতায় ঈশ্বরের প্রতি পরমঅনুরক্তিই 'ভক্তি' নির্ণীত। শ্রীগীতা (৮ | ২২,১১ | ৫০)ভগবৎবাক্য এই,-ভগবানেরই আনন্দশক্তির একটি বিশিষ্টবৃত্তি 'অনন্যভক্তি' লাভ হইলে সর্ব্বত্র ভগবৎ মহিমা ব্যতীত অন্যকিছু উপলব্ধ হয়না, তাহাদ্বারাই ভগবদগত চিত্ততা প্রাপ্তিতে, ভক্তবৎসল ও ভকতবশ ভগবানের সহিত একাত্মতা প্রাপ্ত হইয়া, দুস্তর সংসারদুঃখ অতিক্রম করা যায়।

তাৎপর্য্য এই, সুগভীর জলাশয় আপন প্রাকৃতিবশে কর্দ্দমাকৃত পলি নিম্নে নিক্ষেপক্রমে, নিজে স্থির অনাবিল রহিয়া, যেমন অনন্ত আকাশের প্রতিফলন যোগ্য হয়,-তেমনি নিত্যশুদ্ধ, অথচ বিষয় সংযোগে মলিন জীবাত্মা,-অব্যভিচারিণী ভক্তি দ্বারা (গী-১৩ | ১১) অর্থাৎ ভগবানই একমাত্র আশ্রয় এই নিশ্চিত বুদ্ধিতে স্থির হইয়া, সর্ব্ববিক্ষেপ ও সর্ব্বাবিলতাশূন্য নিস্তরঙ্গ হ্রদজলের ন্যায় প্রশান্ত ভাব ধারণ করিলে, আনন্দময় ভগবানকে আপনহৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করিবার যোগ্যতা লাভ করে যথার্থ এই, ভক্তিমান জনের নির্মলান্তঃকরণে, ভক্তানুগ্রহকাতর, অশেষকল্যাণগুণময় ভগবান স্বয়ং স্ফুরিত হইয়া থাকেন,-অথাৎ গুণাতীতা একমাত্র পরাভক্তি দ্বারাই গুণাতীত পরমব্রহ্মকে নিশ্চিতরূপে পাওয়া যায়।

ভক্তিরহস্য এমনি বিচিত্র যে, প্রিয়তম পুরুষোত্তমের প্রিয়ত্বে অভিভূত শুদ্ধভক্ত, আপন অনুভূত নির্মলভক্তি রসাস্বাদনের বার্ত্তা, অপর জনগণকে বিজ্ঞাপিত না করিয়া পারেন না। তাৎপর্য্য এই,-উচ্চস্থানে অবস্থিত ব্যক্তি যেমন নিম্নভূমিতে বাসকারী ব্যক্তিদিগকে, জলপ্লাবনে ক্লিষ্ট দেখিয়া, নিজে নিরাপদে থাকিয়াও, তাহাদিগকে সাহায্য করিতে উদ্যোগী হইয়া থাকে সেইরূপ ভক্তির গাঢ়তর ভূমি, পরাভক্তি প্রভাবিত মায়ামোহের উর্দ্ধে স্থিত ভক্তপ্রবর,-সংসারমায়া কবলিত নিমগ্ন জীবনিচয়কে শোক সন্তাপে ক্লিষ্ট দেখিয়া, তাহাদিগকে সংসারবন্ধন মুক্তির মধ্যমধ অবস্থায় উত্তীর্ণ করিতে সচেষ্ট হইয়া থাকেন। ইহাই ভক্তিপূত অন্তর ভগবদ্ভক্তের ব্যবহারিক দিক। স্বর্ত্তণা কুলকুল করিয়া বহমানা নদীর নির্জ্জন কিনারায় বসিলে, তাহার নির্মল শান্ত প্রবাহে যেমন চিত্তের অস্থিরতা কমিয়া, মন আত্মচিন্তনে নিমগ্নহয়,- তেমনি ভগবদ্ভক্তের

সমীপে একান্তে উপবেশন করিলে, চঞ্চল মন প্রশান্ত হইয়া পরমেশ্বরের প্রতি উন্মুখ হয়। ইহা তাঁহাদের ঐশী শক্তির অভিব্যাপ্তি।

যদিও সুপ্রসন্ন সলিল বিশাল বিপুল হ্রদের ন্যায়, ভক্তচিত্ত আপনার ভক্তি ভাবে আপনি বিভোর,-তথাপি 'প্রেমলক্ষণা, ভক্তি উদয়ে মানবআত্মায় যেই মহীয়সী ভক্তিরসাপ্লুত লোকোত্তর প্রেমের অভিব্যক্তি ঘটে, মনোবাক্যে দুর্লভ পরমানন্দের সঞ্চার হয়,-'ক্লেশবাস রহিত স্থিতপ্রসাদযোগ্য' সেই লোকাতীত চিত্তপ্রসন্নতা প্রাপ্তির উপায়,-জগতে ভক্তিবিস্মৃত সংসারাসক্ত নিরানন্দ লোকের মধ্যে প্রসারিত করিতে ভক্তচিত্ত ব্যাকুল হইয়া পড়ে। সারার্থ এই, অতৃপ্ত বাসনাপীড়িত দুঃখদীর্ণ সংসার পথের গুরুভার জীবনব্যাপী বহন করিতে করিতে ভগ্নমনে, আশ্রয়হীন আশ্বাসরহিত শ্রান্তক্লান্ত জীবনে; সর্ব্বসংহারক 'মৃত্যু' এবং অপরিহার্য্য পুনর্জন্ম রূপ 'সংসার আবর্ত্ত' হইতে চিরমুক্তি লাভের 'ভক্তিপথ, প্রদর্শন পূর্ব্বক, সংসার পঙ্কে আবদ্ধ জন সমাজের অন্তর্লোকে অতীন্দ্রিয় ঐশ্বরিক ভাবপ্রবাহ উজ্জীবিত করাও ভগবদ্ভক্তের নীরব কর্ত্তব্য অনুভূতি,-তথা অনিবার্য্য জীবনব্রত।

কালের প্রভাবে বৃক্ষ [illegible] পতন হইলেও, অতিরিক্ত আ[illegible] প্রাপ্তির ন্যায়, নিদাঘের তপন তপ্ত পথচারী যেমন সেই বৃক্ষচ্ছায়ায় শ্রান্তি অপনোদন জন্য আশ্রয়ের অবলম্বন পায় এবং বৃক্ষ হইতে পতিত বীজ আবার বৃক্ষ উৎপন্ন করে,-সেইরূপ চিত্তপ্রসাদ লাভের আশায় অন্তরে ভক্তি লতা বীজ বপন করিলে, কেবল যে ভক্তিমান অন্তঃকরণ পরিতৃপ্ত হয়, তাহা নহে,-উপরন্তু সেই ভক্তহৃদয়ের ছত্রচ্ছায়ায় সংসার তাপদগ্ধ অজস্র নরনারী শান্তিময় প্রেমের সন্ধানরূপ পরামর্শ লাভ করে এবং তাঁহাদের ভক্তিপূত সংসর্গে বহু ভক্তিলাভেচ্ছু ব্যক্তির সমাবেশ ঘটে।

মাধুর্য্যসাগর ভগবানের প্রতি যখন অন্তর আকৃষ্ট হয়, সেইসাথে প্রেমভাবেরও উদয় দেখা দেয়। ঈশ্বরে বিশ্বাস আসিবার পর, যে কর্ম্ম করা হয়, তাহা পরমজ্ঞান হইতে পৃথক নয়। তাই কর্ম্ম, জ্ঞান, ভক্তির মিলিত রমণীয় রূপ হইতে অন্তর মার্জ্জিত হইয়া জীবসেবার যে স্পৃহা স্বতঃই উৎসারিত হয় তাহাতে সমগ্র জীবনই ভক্তিময় হইয়া যায়। সুতরাং ভক্তিযুক্ত চিত্তের কামনাবিহীন কর্ম্ম, অর্থাৎ ব্যক্তিগত লাভ, বাসনাযুক্ত চিত্তের কামনাবিহীন কর্ম্ম, অর্থাৎ ব্যক্তিগতলাভ, বাসনাতৃপ্তি বা বাহ্যবিলাসাদিতে আসক্তি বিহীন কর্ম্মই চিত্তশুদ্ধির উপায় এবং শুদ্ধচিত্তেই পারমার্থিক জ্ঞান সঞ্জাত হইয়া, জ্ঞানের গরীয়সী ভক্তির আবির্ভাব হয়।

যেহেতু সত্তার মাধুর্য্য ও রমণীয়তার সহিত চিদানন্দের নিবিড় সম্বন্ধ তাই অন্তঃকরণটি বাহিরের নীল আকাশের মত নির্ম্মল ও বিষয়াদির সহিত অলিপ্ত

রাখিলে,-চিত্তের স্বাভাবিক গাঢ়তা দূর হইয়া, অনুভূতি প্রত্যয় সম্মিলিত হিরা চেতনার জাগরণে, অন্তরদীপ্তির সহিত বিশ্বদীপ্তির সংযোগ স্থাপিত হয়,-অর্থাৎ অন্তরে ও বাহিরে, ভগবানের কল্যাণরূপ অনুভূত হয়। এই পরম অনুভূতি বা তদীয় শক্তির বোধ অনুভবগোচর হইলেও, বাহিক তাহার সকলের ক্ষেত্রেই সমান হয় না। কারণ আচরণ চালিত হয়, সতজাত পূর্বসংস্কার দ্বারা এবং জ্ঞানের এমন শক্তি নাই যে, পূর্বজন্মার্জিত সংস্কার উন্মূলিত করিতে পারে। অমৃতময় কেন্দ্রিয়বোধে অন্তরের প্রতিষ্ঠিত করিলেই, ভক্তির আতিশয্যে 'ভগবৎকৃপা'র আবির্ভাবে, সঞ্চিত কর্ম ফলপ্রদানে অক্ষম হয়। তাই ভগবানের পরম আত্মীয়রূপ অপ্রাকৃত প্রিয় ভাবের গভীরতাতেই নিহিত, অধ্যাত্মজীবনের উৎকর্ষ, তথা জীব জীবনের পরমসম্পদ। ভক্তিমার্গের অপূর্ব সাধনায় প্রবেশ করিলে, ভগবৎরূপ কেবল ভাবমাত্র হয় না,-তাহা তখন লীলায়িত, স্ফূর্ত্ত, অন্তরে উদ্ভাসিত। অতএব জীবাত্মার এক বিভূতি পরম, হৃদ্দেশে স্থিত পরমকল্যাণময় পরমাত্মাকে স্বীয় অনুভবসিদ্ধ ভাবানুযায়ী, ভক্তিযুক্ত হৃদয়ে নিত্য নিযুক্ত রাখিবার নিয়ত প্রয়াসই মানবাত্মা বা আমার ধর্ম।

শ্রীভগবানের প্রতি, উদার অসীম অনুরাগ বা অহৈতুকী ভক্তি, সংসারের আঘাতবেদনা, অভাব অভিযোগের মধ্যদিয়াই চিত্তকে সমর্পিত করিয়া তোলে, জীবন লাভের কর্ত্তব্যনিষ্ঠার প্রতি। তখন শত্রুঃদুঃখেও জীবন ভাবাক্রান্ত হয় না,- ঈশ্বরের প্রতি অবিচল নির্ভরতা বিচলিত হয় না। অন্তরে যদি ভক্তিরসের সঞ্চার না ঘটে, সেই জীবন জড়পিণ্ডের মত স্থানু, নিশ্চল, বিবেকহীন। ধূলিমলিন পৃথিবীর ক্লেদপঙ্কিলতা; ঈর্ষা দ্বেষ, নিন্দাগ্লানির ঊর্দ্ধে জীবাত্মার স্ব-মহিমায় স্থিতির উদার মহৎ পরমধাম দেবমহিমায় বিরাজিত। সেই মহামহিম জীবনলাভের ভাবনা,-সেখানে অধিষ্ঠিত দেবতসদৃশ মুক্ত পুরুষগণের প্রতি চিত্তের অভিনিবেশ,- সজ্ঞানে আপন ইষ্টদেবতার সেবাপূজা,-অন্তরে তাহাকে সতত স্মরণ,- বাহিরে তাহার অনুসরণ,-প্রকৃষ্ট জ্ঞানের দ্বারা ভগবদ তত্ত্বের উপলব্ধি,-পরিচ্ছন্ন হৃদয়ে ঈশ্বরের প্রতি নিরবচ্ছিন্ন প্রীতি ও অনুরাগের সহিত তাঁহাকেই প্রিয়তমরূপে অন্তরের দৃঢ় অবলম্বন,- জীবিকা নির্বাহের জন্য অনাসক্ত কর্মের ফলপ্রাপ্তি কামনা ভগবানের অর্পিত রাখিয়া, তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধনরূপ দৈহিক প্রচেষ্টা,-বিক্ষিপ্ত মনকে ঈশ্বর চিন্তায় নিবিষ্ট রাখিবার সহজ উপায়, তথা মানুষের ধর্ম।

যেমন আপনা হইতেই নিঃশ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়া চলে,-তেমনিভাবে স্বতঃস্ফূর্তরূপে ভগবৎ ভাবনাকে চেতনায় জাগ্রত রাখিতে না পারিলে, জীবাত্মা স্ব-মহিমায় প্রবুদ্ধ হইয়া উঠেনা,-পরমাত্মার জাগ্রত প্রভাব সংসারের সকল কাজে প্রতিধ্বনিত হয় না,- নিশ্বাসের ন্যায় অন্তর্লীলা ক্রমে নিত্যের সঙ্গ না করিলে দুঃখের দহন দূর হয় না,

চরিত্রে শক্তি সঞ্চার ঘটে না,- বিশ্বব্যাপী নিয়মের সঙ্গে, সাংসারিক শৃঙ্খলার, সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া চলা যায়না,- জীবাত্মায় আরোপিত 'আমি' কেবল ক্ষুদ্রচিন্তা, অলীক বাসনার আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া, সাংসারিক আবেষ্টনে আবদ্ধ রহিয়া যায়,- দিনযাপনের প্রাণ ধারণের গ্লানি বহন করিয়া চলিতেই চিত্তবৃত্তি অভ্যস্ত হইয়া পড়ে বস্তুতঃপক্ষে পূর্ব্ব জন্মকৃত কর্ম অনুসারে জগতে জন্মলাভ করিয়াই যেমন নরদেহে জীবন আরম্ভ,- তেমনি স্বীয় প্রচেষ্টায় স্বার্থের আবরণ হইতে মুক্ত হইয়া, মঙ্গলময় শ্রীভগবানের প্রতি চিত্তের অভিনিবেশ আনয়ন করাই মনুষ্যত্ব বা মানবোচিত সদ্-গুণের সূচনা,- যাহা অমরজীবন বা অমৃতত্বলাভের অবলম্বন, তথা 'আমার'স্ব-ধর্ম বা নিত্য কর্ত্তব্যের অন্তর্গত।

শ্রীভগবান অন্তহীন, নিত্যই নূতন,- তাই কোনভাবেই তিনি পুরাতন হননা,- তিনি বিচিত্রভাবে, সর্ব্বদেশে, সকল সময়ে, সর্ব্বত্র বিরাজিত,- পরমাত্মরূপে প্রাণী-গণের হৃদয়ে সতত প্রতিষ্ঠিত তিনি,- তিনি আমাদিগেকে ছাড়িয়া নাই,- আমারই তাঁহাকে অনুভবে ধরিয়া রাখিতে প্রয়াস করিনা। তাঁহার অধিষ্ঠান যদি অন্তরের উপলব্ধিতে অব্যাহত রাখা যায়, তবে সেই মহানপুরুষকে মৃত্যুর পরও জাগ্রত অনুভূ-তিতে লাভ করা যাইবে। তাই সমস্ত জাগতিক বাসনাকে নিরস্ত করিয়া, যাবতীয় সংসার প্রবৃত্তির মূলোচ্ছেদ ঘটাইয়া, সেই পরমেশ্বরের প্রতি অনুপ্রেরণা অন্তরে চির উজ্জ্বল রাখিয়া, তাঁহাকেই অদ্বিতীয় বন্ধু জ্ঞানে, জীবন কণ্টক পথ অতিক্রম করিতে হইবে,- যাহাতে সুখে দুঃখে ধৈর্য্যধারণ সম্ভব হয়। কারণ ভগবান হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া চলিলে, জীবাত্মা তাহার দৈবীসত্তাকে অটুট রাখিতে পারেনা বলিয়া, নিসর্গের শোভা বা প্রকৃতিপ্রভাব বশতঃ পরমাত্মার প্রতি জীবাত্মার সহজ সরল আত্মসমর্পণ ব্যাহত হয়,- জীবন হয় বিকাশের সম্ভাবনাহীন তাসমান কার্পাস বীজের মত। ফলতঃ সংসার বিমুগ্ধ বহির্মুখী মন জগতের তরঙ্গ আঘাতে দোলায়িত হইয়া বাহিরের ব্যাপার কেই অন্তরে লালন করিয়া চলে, উপনিষদে ইহাকে জীবের 'মহতী বিনষ্টি' বলিয়া অভিহিত।

এই জড় জগতে যাহা কিছু বাহিরে প্রকাশিত, তাহাদিগকে জানিবা রবুঝিবার জন্য যেমন প্রাণীদেহে বিভিন্ন ইন্দ্রিয়াদি রহিয়াছে,- তেমনি যাহা স্থূল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়, তাহার উপলব্ধির জন্য গভীরতর অন্তরিন্দ্রিয় বিদ্যমান,- যাহা কেবল জন্ম জন্মান্তরের সাধনায় বিকশিত জীবাত্মায় সম্যকরূপে সমাহিত। সেই অন্তরতর ইন্দ্রিয়ের ক্ষুধা যেমন অতীন্দ্রিয়, খাদ্যও তেমনি অপার্থিব,- ক্ষুন্নিবৃত্তির পদ্ধতিও অপ্রাকৃত তৃপ্তিলাভও ইন্দ্রিয়াদির অগোচর, অলৌকিক। জীবাত্মা, পরমাত্মাব

সহিত যোগে যুক্ত হইলেই এই পরমানন্দের উৎস উন্মুক্ত হইয়া জীবন নিবিড় সুধায় ভরিয়া যায়। তাই প্রত্যহ পরমাত্মাকে চিন্তায়, স্মরণে ধরিয়া রাখাই তাঁহার সহিত মিলিত থাকিবার পন্থা এবং আনন্দময়, অমৃতস্বরূপকে নিরন্তর অন্তরে জাগরূক রাখাই, তাঁহার সার্থক উপাসনা। সুতরাং সেই অধরাকে ধরিবার, অগোচরকে জানিবার,- ইন্দ্রিয়াতীতকে অনুভূতিতে আনিবার ঐকান্তিক প্রচেষ্টাই জীবের ধর্ম।

জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিগণ পশুপাখীর মত বহিরিন্দ্রিয় দ্বারা প্রাপ্ত, ক্ষণ স্থায়ী সুখ লাভে তৃপ্ত থাকিতে পারেন না। কারণ যাহা'ভূমা' অর্থাৎ মহান, সর্বশ্রেষ্ঠ বা অমৃত (ছাঃ ৭।২৩।১) তাহাতেই নিত্যসুখ নিহিত। ইহলোকে সুখ বা মহিমা বুঝাইতে, বস্তু বা ঐশ্বর্য্যের উপর প্রতিষ্ঠা নির্দ্দেশ করে। পরন্তু'ভূমা' আপন মহিমায় (স্বে মহিম্নি) প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং ভূমা বা পরমাত্মাকে অন্তরে আবদ্ধ রাখিলেই আত্মদৃষ্টির উন্মেষে ভূমানন্দ বা ব্রহ্মানন্দ অধিগত হয়। কঠোপনিষদ দ্বিতীয় অধ্যায় প্রথমবল্লীর প্রথমেই উল্লেখ রহিয়াছে,-অল্পবুদ্ধি ব্যক্তিগণ বাহ্যভোগ বিষয় সমুহের অনুগমন করিয়া, অন্তরাত্মার আনন্দলাভে বঞ্চিত থাকে,-যেহেতু বহির্মুখ ইন্দ্রিয়াদির নিকট পরমাত্মার পরমানন্দ স্বরূপ প্রকাশযোগ্য হয় না।

তাৎপর্য্য এই, অগ্নি ও অগ্নির প্রকাশ যেমন অভিন্ন,- আত্মা ও আত্মজ্যোতি তেমনি ভেদরহিত। পরন্তু সূর্য্যের প্রকাশেই যেমন ক্ষুদ্র বৃহৎ বস্তু দৃষ্ট হয়, তেমনি আত্মজ্যোতি দ্বারাই ব্যক্তিগত বুদ্ধির বিকাশ হইলেও, সংসার মোহগ্রস্ত বহির্ম্মুখী মন পরমাত্মাকে অনুভব করিতে পারেনা,-যেমন অন্তরালে আবদ্ধ ব্যক্তি সূর্য্যালোক হইতে বঞ্চিত থাকে। এই প্রসঙ্গে মুণ্ডক উপনিষদ তৃতীয় মুণ্ডক প্রথম খণ্ডের অষ্টম মন্ত্র অনুধাবনীয় যে,-বুদ্ধি নির্মল হইলেই লোক ব্রহ্মজ্ঞানের যোগ্যতা প্রাপ্ত হইয়া, ব্রহ্মানন্দ লাভ করে। পরবর্তী দ্বিতীয় খণ্ডের তৃতীয়মন্ত্র প্রাসঙ্গিক উল্লেখযোগ্য যে,- বহু শাস্ত্র জ্ঞান, প্রগাঢ় মেধা ও অনেক উৎকৃষ্ট উপদেশ শ্রবণ দ্বারা আত্মাকে অবগত হওয়া যায় না,-পরন্তু বিশুদ্ধচিত্তে ঐকান্তিক ভাবে আত্মলাভ প্রার্থনাই, আত্মাকে লাভ করিবার বা আত্মবিৎ হইবার সর্ব্বোত্তম উপায়। সুতরাং ইহাই নিরূপিত হয় যে,-অবিশ্রান্ত ভাবে পরমাত্মার স্মরণ দ্বারা, অন্তরমা,জ্জিত, বা অন্তর্মুখী করিয়া, চিত্তের নির্মলতা সম্পাদনই 'মানবের ধর্ম,।

চক্ষুর সহিত সংযুক্ত অন্তঃকরণ বৃত্তি, আত্মার জ্যোতিদ্বারা প্রতিভাসিত হইলেও, ইহা লৌকিক দৃষ্টিরূপে অভিহিত,- যেহেতু তাহা বিষয়াকারে রঞ্জিত হয় এবং তাহার উৎপত্তি ও বিনাশ আছে পক্ষান্তরে আত্মদৃষ্টি উৎপত্তি ও বিনাশ-

হীন,-ইহা আত্মারই স্বরূপ। চিমনীতে আচ্ছাদিত প্রজ্জ্বলিত প্রদীপ, যেমন লৌকিক জ্ঞানের দ্বারা দৃষ্টবা প্রকাশিত হইয়ও, ঐ অগ্নিশিখা অগ্নি জ্ঞানকে প্রকাশ করিতে পারে না,-পরন্তু আবরণ মুক্ত হইলে, নিজশক্তিতে গৃহাদি দগ্ধ করিতেও সক্ষম হয়,-তেমনি বহিরিন্দ্রিয় দ্বারা বিজড়িত লৌকিক বুদ্ধির জ্ঞানদ্বারা আত্মাকে বিদিত হওয়া যায় না। পরন্তু ইন্দ্রিয়াদির আবেশ বা বন্ধনমুক্ত হইলে, স্বমহিমায় স্থিত জীবাত্মা আত্মজ্যোতিতে ভাস্বর হইয়া প্রাণ মনবুদ্ধিকে দিব্য আলোকে উদ্ভাসিত করিয়া আত্ম দর্শনের যোগ্য করে। সুতরাং জীবাত্মা বুদ্ধির বিকার নহে। লালকাচে প্রতিফলিত আলোককে, যেমন কাচের রক্তিমা হইতে পৃথক করা যায় না,- সেইরূপ বুদ্ধিতে প্রতিবিম্বিত আত্মজ্যোতিকে বুদ্ধির সহিত অভিন্ন বোধ হয়।

সারার্থ এই,- দর্পণাদিতে আলোকের প্রতিবিম্ব, যেমন তাহার আকৃতি ও বর্ণ পায়,- তেমনিভাবে বুদ্ধিতে উপহিত আত্মাও ব্যকৃতি বিশেষের বুদ্ধি সদৃশ হন, অর্থাৎ বহির্মুখীন ইন্দ্রিয়াদির সহিত অন্বিত থাকাই, জীবাত্মার জন্মমৃত্যু রূপ বন্ধন দশার হেতু। অগ্নি সবকিছু ধ্বংসের কারণ হইলেও, জল যেমন তাহার অবসানের অন্যতম কারণ,- তেমনি বহির্মুখীনতা জীবের সংসার বন্ধনের হেতু হইলেও, চিত্তের অন্তর্মুখীনতা বন্ধনদশা হইতে মুক্তিলাভের সহায়ক। এই প্রসঙ্গে কঠোপনিষদ দ্বিতীয় অধ্যায় দ্বিতীয় বল্লী চতুর্দশ মন্ত্রের উপদেশ অনুধাবনীয়,-মানবহৃদয়ে যে সকল কামনা আশ্রিত রহিয়াছে, তাহারা যখন বিশীর্ণ হয়, অর্থাৎ দেহরক্ষার উপযোগী অন্নপানাদির কামনা ব্যতীত, অন্য কোনও কামনা থাকেনা, তখনই মরণধর্ম্মা মানুষ অমর হয়। তাৎপর্য্য এই,— জীবিতাবস্থাতেই বুদ্ধির বন্ধনসমূহ বিনষ্ট অবস্থায় স্থিত হইয়া, জীব ব্রহ্মানন্দে বিভোর থাকে।

জীবাত্মার বন্ধনমুক্তি বাহ্যিক ক্রিয়াদি দ্বারা লভ্য নয়। কেনোপনিষদ দ্বিতীয়খণ্ড চতুর্থমন্ত্রে, তাই উল্লেখ, যোগ তপস্যা প্রভৃতি সাধনাদ্বারা যে জ্ঞান লাভ হয়, তাহা অনিত্য হেতু তদ্দ্বারা আত্মাকে লাভ করা যায়না; কেবল চিত্তের উৎকর্ষ সম্পাদন মাত্রপরন্ত হয় আত্মনিষ্ঠা জনিত যে জ্ঞান, তাহা আত্মা হইতে ভিন্ন নহে বলিয়া, তৎসহায়ে স্বাভাবিক অমৃত স্বরূপ আত্মা সম্বন্ধীয় ভ্রম অপসারণ, অর্থাৎ অজ্ঞানতা বিনাশরূপ আত্মোপলব্ধি হয় এবং আত্মজ্ঞানের পূর্ণ প্রকাশই পরমানন্দের মূর্ত্তরূপ। অতএব ইহাই প্রতিপাদিত হয় যে, — কেবল আত্মার শরণ লইলেই অমৃতত্ব লাভে। যোগ্যতা হয়; অন্যরূপে নহে।

বিশ্ব স্রষ্টা বিশ্বব্যাপী বিপুল সমারোহ ও বিচিত্র বৈচিত্র্যের যাবতীয় সৌন্দর্য্য, কলা-কৌশলের মধ্যদিয়া, কেবল জগৎসংসারেই অবস্থিত, তাহানহে, তিনি বহিঃবিশ্বেও

পরিব্যাপ্ত থাকিয়া বিশ্বের অতীত হইয়া রহিয়াছেন। তিনি সর্ব্বগত, সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বদ্রষ্টা, সর্ব্বতোমুখ, অর্থাৎ সর্ব্বদিকেই যেন তাঁহার মুখ। বৃহদারণ্যক উপনিষদ তৃতীয় অধ্যায়ের অন্তর্যামী কারিকায় উল্লেখ এইরূপ যে,— যিনি পৃথিবীর অন্তরে বর্ত্তমাণ থাকিয়া, সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করিতেছেন; সেই অমৃতস্বরূপ সর্ব্বপ্রাণীর অন্তরেও পরমাত্মা রূপে বিশেষভাবে বিরাজিত। শ্রীগীতা অস্টাদশ অধ্যায় ছেচল্লিশ শ্লোকে বলা হইয়াছে, সর্বান্তর্যামী পরমেশ্বর হইতেই প্রাণীগণের উৎপত্তি বা কর্মপ্রচেষ্টা এবং তিনি সমগ্র বিশ্বে ব্যাপ্ত থাকিয়া যাহাকে যেই কর্ম্মে স্থাপন করিয়াছেন, তাহাই বিধি নির্দ্দিষ্ট কর্মজ্ঞানে যথাসাধ্য নিষ্ঠার সহিত সম্পাদন করিয়াও অন্তঃকরণ শুদ্ধি, তথা ঈশ্বরের উপাসনা করা হইয়া থাকে।

উপরোক্ত আলোচনার এইরূপ সরলার্থ করা যায় যে, ভুবনেশ্বরের ভুবনভরা এত যে আয়োজন, ইহা তাহার প্রতি জীবের প্রেমকেআকর্ষণ করিবার জন্যই প্রস্তুত। কারণ মানবহৃদয়ে যে প্রেমবৃত্তি রচিত, তাহা তাঁহারই করুণার প্রকাশ,— যেমন তাঁহারই প্রেমস্পর্শরূপে দক্ষিণ সমীর দেবে অমৃতক্ষরণ করিতেছে। সুতরাং জীব হৃদয়ে স্থাপিত ভগবৎ প্রেম, ত্রিভুবনেশ্বরের প্রতি অর্পিত না হইলে প্রীতিহ নিত্যান্ত মিথ্যা প্রতিপন্ন হইয়া ধনজন, যশমানের দিকে তাহা প্রসারিত হয়। পক্ষান্তরে জীব চিত্তই যে জীবন দেবতার সহিত যুক্ত হইতে চাহিতেছে, তাহাই মাত্র নহে, জীবন বল্লভ, জীবহৃদয়ে অর্পিত প্রেম তাঁহার প্রতি প্রত্যর্পিত করাইবার জন্য, নিজে ও ব্যাকুল সুতরাং সংসার কর্মযজ্ঞের ধুমরাশি হইতে ভগবৎ প্রীতির হোমবহ্নি শিখাটিকে মুক্ত রাখিতে হইবে। এবং ইহাই জীবের সর্ব্ব প্রযত্নে আচরণীয় ধর্ম।

ঈশ্বরেরদ্বারা সবকিছু আচ্ছন্ন হইয়া আছে,— এই জ্ঞান লাভ হইলে, বিষয়কর্ম মুখ্য না হইয়া, বিষয়াতীত বস্তুর সন্দলাভের লালসা আসিয়া যায়। তাই জীবের ধর্ম, নিজেকে পরমাত্মার অংশ জ্ঞানে, সেই পরমানন্দময়ের প্রতি ঐকান্তিক বিশ্বাসরূপ আত্মসমর্পণের একটি দৃঢ ও প্রশান্ত স্থিরতায় অনবচ্ছিন্ন ঈশ্বরানুভূতিতে অন্তর্ব্যাপ্ত হইয়া জাগতিক কাজকর্ম্ম, বিষয়ভাবনা, তাহারই উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করিয়া অন্তরের অন্তরে ভাগবতীয় ভাবের পবিত্রতাকে শুদ্ধভাবে উপলব্ধি করা। তবেই পরমাত্মার প্রসন্নতা যাবতীয় কর্ম্মে, সমস্ত চিন্তায়, সকল বাক্যে, সমগ্র জীবনে, সমুদয় আচরণে, অলক্ষ্যে বিকীর্ণ হইয়া, বুদ্ধিকে প্রশান্ত ও অন্তঃকরণ মালিন্য মুক্ত করিবে। তখ পরমাত্মার সহিত বিচ্ছেদরূপ সঙ্কট অপসারিত হইয়া, জীবাত্মা আশ্রিত এই পার্থিব দেহই অমৃতের পবিত্র পাত্র, তথা ভাগবতীয় পূত তনুতে পরিণত হইবে। ফলতঃ সমগ্র জীবন পর্য্যাপ্ত নিবেদনের অলৌকিক আনন্দগরিমার আত্যন্তিক উপলব্ধিতে পূর্ণ হইয়া,

মরণশীল মানব চিরদিনের জন্য সার্থক্য লাভ করিবে।

আত্মনিবেদিত জীবাত্মার প্রেরণা পরমাত্মা হইতে উৎসারিত হইবার ফলে চিন্তাধারা মহৎ হইয়া সর্ব্ব সংস্কারমুক্ত মানসিকতা প্রাপ্তিতে, সংসারযাত্রা নির্ব্বাহের জন্য শারীরিক ও মানসিক কর্মপ্রচেষ্টা, কেবল আপন স্বার্থ চিন্তাতেই নিয়োজিত না থাকিয়া, অপরাপরের সুখসুবিধার প্রতিও মনোযোগ রাখিয়া চলে। লক্ষণীয় যে কর্মে যখন স্বার্থ সিদ্ধি ও নিজ লোভ তৃপ্তির প্রতি লক্ষ্য থাকে, তাহা বন্ধনের কারণ হইয়া চিত্তকে পারমার্থিক চিন্তা হইতে সরাইয়া রাখে এবং চিত্তের যেই ভাববৃত্তিতে কর্মে। প্রেরণা পরমাত্মা হইতে আগত হইয়া, ফলপ্রাপ্তির নির্দ্ধারণও তাঁহাতেই সমর্পিত থাকে,— লোভ ও লাভের বাসনাহীন সেই বিশুদ্ধকর্ম বন্ধনমুক্তির সহায়ক হইয়া থাকে। সুতরাং ইহাই নিরূপিত হয়,— পরমাত্মার উদ্দেশ্যে সর্ব্বকর্মফলস্পৃহা সর্ব্বদা সমর্পিত রাখিয়া যথালব্ধ বিষয় ভোগ দ্বারা জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করাই প্রকৃত ধর্মবোধ বা সংসারী লোকের হিতকর ব্রত।

দৃশ্যমান বিশ্বব্রহ্মাণ্ড, তথা নিখিল মানবসংসার ব্রহ্মের সীমারূপ ইহা দেহাভিমানী জীবাত্মার কর্মক্ষেত্র বা ভোগভূমি। ইহা মনোগত উপলব্ধির জগৎ বলিয়া, অশাশ্বত, বিনাশী, চঞ্চল। পক্ষান্তরে জগৎপরিচালনার ক্ষেত্রে, ব্রহ্ম, পরমাত্মা বা ভগবান অসীমসত্তা হইয়া, প্রতিটি জীবের ইন্দ্রিয় প্রাণমনবুদ্ধি বিশিষ্ট সীমিত সত্তার মধ্যে অধ্যাত্ম প্রেরণা বা বিবেক উদ্ভাবিত করিয়া, তাদের চিত্তকে তাঁহার দিকে আকর্ষণ করিতেছেন। ইহাই সীমার মধ্যে অসীমের লীলা বিলাস। উল্লেখযোগ্য যে, জীব জীবনের শেষ প্রাপ্তি, ঈশ্বর তুল্যতা লাভ করিয়া, তাঁহার প্রিয় হইয়া, নিত্যধামে নিত্যলীলায় সঙ্গী হওয়া। যেহেতু জীবকে জন্ম জন্মান্তরের বিবর্ত্তনের মধ্যদিয়া অপ্রাকৃত লীলা সঙ্গীরূপে পরিণত করিতেই, এই সৃষ্টি লীলা এবং একমাত্র পরাভক্তির অধিকারী হইলেই, জীবের পক্ষে লীলা সহচর গণ্য হওয়া যায়,-তাই নিরন্তর পরমাত্মার চিন্তা এবং তাঁহার মহিমা ধ্যানই উপরোক্ত উচ্চভূমিতে উপনীত হইবার যথাযথ উপায়। পরন্তু বিক্ষিপ্ত চিত্তের নিষ্ঠা বিহীন উপাসনা বা সংসার আসক্তি দ্বারা বিঘ্নিত সাধনায়, হৃদয়গুহা মধ্যে বিরাজমান উর্দ্ধবৃত্তিবাদের নিগূঢ় তত্ত্বরূপ পারমার্থিক অভীষ্ট বস্তু লাভ হয় না,-অর্থাৎ অলক্ষ্যে থাকিয়া যিনি আমাদের ভালমন্দ, শুভাশুভ নিয়ন্ত্রণ করিতেছেন, তাঁহার প্রতি অনুরাগ আসে না। সুতরাং মানবিক বোধের জগতকে অতিক্রম করিয়া, চৈতন্যময় পরম অস্তিত্ববোধের অতিমানসিক চেতনার ভূমিতে উত্তরণ ঘটিলেই, অনির্ব্বাচনীয় দিব্য অনুভূতিতে,মন প্রাণ দিব্যচেতনার আধারে রূপান্তরিত হয়। এই তত্ত্বজ্ঞান শাশ্বত, অবিনাশী, নিত্য

স্থির। এই অবস্থার নিশ্চল স্থিতিতে সসীম জীবজবনে অসীমের অধিষ্ঠানে বা প্রত্যক্ষ পরিচালনা, অথবা সার্থক অনুপ্রেরণা, আর অগোচর থাকেন,-দিবসে আলোকের মত প্রতিভাত হয়। তাই ধীশক্তির প্রেরণদাতা সেই বরণীকে প্রিয়ভাবে সততা স্মরণ বা ধ্যান করাই, মানবের কর্তব্য কর্ম,-যেহেতু ইহাতেই নিহিত নিবেদিত উপাসনার দ্যোতনা।

জীবদেহ জড় স্বভাব,-অর্থাৎ আপনা হইতেই তাহার বৃদ্ধি বা পরিবর্তন হয় না। দেহ চৈতন্যযুক্ত হইলেই দেহেন্দ্রিয়াদি ক্রিয়াশীল হয়,-পীড়াগ্রস্ত দেহে উদ্বেগ দেখা দেয়,-আঘাত লাগিলে চেতনা লুপ্ত হয়। সুতরাং জড়দেহ স্থিত জড়ীয় 'মন' কে চৈতন্যবিশিষ্ট করিয়া, শক্তিতে রূপান্তরকারী অধ্যাত্মতত্ত্ব বা চিৎবস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়,- তিনি বিশ্বের মূলতত্ত্ব বা বিশ্বাত্মা তাহারই প্রকাশে জীবাত্মায় প্রাণ সঞ্চারিত হইয়া, সমগ্র দেহে চেতনা বা ক্রিয়াশক্তি অভিব্যক্ত এবং জীবে ভাগবতীয় ভাবনার উন্মেষ। কাজেই জড়বস্তু নিশ্চেতন নয়, পূর্ণব্রহ্মেরই সুপ্ত প্রকাশ, যেন তাঁর মূর্চ্ছিতাবস্থা। প্রাণের মধ্যে প্রসুপ্ত এই অতিমনস চেতনাকে, দিব্য চেতনার আধারে রূপান্তরিত করাই জীবের প্রকৃত জীবনীয়। কারণ বিশ্বাত্মার সহিত মানসিক চেতনায় যুক্ত হইলে কেবল যে মনের প্রসার ঘটে, তাহাই নহে, পরন্তু জীবত্বের ক্ষুদ্রতা ও অল্পতা, ঐশ্বরিক শকতির অপ্রতিহত আবেশে মুক্তাত্মার উদার প্রশান্তির অনুপম আনন্দে দ্যোতিত হয় এবং এই মানস মুক্তি কর্মের, মর্মের ও ধর্মের,-যেহেতু সংবেদনহীন আনন্দই শাশ্বত আনন্দের স্বরূপ। সুতরাং সারাদিন মান সম্পূর্ণ চিত্তকে বিশ্বাত্মার দিকে উন্মুক্ত রাখাই জীবনের হিত সাধনা।

এই অনিত্য সংসারে অবশ্যই কোন নিত্যবস্তু রহিয়াছে,-যাহার সহিত যুক্ত হইলেই,-মানবচিত্ত শান্তি লাভ করে। তাঁহাকে বাক্য দ্বারা প্রকাশ করা যায় না, কিন্তু তাঁহার দ্বারাই বাক্য প্রকাশ পায়। চক্ষু তাঁহাকে দেখিতে না পাইলেও, দর্শনশক্তি তাঁহারদ্বারাই দৃষ্টিপ্রাপ্ত,-অন্তঃকরণ উদ্ভাসিত এবং জড়ীয় প্রাণমন ইন্দ্রয়াদি (কেন-উপ ১।৬) তাঁহারই অধীন। যেমন অচেতন কুঠার সচেতন কাঠুরিয়া হইতে ভিন্ন,-তেমনি অনুমানে প্রাণের প্রাণ, মনেরও নিয়ন্তা, শাশ্বত ও অনাদি ব্রহ্মকে নিশ্চিত রূপে (বৃহ-৪।৪।১৮) জানা যায়। তিনি পরমপদ প্রাপ্তি জন্য অন্তঃকরণে প্রেরণা প্রদাতা শ্বে-শ্ব ৩.১২) রূপে, আমাদের সত্তাসত্তা বা আত্মাকে, সততই তাঁহার দিকে আকর্ষণ করিতেছেন। তাই জীবদেহধারী, আমি অভিমানী জীবাত্মা,-সেই পরমাত্মা পরমেশ্বরের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া, তাঁহার নিত্য সান্নিধ্যলাভের জন্য, কেবল যে অন্তরের অন্তরে সতত উৎসুক, তাহা মাত্র নহে,-পরন্তু ইহাতেই তাহার আনন্দ এবং এই

সুখময় অবস্থাই জীবের আত্মস্বভাব বা জীবাত্মার প্রকৃতিগত ধর্ম।

ইন্দ্রিয়, প্রাণমন ও বুদ্ধিকে আশ্রয় করিয়া মানবের যে ব্যক্তিগত প্রকৃতি, তাহা জন্মান্তরীণ সংস্কার অনুযায়ী সৃষ্ট,- তাই বুদ্ধিবৃত্তি প্রাক্তন কর্মানুসারী হইয়া থাকে। জীবাত্মার সহিত এই প্রকৃতি বা স্বভাবজাত গুণকর্মাদির কোনরূপ যোগ (গীঃ ১৩। ৩০) নাই। জীবাত্মা নিজে কোন কর্ম্ম করেন (গী ৪। ১৪) না, কর্মফল ভোগও নাই। তিনি দেহাভিমানী সংস্কার আহিত 'আমি'র চেতনাপ্রদানকারী এবং আপনাতে অভিব্যক্ত চৈতন্যের আভাসদ্বারা কর্মানুগামী বুদ্ধিবৃত্তি পরিব্যাপ্ত করিয়া, তাহাকেই অনুসরণ করিয়া চলেন। যেহেতু 'আমি' প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তির কর্ত্তা নহি,- এইরূপ বুদ্ধিযুক্ত ব্যক্তিই জ্ঞানী (গী ৪।১৮। এবং তাঁহার অপ্রাপ্তবস্তু প্রাপ্তি ইচ্ছারূপ 'কাম' ও প্রাপ্তবস্তুতে অশক্তিরূপ 'রাগ' নাই,- তাই আত্মজ্ঞানী কর্মে নিরত থাকিয়াও কর্মবন্ধন মুক্ত যেমন পদ্মপত্রকে জল আর্দ্র করিতে (গী ৫।১০) পারে না। অপিচ, আত্মজ্ঞান ব্যতীত পুনর্জন্ম রোধ (গী ৮।১৬,৯।২১, । ১৫।৪) হয় না। ইহা এমন একটি ভাবসমৃদ্ধি, যাহা মানুষকে দেবত্বে উন্নীত করে। সুতরাং আত্মজ্ঞান লাভের প্রচেষ্টাই মানবজীবনে প্রধান ধর্ম।

মুণ্ডকোপনিষদ প্রথম মুণ্ডক প্রথম খণ্ডের সপ্তম এবং দ্বিতীয় মুণ্ডক প্রথমখণ্ডের প্রথম প্রকরণ সিদ্ধান্ত মতে, মাকড়সা যেমন আপনা হইতে অভিন্ন তন্তুজাল রচনা করিয়া চলে,- পৃথিবীতে ওষধি সমূহ জাত হয়,- সজীব মনুষ্যদেহে বিজাতীয় কেশ ও লোম নির্গত হয়,- কিংবা প্রজ্বলিত অনল হইতে, অগ্নির সজাতীয় সহস্র সহস্র অগ্নি কণা উত্থিত হয়,ৎ তদ্রূপ জীবাত্মা হইতে, কারণান্তরের অপেক্ষা না করিয়া, প্রাণাদির নির্গমন হইয়া থাকে। বায়ুবেগে যেমন উক্ত জালের সূক্ষ্ম আবরণ এবং উদগত স্ফুলিঙ্গ সংহত হইয়া পড়ে,- তেমনি পারিপার্শ্বিক অবস্থা প্রভাবে কিংবা দৈববশে বুদ্ধিবৃত্তি যখন সঙ্কুচিত হয়,- জীবাত্মাও তখন কুণ্ঠিত বা অপ্রসারিত হইয়া পড়েন। ইহাই জীবের নিদ্রা বা প্রাণকর্ত্তৃক রক্ষিত দেহের অচেতন অবস্থা। জাগরণকালে বুদ্ধির যখন বিকাশ বা অভিব্যক্তি হয়, তাহা জীবের ভোগকাল।

দেহের সুষুপ্তিকালে অসুপ্ত ও সংসার ধর্ম ব্যতীত, কেবল বাসনাময় অন্তঃকরণ বৃত্তিরূপে প্রকাশিত জীবাত্মা, বাসনাকার বিবিধ বস্তু নির্মাণ করিয়া (বৃহ ৪।৩ ১১-১৩) বাহ্যবিষয় বিরহিত মনকে, স্বপ্নযোগে ভোগ করান এবং পুনরায় জাগরিত অবস্থায় ফিরিয়া আসেন। স্বপ্নদর্শনকালে বাস্তববৎ অনুভূতির জন্য যে আলোকের আভাস দৃষ্ট হয়, তাহা স্বয়ং জ্যোতি আত্মা হইতে সৃষ্ট। আত্মার জ্যোতি অবভাসিত মন স্বপ্ন দেখে বলিয়াই, ইহাতে জীবাত্মার কর্ত্তৃত্ব আরোপিত হয় কিংবা কর্মফল

ভোগ্যের হেতু বলিয়া কর্তৃরূপে কথিত হন। স্ব প্নাবস্থায় দেহেন্দ্রিয়াদির ক্রিয়া না থাকায় পাপপুণ্যও অর্জ্জিত (বৃহ ৪।৩ উপ৩।১৫)হয় না,- কেবল সুখকর বা দুঃখদায়ক সাময়িক ভোগ বা জাগ্রতকালে কৃত পাপপুণ্যের ফলদর্শনহয় মাত্র। দুরদৃষ্ট বশতঃ জাগ্রতাবস্থায় মানুষ যে সকল ভয় বা বিপদের অধীন হয় কিংবা মন্দভাবনা করে, স্বপ্নেও উদ্ভূত বাসনাকারে ঐ সকলের অনুবৃত্তি ঘটে। পরন্তু সতত ভগবৎ অভিনিবেশ বশতঃ যাহার হৃদয়ে সাত্বিকভাব বিদ্যমান তিনি স্বপ্নযোগেও তদ্স্বরূপ দিব্যদর্শনলাভ (বৃহ ৪।৩।২০ করেন।)

সারার্থ এই,— জীবাত্মায় কোনরূপ ক্রিয়ার অভিব্যক্তি না থাকিলেও বুদ্ধিসাদৃশ বশতঃ তাঁহাতে ক্রিয়া আরোপিত হয় এবং বুদ্ধির তাদাত্ম্য বশতঃই তাঁহার জাগরণ, নিদ্রা, স্বপ্ন কল্পিত হইয়া থাকে। জাগ্রত অবস্থায়, নিদ্রিত সময়ে, স্বপ্ন দেখাকালে, সকলদশার অতীত হইয়াও, যিনি বুদ্ধিকে উদ্ভাসিত করেন,— সেই জীবাত্মা বুদ্ধি হইতে ভিন্ন কর্তৃত্বাদিশূন্য ও নিত্যশুদ্ধ। অতএব ইহাই সমর্থিত হয় যে,— সর্ব্ব শুদ্ধ, মুক্তস্বভাব জীবাত্মায় আরোপিত 'অবিদ্যা' আগন্তুক ধর্ম এবং নিদিধ্যাসন অর্থাৎ একাগ্রচিত্তে আত্মধ্যানদ্বারা প্রাণমনবুদ্ধিকে, পরমাত্মায় সংহত রাখিলে, অবিদ্যা কল্পিত সুখদুঃখাদি হইতে মুক্তচিত্ত, কেবল যে জাগরণে, নিদ্রায় স্বপ্নদর্শনে বিমল সুখানুভূতি অনুভব করে,. তাহাই নহে; পরন্তু অন্তঃকরণে শুভ সংস্কার সুদৃঢ় হইয়া, প্রকৃতি প্রভাব তিরোহিত জীবাত্মার নিত্য স্থিতি হয়, মানস চেতনার ঊর্দ্ধভূমিতে। পরিশেষে ভাবগম্ভীরভাবে বিভাবিত ব্যক্তিক জীবাত্মা, শ্রান্ত জীবলীলা অবসানে চির বাঞ্ছিত দুঃখহীন নিকেতন অভিমুখে গমন করে,—যেমন বিবিধ উপায়ে সারাদিন মান আকাশে বিচরণ রত ক্লান্ত পাখী, দিবাবসানে ডানা দুইটি প্রসারিত করিয়া নিজেকে আপন নীড়েরদিকে চালিত করে। সুতরাং 'আমি' চৈতন্য স্বরূপ জীবাত্মা, এইভাবের অনুবর্ত্তী হইবার প্রচেষ্টাই, জীবের সর্ব্বোত্তম অবস্থা বা আমার ধর্মীয় প্রাণ ষ্ঠালাভ। এই তত্ত্ব বৃহদারণ্যক উপনিষদ "জ্যোতি" কারিকায় উপদিষ্ট।

সমুদয় সৃষ্ট পদার্থই কার্য্যকারণ সূত্রে বিধৃত। এই 'কারণ'' কে নিরুদ্ধ করিতে পারিলেই, কার্য্যের গতি রোধ করা যায়। অর্থাৎ কোন মনস্তাত্বিক উপায়ে, কার্য্য কারণ সূত্রের জাল ছিন্ন হইলে, জীবাত্মা জগতের জন্মমৃত্যুলীলারূপ কার্য্যকারণ নিগড় হইতে অব্যাহতি লাভ করে। আমাদের দৃষ্টিগোচর না হইলেও,বিশ্বের সবকিছুই কার্য্য কারণের বশবর্ত্তী হইয়া পরিবর্ত্তিত হইয়া চলিয়াছে। জীবের জন্মরূপ কারণের পরিণতি, যেমন মৃত্যুরূপ কার্য্য; তেমনি মরণের কারণে, পুনরায় জীবজগতে জন্মলাভ, এবং এই পুনরপি জন্মগ্রহণ করিবার 'কারণ' সংসার বিষয়ে আসক্তি। গীতাকার

এই নিঃসংশয় কারণ, উল্লেখে, নিষ্কাম কর্মযোগের আশ্চর্য্য অপরূপ ও সম্পূর্ণ সার্থক বাণী ঘোষনা করিয়া, কর্ম ফলাকাঙ্খা ত্যাগ ও কর্মে আসক্তি পরিহার পূর্ব্বক, শরীর মন বুদ্ধি এবং মমত্ব বর্জ্জিত ইন্দ্রিয় সহায়ে যথাপ্রাপ্ত বিষয় ভোগদ্বারা চিত্তশুদ্ধির উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। যেহেতু জীবনধারণের জন্য (গীঃ ৩ | ৮) অবশ্যই কর্মকরিতে হইবে এবং বাহিরে নিশ্চেষ্ট থাকিলেও, কর্মভাবনা বিচিত্র কামনা রূপে অন্তরে ক্রিয়া শীল থাকে, তাই সর্ব্ব কর্মস্পৃহা বিশ্বেশ্বরের প্রতি নিবেদন করিয়া বাসনারূপ কারনের বিনাশ সাধনই শ্রীগীতার নির্দ্দেশ।

জীবাত্মা কর্তৃক বশীভূত চিত্ত যখনসর্ব্ব প্রকার কাম্য বিষয় সম্পর্কে নিস্পৃহ ভাব ধারণ করিয়া, আত্মচিন্তাতেই সংস্থিত থাকে,— সেই নিঃশেষরূপে বাসনা পরি ত্যক্ত ও বিত্তাদির অহঙ্কাররহিত, মানসিক ভাবকে, শ্রীগীতা দ্বিতীয় অধ্যায়ের সর্ব্বশেষ শ্লোকে, ব্রহ্মস্বরূপে অবস্থিত বা আত্ম সমাহিত অবস্থা বলা হইয়াছে। অর্থাৎ মনের বহির্মুখীনতার সীমাকে সম্পূর্ণ রূপে ছাড়াইয়া উঠিয়া, যে অধ্যাত্মিক ভাবনা লাভ করা যায়; সকল প্রকার সাধনপন্থার পরিণামে, শ্রীগীতা তাহাকেই লক্ষ্য করিয়াছে। এই মানস পরিণতি বা মনের দিব্য অবস্থান্তর প্রাপ্তি, অন্তরে নিষ্কম্প প্রদীপ শিখার মত স্থির স্থিতিতে অর্পিত হইলে, সকল সংসার দুঃখের নিবৃত্তিরূপ পরম শান্তি লাভ হয়; এবং শোকতাপ, মৃত্যুব্যাধি আকর্ণীনশ্বর সংসার ভূমিতে পুনঃ বার জন্মগ্রহণ করিতে হয়না; গতি হয় উর্দ্ধলোকে; দিব্য ধামের উদ্দেশে, ইহাই শ্রীগীতার অভিমত। মনের এই পূর্ণতা প্রাপ্তিই অতিমানস বা দিব্যচেতনায় স্থিতি, যাহার প্রেরণা এই স্থুলদেহের আধারে সক্রিয় হইবার জন্য, বহির্মুখী ব্যাপারের বাধায় কেবলই বার বার ব্যর্থ হইয়া ফিরিয়া যাইতেছে। তাই সহস্র পার্থিব বন্ধনের মধ্যে বাস করিয়াও, চিত্তকে দিব্য জ্ঞানের আধারে পরিণত করিবার প্রয়াসই গীতোক্ত ধর্মাচরণ।

চিত্তবৃত্তি নিরুদ্ধ করা সহজে সম্ভব নয়। পরন্তু মনের বৃত্তিসমূহকে নিরোধ করিতে পারিলেও, সেই অবস্থায় অন্তরে তৃপ্তিলাভ হয়না। কারণ মন তখন সুখদুঃখ, আনন্দ অনুভবের বাহিরে চলিয়া যায়। কিন্তু জীবাত্মা মাত্রই সচ্চিদানন্দের অংশ এবং স্বভাবতঃ আনন্দস্বরূপ (এষোস্য পরম আনন্দ) বলিয়া স্বতঃই আনন্দরস পিপাসু। তাই মানব মন সেই আনন্দরস লাভে উৎসুক হইয়া ইতঃ স্তত ঘুরিয়া বেড়ায়। কিন্তু জাগতিক বিষয়বস্তুতে নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ পাওয়া যায় না। অবচেতন মনের প্রবৃত্তি তাই নিরন্তর অসীম আনন্দের দিকে নিয়োজিত,-যেখানে পূর্ণসত্তা পূর্ণ চৈতন্য, পূর্ণ আনন্দ, একাকার হইয়া রহিয়াছে এবং সেই সাচ্চদানন্দ বস্তুকেই মানবমন জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে, সর্ব্বক্ষণ অন্তরে বাহিরে খুঁজিয়া চলিয়াছে। কারণ ইহাই তাহার

ধর্ম, স্বভাব বা সহজাত গুণ এবং সেই প্রার্থিত বস্তুই ঈশ্বর। আমরা তাঁহার মধ্যেই রহিয়াছি এবং তিনিও আমাদের সকলের মধ্যে রহিয়াছেন। আমরা তাঁহারই অংশ,. যাহা কোন খণ্ডিত বা বিচ্যুত অংশ নয়-বরং ওতপ্রোত যুক্ত অংশ। এই ঈশ্বর শুধু সংসারেই সীমাবদ্ধ নন,-তিনি সমগ্র বহির্বিশ্বে পরিব্যাপ্ত (ঈশ ১,-ছা-৬।৮।১) ও বিশ্বের অতীত হইয়া রহিয়াছেন। সুতরাং তাঁহাকে চিন্তায় ধরিয়া রাখা মনের সহজাত ধর্ম।

মানবদেহ যেমন কতগুলি ইন্দ্রিয় লইয়া একটি যান্ত্রিক রচনা এবং সেই দেহের প্রতিটি জীবাণু তার অংশ,-যাহাতে সমগ্রতার প্রভাব রহিয়াছে বলিয়া, প্রত্যেকটি লইয়া জীবাণুর সত্তা লইয়া সমগ্র দেহের সত্তা,- সেইরূপ সকল জীব সেই বিরাট পুরুষের অংশ এবং তাঁহারই সত্তা। সুতরাং সেই আনন্দময়ের অংশ বলিয়া প্রত্যেক জীব জীবনে আনন্দ রহিয়াছে এবং আনন্দ স্বরূপের অনুধ্যান করাই আনন্দলাভের উৎস,- যাহাতে চিত্ত স্থিত হইলে নশ্বর চঞ্চল বস্তুর প্রতি মন আকৃষ্ট হয় না,- যেমন মধুপূর্ণ পুষ্পেম ধুমক্ষিকা নিশ্চলভাবে লগ্ন থাকে। পরন্তু দেহের কোষাণু যেমন সদা অর্পিত থাকিয়াই,দেহরক্ষার কাজ করিয়া চলে,-তেমনি জীবের কর্তব্য কর্ম দেহেন্দ্রিয়াদি ভগবং সেবায় সতত নিয়োজিত রাখা।

মানুষের বৃত্তি সমূহ ঈশ্বরে সমর্পণ করিতে না পারিলে, মানবোচিত সংগুণ বা মনুষ্যত্ব জাগ্রত হয় না। যে জ্ঞানবুদ্ধি ঈশ্বরে নিবিষ্ট,-কর্ম ঈশ্বরে নিবেদিত,-আনন্দ ঈশ্বর হইতে আগত,-মন ঈশ্বরে সম্পর্পিত,-তাহাই 'পুণ্য' এবং এইভাবে নিত্যযুক্ত ব্যক্তির সকল দায়দায়িত্ব ভগবান নিজে বহন করিয়া (গী ৯।২২) থাকেন। পক্ষান্তরে যে সকল কর্মে, চিন্তায় বা আচার আচরণে, অন্তরে তাপ সৃষ্টি হইয়া পারমার্থিক ভাবনাকে দূরে সরাইয়া রাখে,-তাহাই 'পাপ' এবং ঈশ্বর বিমুখ পাপ পরায়ণ ব্যক্তি, পরিণামে অধোগতি প্রাপ্ত হইয়া (গী ১৬।২০) থাকে। সুতরাং অন্তরের ব্যাপ্তিতে, ত্যাগের বিস্তারে, বুদ্ধির উৎকর্ষে বাসনারূপ তাপ বিনষ্ট করিয়া, মনুষ্যত্ব অর্জনই মানবীয় ধর্ম।

শ্রীগীতার মতে (১৩।৯) প্রতিটি ব্যক্তির জীবন, রোগশোক, জরা ব্যাধিতে আকীর্ণ মহাদুঃখের। এই দুঃখময় সংসারভূমি হইতে মুক্তিলাভ করিয়া, পরম অনাময়, পরম আনন্দময় জীবনে প্রতিলাভ করিবার যোগ্যতা লাভ করাই, গীতোক্ত (৮।১৫) ধর্মমতের লক্ষ্য। যেহেতু পূর্ণ স্বরূপই জড়রূপে প্রকাশলাভ করিয়া, ক্রমশেষে বিবর্তনের মধ্যদিয়া প্রাণচেতনায় উদ্ভবঘটাইয়াছেন এবং জড়ের মধ্যে আচ্ছন্ন চেতনা প্রাণে কতকটা উন্মোচিত হইয়া, মনো-জগতে আরও বিকাশলাভ করিয়া, ক্রমশঃ

আমি ও আমার ধর্ম্ম

উত্তভব পরিনাম প্রাপ্তির দিকে যাত্রা করিয়াছে,-যে পরিণতির অন্তনাই,-তাই মনকে সতত ভগবৎ অভিনিবেশে অভিনিবিষ্ট রাখিবার নিরবিচ্ছিন্ন প্রযত্নই মানুষের সার্থক সাধনার সহায়ক।

মনকে ঈশ্বর প্রণিধানে একান্তঃ করণে নিযুক্ত রাখিয়া সংসার বন্ধনমুক্ত জীবন যাত্রা নির্ব্বাহের জন্ত,-শ্রীগীতায় সরল, অথচ সর্ব্বশাস্ত্র সম্মত একটি সার্ব্বজনীন তত্ত্বে উল্লেখ রহিয়াছে,-যহা নিষ্কামতত্ত্ব, অর্থাৎ একদিকে ঈশ্বর চিন্তায় নিজেকে নিঃশেষ সম্পর্ণ,-অপরদিকে নিষ্কামভাবে কর্ম করিয়া যাওয়া। তাৎপর্য্য এই, ঐশ্বরিক প্রেরণা-শ্রয়ী হইয়া, সজ্ঞানে তাঁহার সহিত যুক্ত থাকিয়া ইন্দ্রিয় মনবুদ্ধিকে তাঁহারই আধারে পরিণত করিয়া, জীবনযাপনের জন্য যে কর্মকৃত হয়,-তাহা নিষ্কামকর্ম বা দিব্যকর্ম যেহেতু কর্মের স্বভাবই বন্ধন সৃষ্টি করা,-তাই ভগবৎ প্রেরণারূপ কুশলতা অবলম্বনে কর্ম করিলে, ফলাসক্তি বিদূরিত হইয়া কর্মের স্বাভাবিক বন্ধন শক্তি বিনষ্ট হয়। সারার্থ এইরূপ যে, প্রতিটি ইন্দ্রিয়েরই স্বকীয় অনুকূল বিষয়ে অনুরাগ ও প্রতিকূল (গী-৩।৩৪ দ্বেষ রহিয়াছে এবং স্বভাব অনুকূল কর্মকে নিষ্কামকর্ম,-অর্থাৎ কামনাহীন বা ফলাশাশূন্য অনুষ্ঠানে পরিণত করিলেই, কর্মবন্ধন বা কর্মের শৃঙ্খল মোচন হয়। ইহাই গীতোক্ত অনাসক্তিযোগে ধর্মাচরণ বা মানবের কর্ত্তব্যকর্ম, অর্থাৎ স্ব-ধর্ম।

প্রতিটি নরনারীর চেতনায় পরমাত্মা গূঢ় প্রেরণারূপে ক্রিয়াশীল, যাহা জীবাত্মার মাধ্যমে, অন্তহীন সংস্কার ও বিচিত্র স্বভাবের অনুসঙ্গে জীবজীবনে স্ফুরিত হইবার প্রয়াস পাইতেছে। যেহেতু কর্মাধীন জীবনের সব কিছুই পূর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট, যাহা নিজের ইচ্ছামত নিয়ন্ত্রণ করা যায় না এবং ভগবৎ বিধানের বাহিরে কাহারও কোন কর্ম প্রেরণা থাকিতে পারেনা,- তথাপি আনন্দময়ের অংশসম্ভূত বলিয়া, কোন ঈশ্বর পরায়ণ ব্যক্তির কর্ম প্রচেষ্টা, অন্তরের অজানা আনন্দ হইতে উদগত হইয়া, ঐশী প্রেরণা বশেই, গীত, নৃত্য কাব্য গল্প প্রবন্ধাদি রচনা ও শিল্প কর্মের মধ্য দিয়া, প্রাণের বাসনা ও মর্ম্মর আবেগকে বাহিরে স্বরজাল বিস্তারের ন্যায় নিজেকে প্রকাশ করিয়া, পরিশেষে স্বীয় শুদ্ধ অন্তঃকরণকে সেই আনন্দ স্বরূপের পদপ্রান্তে ফুল্ল কুসুমরূপে অর্পন করিতেছে। কাজেই ভাগবতীয় বিবিধ প্রেরণা, একই উৎস মুখ হইতে উৎসিক্ত বলিয়া, কোন মতবাদ বা কর্ম বিভাগের বিরোধীতা না করিয়া শ্রীগীতোক্ত ধর্ম সকল জিজ্ঞাসায় এক অপূর্ব্ব সামঞ্জস্য বিধান করিতেছে। প্রণিধান যোগ্য যে, সঙ্কীর্ণ পরিবেশের মধ্যে, সীমিত বুদ্ধির প্ররোচনায় জীবন দৃষ্টির মান যখন সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে, তখন আনন্দরস আকর্ষণ করা কঠিন হয়। তাই বাহিরের শত প্রতিকূলতা সত্ত্বেও, সৎ কর্ম প্রবৃত্তিকে প্রাণপণ বলে সতত উদ্বোধিত রাখিতে

হইবে। কারণ সর্ব্বান্তর্য্যামী পরমেশ্বর হইতেই (গী-১৮।৪৬) জীবের সংস্কারানুযায়ী কর্ম প্রবৃত্তির উৎপত্তি বলিয়া মনুষ্য স্বভাবজ কর্মদ্বারাও তাঁহার অর্চ্চনা করিতে পারে।

এই নিষ্কাম কর্মের অর্থাৎ অনাসক্তিযোগের সাধনপথে অগ্রসর হইলে, অভিপ্রায়ের কখনও অন্যথা হয় না। ইহজন্মে সংগৃহীত সাধন সংস্কার, পরবর্ত্তী জন্মে (গী—৬।৪৫) সহজাত প্রবৃত্তিরূপে পূর্ব্বজন্মকৃত যত্ন অপেক্ষা অধিকতর অধ্যবসায় পরায়ণ করিয়া, ভগবৎ ভজনানুকূল সাধনাদ্বারা অব্যয় শাশ্বত পদ প্রাপ্তির সহায়ক হয়। অতএব একদিকে ভগবানকে অন্তরের জাগ্রত উপলব্ধিতে ধরিয়া রাখিয়া, চারিদিকের বিষয় ব্যাপারের মধ্যেই যেটুকু সুখ যতটুকু আনন্দ পাওয়া যায় তাহাই ভগবৎকৃপা বোধে মনের সম্মুখে স্থাপিত রাখিয়া চলা এবং অপরদিকে সংসার কর্ত্তব্য নির্ব্বাহ করা কালীন, ভগবানকেই সর্ব্বকর্মের প্রেরণাদাতা ভাবিয়া, কর্মের মধ্যে তাঁহার ইচ্ছা প্রকাশ করা। জীবন ভরিয়া একযোগে এই দুইটি উপায়কে জীবনে বাস্তবায়িত করিয়া, সর্ব্বতোব্যাপ্ত জগদীশ্বরের সহিত যুক্ত থাকিবার যথোচিত প্রয়াসও, শ্রীগীতার মতে সংসারীলোকের শাস্ত্র সম্মত ধর্মানুষ্ঠান। শ্রীগীতার পঞ্চদশ অধ্যায়ে উল্লেখ রহিয়াছে, সংসারে কর্ত্তা ভোকতারূপে পরিচিত জীব, ভগবানের অংশ। এই জীব শ্রোত্র, চক্ষু, ত্বক, রসনা, ঘ্রাণ ও মন মধ্যে অধিষ্ঠিত হইয়া বিষয়সমূহ ভোগ করে। যখন শরীর ত্যাগ করে, তখন পরিত্যক্ত দেহ হইতে ইন্দ্রিয়াদির সংস্কার গ্রহণ পূর্ব্বক গমন করে, যেমন বায়ু পুষ্পাদি হইতে গন্ধ আহরণ করিয়া চলিয়া যায়। তারপর জীবের পুনর্বার জন্মলাভের সময় পূর্ব্বদেহের ইন্দ্রিয়াদির সংস্কার নবীভূতদেহে প্রবেশ করে অর্থাৎ পূর্ব্বজনমে যেখানে শেষ, নবজনমে সেখান হইতে আরম্ভ, তাই প্রাক্তন জনমবিদ্যা বা পূর্ব্বজনমার্জিত জ্ঞানাদি পরবর্ত্তী জনমে প্রকাশ পায়। এত দ্ব্যতীত মানবের অন্তরিন্দ্রিয় বা মনের সহিত দিব্যচেতনায় যোগসূত্ররূপে একটি 'অধ্যাত্মতত্ব' শাস্ত্রাদিতে পরিশীলিত ও স্বীকৃত। ইহারই অনুসরণে মানবের চিত্তলোক আশ্রয় করিয়া সৃষ্টিকর্ত্তার লীলাবিলাস। মনুষ্যমনের এই অধ্যাত্মচেতনা, ক্রমশঃ বিকশিত হইয়া যখন অতিমানস চেতনায় উন্নীত হয়; তখন ত্রিগুণাত্মক প্রকৃতিতে জড়িত মন, উর্দ্ধতর চেতনার সহিত যোগযুক্ত হইয়া, এমন একটি "রূপপরিনাম" অবস্থা লাভ করে, যাহার যথাযথ উদ্ভবে, মানসচেতনায় সীমা ও অসীমের শাশ্বত বিরোধ নিরাকৃত হইয়া, বিশ্বপ্রকৃতির সহিত ব্যকতি সত্বার নির্ব্বাধ মিলন ঘটে।

এই অবস্থার স্থিরস্থিতিতে অন্তর্য্যামী পরমেশ্বরকে অন্তরতর চিরবন্ধুরূপে উপলব্ধি করিয়া সংসারের দুঃখকষ্টিতে নৈরাশ্য আসে না এবং জীবনে সকল সামর্থ্যের ক্রম বিকাশ ঘটিয়া, যাবতীয় সংশয় সমস্যার নিরসন হয়। কারণ জীবনদেবতা জীবনতরণীর

কর্ণধাররূপে, তখন সক্রিয় সঞ্চালনা করেন। ইহা সীমার মধ্যেই অসীমের সমন্বয়; কিংবা ব্যক্তিগত ভাবনার বিলুপ্তি; অথবা অসীমের মধ্যেই সীমিত জীবনের অস্তিত্ব অনুভব না বিশ্বশক্তির নিকট সজ্ঞানে আত্মসমর্পণ। অন্তরের মধ্যে দিব্যচেতনার সহিত, এইরূপ যে যোগযুক্ত অবস্থা, তাহাই প্রার্থনীয় বা আকাঙ্খার বিষয় এবং ইহাই ধর্ম্মাচরণের লক্ষ্য,—যেহেতু এই অবস্থা প্রাপ্তি অধ্যাত্ম জীবনে সচেতন উত্তরণ। শ্রী গীতার চতুর্থ ও ষষ্ঠ অধ্যায়ে ইহাকেই জ্ঞানময় যজ্ঞ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। অর্থাৎ বহির্বস্তুতে আসক্ত ইন্দ্রিয় সমূহকে ক্রমশঃ নিম্নতর চেতনার আবেষ্টনী হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া, উন্নততর বিশুদ্ধ অধ্যাত্মচেতনায় উত্তীর্ণ করাই, দ্রব্যময় জাগতিক যজ্ঞের পরিবর্তে যথার্থ জ্ঞানময় যজ্ঞের সূচনা।

এই মানসিকতা লাভের উপায় সম্পর্কে, শ্রীগীতার ষষ্ঠ অধ্যায়ে ধ্যানাভ্যাস দ্বারা চিত্তের সর্ব্ববিষয়শূন্যতা অর্জ্জন এবং শুদ্ধ অন্তঃকরণ সহায়ে পরমচৈতন্য জ্যোতিঃস্বরূপ আত্মাকে উপলব্ধি করিবার উপদেশ। অর্থাৎ সঙ্কল্প হইতে সমুৎপন্ন কামনাসকল নিঃশেষিত করিয়ে, চিত্তকে বাহ্য বিষয় চিন্তা বিযুক্ত রাখিয়া, অন্তঃকরণ আত্মায় নিবেশিত রাখিতে হইবে। এইভাবে স্থির বুদ্ধিদ্বারা অল্পে অল্পে বিষয়াদি হইতে মনের নিবৃত্তি সাধনের অভ্যাসই, গীতোক্ত ধ্যান বা যোগাভ্যাস। সারার্থ এই,- 'এইটি আমার হউক' এইরূপ কামনা উৎপন্নকারী বস্তুর মনোরমত্ব জ্ঞান, ধৈর্য্যযুক্ত নির্মল বুদ্ধিদ্বারা পরিহার করিয়া, বাহ্যচিন্তা বিরহিত বা বৃত্তিরহিত মনকে, নিষ্কম্প দীপশিখার মত, আত্মচিন্তায় অবিচলিত রাখা ব্যতীত অন্য কোন ভাবনা করা চলিবে না। চঞ্চল মন যখনই বৈষয়িক আসক্তি পরবশ হইয়া, বিষয় ব্যাপারে বিচরণ করিতে উদ্যোগ করিবে, তৎক্ষণাৎ তাহাকে তৎসমুদয় হইতে প্রত্যাহার করিয়া আত্মাতে নিয়ত রাখিতে হইবে। এই প্রকার বহিরঙ্গ সাধনে অভ্যস্ত না হইলে, অন্তরঙ্গ সাধনে প্রবেশ লাভ বা অধিকার জন্মে না।

কর্মযোগকে বলা হয়- বহিরঙ্গসাধন এবং চিত্তশুদ্ধি দ্বারা ধ্যানযোগে প্রবেশ,- অন্তরঙ্গ সাধন। কঠোপনিষদে প্রথম অধ্যায়, দ্বিতীয় বল্লীর একাদশ এবং দ্বিতীয় অধ্যায় তৃতীয় বল্লীর দশমশ্লোকে, উল্লেখ রহিয়াছে,-যে অবস্থায় মনের সহিত পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ব্যাপার শূন্য অবস্থায় অবস্থান করে এবং বুদ্ধি কোন চেষ্টা করিয়া নিজ কার্য্যে ব্যাপৃত হয়না,- অর্থাৎ বাহ্যেন্দ্রিয় ও অন্তরিন্দ্রিয় সকল, যখন বহির্বিষয় বস্তু সংঘাতে বিচলিত না হইয়া, আত্মার সহিত যুক্ত থাকিয়া স্ব-মহিমায় স্থিতি লাভ করে,- সেই স্থির ইন্দ্রিয় ধারণাই উত্তমগতি শ্রীগীতার ষষ্ঠ অধ্যায়ের তেইশশ্লোকে, মনের এই বাহ্য বিষয় ভাবনা ত্যাগ করা রূপ যে 'বিয়োগ' তাহাকেই 'যোগ' বলা

হইয়াছে,- যেহেতু এই অবস্থায় জীবাত্মা নিখিল দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তিরূপ স্বমহিমায় উত্তীর্ণ হইয়া, পরমাত্মার সহিত ভক্তিযোগে যুক্ত থাকে।

উপরোক্ত আলোচনার মর্মার্থ এই,- বাহিরে যাহা কিছু দৃশ্য, তাহার সমস্তই যেমন দ্রষ্টা 'আমি' হইতে ভিন্ন,- সেইরূপ দৃষ্টিগোচর এই দেহ মধ্যে যে সকল দৃশ্যমান ও অনুমেয় ইন্দ্রিয়াদি রহিয়াছে, তাহা দ্রষ্টা জীবাত্মা পৃথক হইতে এবং দেহেন্দ্রিয় সমষ্টির পরিচালকরূপী এই চৈতন্যসত্তা বা জীবাত্মা দেহের 'আমি'। বুদ্ধিকে তাই পরিশুদ্ধ করিয়া, চিত্তকে আত্মভাবনাতেই অনুপ্রাণিত করিতে হইবে। কারণ বুদ্ধিই মনের নিয়ন্তা, যেহেতু মুমুক্ষুর মন যখন বিষয় চিন্তায় উন্মত হয়, তখন বুদ্ধিই উক্ত মনকে এইভাবে সংযত করে যে,- আত্মা বিষয়াতীত ও আনন্দস্বরূপ, তাই তাঁহার বিষয় ভাবনা নাই। এই প্রসঙ্গে শ্রীগীতার দ্বাদশ অধ্যায়ের উপদেশ অনুধাবনীয়,- চিত্তকে স্থিরতররূপে ভগবৎ ভাবনায় ন্যস্ত ও বুদ্ধিকে সেইভাবে সন্নিবেশিত করিয়া, সর্ব্বদা আধ্যাত্মিক ভাবের অনুস্মরণরূপ অভ্যাসযোগে, অর্থাৎ বিষয় ব্যাপার হইতে মনবুদ্ধিকে সমাহৃত করিয়া, কোন দেবতার মানসমূর্ত্তি বা প্রতীক, প্রতিমাদি অবলম্বনে চিত্তের স্থিরতায় অভ্যস্ত হইতে হইবে। ইহাতে অসমর্থ হইলে, ভগবৎ প্রীতি সম্পাদনের সঙ্কল্প ব্রত পালন বিগ্রহাদি উপাসনার অনুষ্ঠান,- অর্থাৎ শাস্ত্রানুযায়ী উপাস্য বস্তুকে চিত্তের বিষয়ীকরণ দ্বারা, অন্তরে তাঁহার সমীপস্থ হইয়া, তৈল ধারার ন্যায় অবিচ্ছিন্ন প্রত্যয় প্রবাহে মানসিকভাবে অবস্থান আবশ্যক।

উপাসনার আভিধানিক তাৎপর্য্য বলিতে ঈশ্বরের অতি সন্নিধানে একাত্ম হইয়া থাকা এবং প্রীতিপূর্ব্বক তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন বুঝায়। যদি এইভাবে জীবনযাপনেও অসুবিধা আসে, তবে কায়মনবাক্যে শ্রীভগবানের প্রতি শরণাপন্ন হইয়া, সংযত চিত্তে সর্ব্বকর্ম সমর্পণ রূপ যোগ আশ্রয় করিয়া, কর্মফল ত্যাগ করাও ধর্ম সাধনা। শ্রীমদ্ভাগবত ষষ্ঠস্কন্ধ সপ্তদশ অধ্যায়ের অষ্টাবিংশতি শ্লোকে উল্লেখ রহিয়াছে,- যেহেতু পরমেশ্বরের লীলা বৈচিত্র্যেই দেহীদিগের দেহসংযোগ ও তজ্জন্য সুখদুঃখ জন্মমরণ ইত্যাদি হইয়া থাকে, তাই ভগবৎ পরায়ণ ব্যক্তিগণ কোন অবস্থাতেই ভীতগ্রস্ত হন না,- ইহাই ভগবৎ নির্ভরতারূপ ধর্মাচরণের বিশেষ তাৎপর্য্য। বস্তুতঃ আপন অন্তরের অনুভাবে ভগবানের অনুসন্ধান তৎপর থাকাই তপস্যা এবং সর্ব্বাঙ্গীণ মনুষ্যত্বের পরিপূর্ণ উৎকর্ষের দ্বারাই পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার যোগযুক্ত হওয়া সম্ভব। এই সম্পর্কে মনুসংহিতা দ্বিতীয় অধ্যায়ের অনুজ্ঞা অনুধাবনীয়,- স্বভাবজাত বিবেক ধর্মাধর্ম নির্ণয়ে প্রমাণরূপে গৃহীত হইতে

পারে। পরবর্ত্তী সূত্রে অনুশাসন এই,- যুক্তিহীন বিচারে ধর্মের হানি ঘটে। সুতরাং নীতিহীন অন্ধবিশ্বাসে বা কৃত্রিম আড়ম্বর কুহেলিকায় আপনাকে অর্থাৎ জীবাত্মাকে সমাচ্ছন্ন না রাখিয়া, গীত উক্ত সত্ত্বার উন্মুক্ত আলোকের ত্রিবেণী তীর্থপথ,- অর্থাৎ কর্ম জ্ঞান ও ভক্তির সম্মিলিত পথে উত্তীর্ণ হওয়াই যুক্তিসঙ্গত, যেমন তিনটি যষ্টী আড় আড়িভাবে যুক্ত করিলে, তাহা খাড়া থাকে।

ঈশ্বরকে আমরা স্থূলদৃষ্টিতে দেখতে পাইনা এবং অহরহ শাস্ত্রীয় অনুশাসন অবলম্বন করিয়া চলিলে, তাহারও সম্ভাবনা কম। তবে সর্বদা তাঁহাকে স্মরণে রাখিতে কোন বাধা নাই,- মনের ভাবনায় ধরিয়া রাখিবার অসুবিধা নাই। অবিচ্ছিন্ন ভাবাও তাঁহাকে উপাসনা করা। তাঁহার সর্ব্বগুণসম্পন্ন বিশুদ্ধ স্বভাবের উপর চিত্ত স্থির করিয়া ভক্তিপূর্বক তাঁহাকে ধ্যানে ধরিলে, প্রীতির সহিত হৃদয়কে তৎ সম্মুখীন, রাখিলে আন্তরিক অনুরাগের সহিত অবিরত ভগবৎ নাম জপ করিতে কোনই অন্তরায় নাই। এই ভগবৎ আরাধনায় যে শান্তি, তাহার ক্ষয় নাই। পরন্তু ভগবৎ প্রসাদে এই মর্ত্ত্যজীবনই সার্থক পবিত্র হইয়া উর্দ্ধে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়,- হৃদয় হয় পবিত্র,- অন্তর মঙ্গলালোকে উদ্ভাসিত হয়, ভগবৎ প্রসন্নতায় বৈভব জীবন পথের সম্বল হয়।

সুতরাং সতত ভগবৎ অভিনিবেশে চিত্তকে আনন্দময়, অমৃতময়ের প্রতি নিবদ্ধ রাখাই আধ্যাত্মিকতা। ইহাতে চাক্ষুষ কিছু লাভ না হইলেও, ইহা ক্রমশঃ অন্তরের ঔদাসীন্য ঘুচাইয়া ব্যক্তিক চেতনার দ্বারা পরমচেতনাকে নিজের আত্মার আত্মাকে লাভ করায়। চিত্ত যতক্ষণ বিষয়ে আসক্ত, ততক্ষণ সংসারে। যখনই সঙ্গোত্তীর্ণ, তখনই মুক্ত। এই সম্পর্কে কঠোপনিষদ দ্বিতীয় অধ্যায় তৃতীয় বল্লীর পঞ্চদশ অনুশাসন অনুধাবনীয় এইরূপে যে, মানবহৃদয়ে যে সকল কামনা আশ্রিত রহিয়াছে, পরমার্থ আত্মদর্শন হেতুঃ তাহা যখন বিশীর্ণ হয়, অর্থাৎ জীবিতাবস্থায়ই ভগবৎ কৃপায় বুদ্ধির বন্ধন সমূহ বিনষ্ট হয় তখন মরণধর্মা মানুষ এই দেহেই ব্রহ্মকে অন্তরে উপলব্ধি করিয়া অমৃতময় হয়।

আমাদের অন্তরাত্মার সত্য তো কেবল যে ভগবানকেই জানিতে চায়, তাহা নহে, পরন্তু তাঁহার নিকট নিজেকে সম্পূর্ণরূপে সমর্পণ করিবাতেই তার আগ্রহ ও আনন্দ সুতরাং সংস্কারাচ্ছন্ন মানসভাবকেই আশ্রয় না করিয়া, ভাগবতী প্রভাব ব্যতীত অপর কিছুদ্বারা প্রভাবিত না হইয়া, এবং ভগবৎ প্রবৃত্তি নাতি কে, অন্য কোন রুচিকে বাহির হইতে চালিত করিতে কিংবা ভিতর হইতে প্রকাশ পাইতে না দেও যার জন্য, চিত্তকে নিরন্তর অন্তর্মুখী, অর্থাৎ আত্ম ভাবনা অভিমুখীন রাখিবার যথা

সাধ্য প্রয়াস করিতে হইবে। তবেই ভগবৎ ভজন অনুকূল ভাবের আদর্শে স্বভাব গঠিত হইতে থাকিবে। ক্রমে সেই সর্ব্বগত, সর্ব্বগ, সর্ব্বদ্রষ্টা, সকলের হিতকারী শ্রীভগবানের বিমলজ্যোতি সর্ব্বতোভাবে দেহেন্দ্রিয় ও স্বভাবকে অধিকার করিয়া, চরিত্রে নির্মলতা আনয়ন পূর্ব্বক; দিব্যজ্ঞানের অলৌকিক প্রভায় অন্তরকে উদ্ভাসিত করিবে। সাধক তখন ঈশ্বরের নিকটবর্ত্তী হইয়া ঈশ্বরানুকৃত স্বভাব প্রাপ্ত হইবে। অবশেষে জীবলীলা অবসানে পরমধামে শ্রীভগবানের সামীপ্যলাভের যোগ্যতা অর্জ্জন করিবে।

শ্রীগীতার দ্বিতীয় অধ্যায় একান্নশ্লোকে, উপরোক্ত নিষ্কাম কর্মযোগী মনীষিগণের জন্মরূপ বন্ধন হইতে বিনির্মুক্ত হইয়া, সংসার স্পর্শশূন্য পরমানন্দময় অবস্থায় স্থিতি লাভ নিশ্চিতই বলা হইয়াছে। সপ্তম অধ্যায়ের অষ্টাদশ শ্লোকে, ভগবানে চিত্ত সমাহিত ব্যক্তির মরণোত্তর উৎকৃষ্ট গতিস্বরূপ ভগবদাশ্রয় প্রাপ্তির কথা আছে। অষ্টম অধ্যায়ের পঞ্চম এবং পঞ্চদশ শ্লোকে উল্লেখ রহিয়াছে, ইষ্টদেবতা স্মরণ করিতে করিতে দেহত্যাগ হইলে, নিঃসংশয়ে ভাগবতীয় স্বরূপ প্রাপ্তি হয় এবং উর্দ্ধগতি প্রাপ্ত এই চিরমুক্ত মহাত্মাগণ ভগবৎ সামীপ্যলাভের ফলে দুঃখের আলয় নশ্বর জগতে পুনর্জ্জন্ম প্রাপ্ত হন না। পরবর্ত্তী একুশ শ্লোকে এবং কঠোপনিষদে (১।৩।১১) ইহাই জীবের পক্ষে শ্রেষ্ঠগতি বা পরম পদপ্রাপ্তি বলা হইয়াছে। গীতার নবম অধ্যায় একত্রিশ শ্লোকে ভগবৎ বাক্য এইরূপ,— কর্মসঙ্কল্প সতত শুভ থাকায় ভগবদভক্তের কখনও অধোগতি হয় না। পরবর্ত্তী চৌত্রিশ শ্লোকে, শরণাগত ভকতের ভগবানকে লাভ করিবার প্রতিশ্রুতি।

দশমঅধ্যায় সপ্তম এবং একাদশ অধ্যায় চুয়ান্ন শ্লোকে 'অনন্যাভক্তি অর্থাৎ ভাগবতীয় বিষয় ব্যতীত, অপরকিছুর উপলব্ধিহীন মানসিকতা দ্বারা তত্ত্বজ্ঞানলাভের উল্লেখ,-যাহা মুক্তিপ্রদ বা ঈশ্বরদর্শনের সহায়ক। দ্বাদশ অধ্যায় সপ্তমশ্লোকে ভগবদুক্তি এই,-শ্রীভগবানে আবেশিত চিত্ত ভক্তগণকে, তিনি মৃত্যুময় সংসার সাগর হইতে, অনতিবিলম্বে উদ্ধারকর্ত্তা হইয়া থাকেন। ত্রয়োদশ অধ্যায় অষ্টাদশ ও চতুর্বিংশতি শ্লোকের মর্ম্মার্থ এই,-ব্রহ্মভাব প্রাপ্তি অসম্ভববোধে অবসাদগ্রস্ত, না হইয়া, ভগবান জ্ঞানরূপে হৃদয়ে অধিষ্ঠিত জানিয়া যিনি, অব্যভিচারিণীভক্তি' (১৩।১১) অর্থাৎ ভগবানই একমাত্রগতি, এই নিশ্চিত 'বুদ্ধির অবিচল নিষ্ঠায়' তাঁহাকে আত্মবৎ ভজনা করেন,-প্রকৃতি প্রভাবমুক্ত সেই ব্যক্তি জীবনধারণ জন্য, বিহিত ও অবিহিত কর্ম করিয়াও (বৃহ-উপ ৪।৪।৬) পুনর্ব্বার জীবজগতে জন্মলাভ করেন না। তাৎপর্য্য এই, দশমঅধ্যায় একাদশ শ্লোকের প্রতিজ্ঞা

অনুসারে ভগবান তাঁহাদের বুদ্ধিতে আরূঢ় হইয়া তত্ত্বজ্ঞানরূপী বিবেকের উদয় ঘটাইয়া মোহান্ধকার নাশ করিয়া থাকেন। ফলতঃ ব্রহ্মজ্ঞানাগ্নি দ্বারা সঞ্চিত কর্মবীজ বিনষ্ট হওয়ায় জন্মান্তর (৪।৩৭) প্রতিহত হয়।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়ের প্রথমেই, সর্ব্বজ্ঞানের শ্রেষ্ঠ পরমার্থ জ্ঞান লাভ করিয়া, সংসারবন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করা যায়, উল্লেখে, সর্বশেষ শ্লোকে ঐকান্তিক নিবৃত্ত সুখের প্রতিষ্ঠা ভগবানকেই আশ্রয় করিতে বলা হইয়াছে। পঞ্চদশ অধ্যায়ের চতুর্থ হইতে ষষ্ঠ শ্লোকের সারার্থ এই,- যাহা হইতে জীবে সংসার প্রবৃত্তি বিস্তার হইয়াছে, শরণাগতিদ্বারা অন্বেষণীয় সেই পরমপদ প্রাপ্ত হইলে, সংসারে পুনরাবৃত্তি ঘটে না।

এই সম্যক শরণাগত বুঝাইতে,-অহঙ্কার ও মোহশূন্য, আসক্তিদোষজয়ী, পরমার্থ জ্ঞাননিষ্ঠ, বাসনাবর্জ্জিত, সুখদুঃখরূপ মানসিক দ্বন্দ্ব হইতে মুক্ত মানসিকতা লাভ নির্দ্দেশ করে। ষোড়শ অধ্যায় বাইশ শ্লোকে বলা হইয়াছে,-জীবের অধোগতিদায়ক কাম, ক্রোধ ও লোভ হইতে মুক্ত হইয়া ঈশ্বরাধনাদিরূপ স্বীয় কল্যাণ সাধনে সমর্থ হইলে, মনুষ্যজন্মের সার্থকতা লাভ হয়। এই সম্পর্কে কেনোপনিষদ দ্বিতীয় খণ্ড পঞ্চম মন্ত্র তুলনীয় যে,-এই জন্মেই যদি ব্রহ্মজ্ঞান লাভ না হয়, তবে দীর্ঘকালব্যাপী সংসারগতি প্রাপ্তি ঘটে। সর্ব্বশেষ শ্লোকে সতর্কবাণী এই,-শাস্ত্রীয় বিধিও নিষেধ উল্লঙ্ঘনকারী পুরুষার্থলাভের যোগ্য হয় না। সপ্তদশ অধ্যায়ে সৎপ্রাপ্তি সাধনমার্গের সহায়তা জন্য, সাত্ত্বিক আহার, অর্থাৎ সবল, ও স্নিগ্ধ ও পুষ্টিকর আহার্যার উপর গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে অষ্টাদশ অধ্যায় ছাপান্ন ও বাষট্টি শ্লোকের মর্মার্থ এই,-চিন্তা, বাক্য ও কর্ম দ্বারা সর্বতোভাবে ভগবৎ শরণাগত হইয়া, অনাসক্তভাবে জীবিকানির্বাহ কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়াও সনাতন অক্ষয়ধামে গতি লাভ হয়।

শ্বেতাশ্বর উপনিষদ দ্বিতীয় অধ্যায় চতুর্দ্দশ শ্লোকের মর্মার্থ এই,-যেমন মৃত্তিকাদি দ্বারা মলিনীকৃত স্বর্ণপিণ্ড অগ্নিদ্বারা শোধিত হইয়া, উজ্জ্বলরূপে দীপ্তি পায় তদ্রূপ শাস্ত্রীয় অনুশাসন অবলম্বনে, সাধক জীবাত্মাকে সুনির্মল করিয়া পরমাত্মার উপলব্ধি দ্বারা কৃত কৃতার্থ ও সর্বদুঃখ হইতে মুক্ত হন। কঠোপনিষদ প্রথম অধ্যায় তৃতীয়বল্লী একাদশ মন্ত্রে পরমাত্মাই জীবের পরম প্রাপ্তি উল্লেখে, পরবর্ত্তী মন্ত্রে বলা হইয়াছে,- ইনি সকল জীবে অবিদ্যা মায়াচ্ছন্ন হইয়াও মনের নিয়ন্তা বুদ্ধির একাগ্রতা যুক্ত মনন দ্বারা দৃষ্ট হন। এই তত্ত্ব শ্রীগীতার সপ্তম অধ্যায় পঞ্চবিংশতি শ্লোকের ভগবদোক্তিতে প্রতিধ্বনিত। বৃহদারণ্যক চতুর্থঅধ্যায় চতুর্থব্রাহ্মণে উল্লেখ,-যেহেতু, দেহ ত্যাগকালে অন্তঃকরণবৃত্তি প্রবল আকার ধারণ করিয়া, অন্তিম বাসনা অনুযায়ী পরবর্ত্তী দেহলাভ করায়, তাই সদ্‌গতি লাভের জন্য যাবজ্জীবন পুণ্যানুষ্ঠান তৎপর হওয়া উচিত,-

যাহাতে অন্তকালে মুমূর্ষুর পথের সম্বল, শুদ্ধ বাসনাই অন্তরে অগ্রে উদিত হয়।

ইহার তাৎপর্য্য ব্যাখ্যায় পরবর্ত্তী তৃতীয় কারিকার দৃষ্টান্ত উল্লেখে বলা হইয়াছে,- তৃণাশ্রিত জলৌকা যেমন তৃণের প্রান্তভাগে গমন করিয়া, অপর আশ্রয় অবলম্বন পূর্ব্বক, পূর্ব্বাশ্রিত তৃণখণ্ড হইতে নিজেকে উঠাইয়া লয়'- ঠিক তেমনি জীবনের অন্তিম সময়ে স্থূল দেহাশ্রিত জীবাত্মা, পাঞ্চভৌতিক দেহের সূক্ষ্মাংশদ্বারা পরিবেষ্টিত সূক্ষ্মদেহ আশ্রয় করিয়া, স্থূলদেহরূপ আধার হইতে উত্থিত হইয়া চলিয়া যায়। জ্ঞান কর্ম্মাদি প্রযুক্ত সংস্কারবশে স্বপ্নাবস্থায় বাসনাদ্বারা নির্ম্মিত দেহে যেমন জীবের আত্মাভিমান হয়, তদ্রূপ মরণকালে সংস্কার উদ্ভূত বাসনাময় ভোগোপযোগী ভাবী দেহের প্রতি আকর্ষণ আসিয়া পরজীবনে সেইরূপ ভোগায়তন লাভ হয় এবং সূক্ষ্মদেহে আহিত নূতন দেহের উপাদানরূপ সংস্কার নব কলবরে সংস্থিত হয়। সুতরাং দেহ ত্যাগ সময়ে যাহাতে ভাগবতীয় ভাব উদ্দীপিত হয়, সেইজন্য চিত্তকে পরমার্থ তত্ত্ব তথা পরমেশ্বর অনুধ্যানে নিয়ত নিযুক্ত (গী৮।৭) রাখিবার বিধান।

ব্রহ্ম স্বতঃসিদ্ধ বস্তু। যাঁহা কর্ত্তৃক যাবতীয় বস্তুর অস্তিত্ব, তাঁহাকে জড়ীয় বিষয়দ্বারা প্রমাণ করা যায় না,-যেহেতু প্রমাণিত বস্তু, প্রমাণকারীকে প্রমাণ করিতে পারে না, যেমন পুত্র পিতাকে নিশ্চয় করেনা, যদিও পুত্রদ্বারাই পিতৃত্ব স্বীকৃত। তাই বেদে অবিকারী ব্রহ্মের কেবল স্বরূপ নির্দ্ধারণ রহিয়াছে। ঋষিদৃষ্টিতে তাহা দ্বিবিধ, একটি বাহিরের বিষয়ং অপরটি অন্তরের বস্তু। দৃশ্যমান জগতে সর্ব্ব ব্যাপীরূপে ওতপ্রোতভাবে বিরাজিত থাকিয়াও, তিনি প্রতিটি জীবের অন্তরাত্মরূপেও অবস্থিত। সুতরাং অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের প্রসবিতা বা আশ্রয় যেই শক্তি, তাহা আশ্রিত জীবের বুদ্ধিবৃত্তিরও প্রচোদক বা প্রেরক। মন্ত্রার্থ এই বিশ্বসৃষ্টির ও জীববুদ্ধির মূল উৎস এক। ইহাই বাহিরে কার্য্যকারণ সূত্ররূপে 'পরমাত্মা' এবং জীবশরীরে প্রাণরূপে 'জীবাত্মা' যাহা একই আত্মার পরম পুরুষ ও আত্মপুরুষপ বিভাগ।

জীবাত্মা হইতে জ্ঞান, ইচ্ছা ও ক্রিয়া এই ত্রিবিধশক্তি উৎসারিত, অপরদিকে অন্তর্য্যামীরূপে পরমাত্মা এই বুদ্ধিবৃত্তির প্রেরক। কাজেই এই দুইয়ের মধ্যে নিত্য সম্বন্ধ বর্ত্তমান ; যেই তত্ত্ব অধিগত হইলে জীব পাপসংস্পর্শ রহিত ও পাপফলের দ্বারা অস্পৃষ্ট হইয়া অমৃতময় হয়। পরন্তু ইহাতেই পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার সম ভাবাপন্ন মনোভাবের সমতা রূপ (গী ২।৪৮) যোগ সাধিত হইয়া জীবের সংসার আবর্ত্ত হইতে মুক্তি লাভ হয় না। কারণ কর্ম্মকাণ্ড বিনির্ম্মুক্ত সামাজিক জীবন সম্ভব নয় এবং কর্ম্মের স্বভাবই বন্ধন বা কর্ম্মবীজ অনুযায়ী জন্মমৃত্যু রূপ আবর্ত্তে স্থিতি।

পরন্তু চিত্ত যদি পরম ধ্যেয় বস্তু পরমাত্মায় সমাহিত (গী ২ | ৬১) রাখা যায়, তবে ইন্দ্রিয়াদি বিষয়সেবায় ধাবিত না হইয়া, আত্মার স্বরূপানন্দরসে নিমজ্জিত হইয়া যায়। মন তখন এইরূপ নিশ্চিত প্রত্যয়ে স্থিত হয় যে, সুখদুঃখ, আনন্দবেদনা সমস্ত কিছুই কর্মফলের নিয়ন্তা, পরমাত্মা কর্তৃক সংযোজিত এবং তিনিই জীবন পথের পথ নির্দ্দেশক ও সর্ব্বজীবের (গী | ৫ | ২৯) হৃদয়েশ্বর সুহৃদ। এই তত্ত্বজ্ঞানের সার্থক অনুসরণই পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার যুক্ততম (গী ৬ | ৪৭) বা সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ অবস্থা প্রাপ্তি,— যাহা শ্রীগীতার ষষ্ঠ অধ্যায় দ্বাবিংশ, দ্বাদশ অধ্যায় অষ্টম এবং অষ্টাদশ অধ্যায় পঞ্চষষ্টি শ্লোক সমূহের ভগবৎ বাক্যে সমর্থিত।

শ্রীগীতার মতে ইহাই 'ব্রাহ্মীস্থিতি' (২ | ৭২) অর্থাৎ সতত ব্রহ্মভাবে বা ব্রহ্ম জ্ঞানের আস্পৃহায় অবস্থান করিয়া আত্মজ্ঞানে পূর্ণ প্রতিষ্ঠালাভ। আশা আকাঙ্খার নিরসনে, আত্মানুভূতির গভীর স্তরে নিমগ্ন হইয়া, বিরাটের ছন্দে পূর্ণ প্রাণময়, এই অবস্থার স্থিতিতে, সাধকের ভগবানের প্রতি উত্তমভক্তি (১৮ | ৫৪) লাভ হয় এবং সূক্ষ্মবুদ্ধির উন্মেষ ও অন্তরের বিকাশ ঘটিয়া ছন্দোবদ্ধ জীবনে পরম সুখ ও অনাবিল শান্তির (৬ | ২৭) আবির্ভাব ঘটে, জীবনে সেই ছন্দের একবার কিছুমাত্রও প্রতিষ্ঠা হইলে, তাহা আর বিনষ্ট (২ | ৪০) হয়না এবং জীবলীলা অবসান সময়েও, অন্তর নিরবিশেষ ব্রহ্মভাবে উদ্বুদ্ধ থাকায়, সকল কর্ম প্রচেষ্টার মূলে 'অহংপদবাচ্য' কর্ত্তা জীবাত্মা, স্বপ্রকাশ ও সত্যস্বরূপ পরম আমিত্বের আলোকে স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত চিন্ময়দেহে ব্রহ্মধামে ব্রহ্মসান্নিধ্য উপনীত হইয়া থাকেন, যাহা (৫ | ২৪) জীবভাবের লয়ে, অর্থাৎ আমির শরীরাভিমান অবসানে, ব্রহ্মভাবের উদ্বোধনে, ব্রহ্মানন্দময় স্বরূপে (বৃহ | উপ ৪।৪ ৬) স্থিতি,— অর্থাৎ নিত্যবস্তু আত্মার নিত্যধামের নিত্যলীলায় প্রবেশ।

সমষ্টির আত্মা পরমাত্মার সহিত, ব্যষ্টির আত্মা জীবাত্মাকে, যুক্ত রাখিবার বিশেষ উপায় সম্পর্কে, বৃহদারণ্যক পঞ্চমঅধ্যায় চতুর্দ্দশ ব্রাহ্মণের গায়ত্রীকারিকায় গায়ত্রী মন্ত্রে উপাসনায় গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে। ছান্দোগ্যের তৃতীয় অধ্যায় দ্বাদশ খণ্ডে গায়ত্রী জপদ্বারা ব্রহ্মে চিত্ত সমাহিত করিতে উপদিষ্ট। উল্লেখযোগ্য যে, বৈদিক যুগে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে মনোবৃত্তি অনুধাবন করিয়া নির্দ্দিষ্ট বিদ্যার্থীগণকে, আচার্য্যকর্ত্তৃক গায়ত্রীমন্ত্রে দীক্ষাসংস্কার করিয়া, 'দ্বিজ' বলা হইত, ইহাদের মধ্যে বেদশাস্ত্রে পারদর্শীকে 'বিপ্র' এবং ব্রহ্মগায়ত্রী মন্ত্রসাধনায় সিদ্ধিপ্রাপ্ত ব্রহ্মজ্ঞকে দ্বিজোত্তম 'ব্রাহ্মণ' গণ্য করা হইত,—জন্মনা জায়তে শূদ্র, সংস্কারাৎ দ্বিজ উচ্যতে, বেদাভ্যাসাৎ ভবেৎ বিপ্র ব্রহ্মবিৎ ব্রাহ্মণো ভবেৎ। তাই প্রাচীনকালে সংস্কৃতি সম্পন্ন শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রই 'ব্রাহ্মণ' স্বীকৃত হইত এবং জ্ঞানদীপ্ত পূত চরিত্র ব্রাহ্মণের উপর সমাজের

নেতৃত্ব অর্পিত থাকিত। পরিশেষে বহিরাগত বিবিধ সভ্যতার উদার সংমিশ্রণজনিত পরিস্থিতিতে, রক্তের বিশুদ্ধি রক্ষার প্রয়োজনে বর্ণ নির্ণয় জন্মগত হইয়া পড়ে। মহাভারত শান্তিপর্ব্বে (১৮৮/১০-১৪) কর্মদ্বারাই বিভিন্ন বর্ণ নির্ণয়ের উল্লেখ এবং ব্রাহ্মণের পক্ষে গায়ত্রী মন্ত্র জপ না করা প্রত্যবায় নির্দিষ্ট। কারণ বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ গায়ত্রী উপাসনায় সত্বর সিদ্ধিলাভ করিতে পারে।

লক্ষ্যণীয় যে, পৃথিবীর সকল জাতির মধ্যেই প্রকারান্তরে বর্ণবিভাগ বিদ্যমান। মুসলমান সম্প্রদায়ে জাতিভেদ না থাকিলেও, বর্ণ বৈষম্য রহিয়াছে। দৃষ্টান্ত উল্লেখে বলা যায়,— আশরফ বা শরিফ বলিতে, নেতৃস্থানীয় বা উচ্চ শ্রেণীভুক্ত, সৈয়দ, শেখ, মুঘল, পাঠান, মীর্জ্জা, কাজী প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত বংশ পরম্পরাকে নির্দেশ করে। আজলফ বা আতরাফ বুঝায়, নিম্নশ্রেণীর চাষী, জোলা, কুলু, কসাই, ধোবা, মুচি গোষ্ঠিকে। অবনমিত শ্রেণী ভুক্ত মেথর, ধাঙ্গর, ঝাড়ুদার দিগকে 'আরজাল' বলা হয়। পরন্তু সাধনবলে সিদ্ধিপ্রাপ্ত ব্যক্তি, 'অলইনসানুল কামিল' আখ্যায় সর্ব্বাপেক্ষা সম্মানিত ও সমাদৃত। খৃষ্টিয় সমাজে পাদরী ও বৌদ্ধ সম্প্রদায়ে ভিক্ষু বা চতুরাশ্রমী সন্ন্যাসী, তুলনীয়।

সাংসারের মোহ কোলাহলে পীড়িত হইয়া, যদি কোন বিগ্রহের সম্মুখ সম্মুখে উপনীত হওয়া যায়, তবে চিত্ত এক অদৃশ্য শক্তি প্রভাবে যেন কল্লোলহীন হইয়া, কল্যাণ স্পৃহার জাগরণে স্বাচ্ছন্দপূর্ণ হয়। কিন্তু নাম, রূপ পূজা প্রকরণ হইতে উন্মুক্ত, সত্যানুসন্ধানের সংবেদে পূর্ণ, গায়ত্রী উপাসনায়, বাসনা কামনার অনুভূতি রহিত অন্তঃকরণ, এমন এক অনির্ব্বচনীয় দিব্যজীবন লাভের স্বল্প অনুভূতির গভীর-স্তরে নিমগ্ন হয়.- যাহা বৃহত্তর স্বরূপের মানস প্রত্যক্ষ। অর্থাৎ জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মে প্রকাশ রূপতার স্থলে, আনন্দ স্বরূপ রমণীয়তার প্রতিষ্ঠা।

উপনিষদ মতে এই অবস্থা অতিমানস চেতনার স্তর বা ব্রহ্মস্বরূপে অবস্থিতি,- অথবা প্রাণের সহিত নিগূঢ়ভাবে সংবদ্ধ, কর্মানুযায়ী উদ্বোধিত সূক্ষ্মভাবনার উপর স্থিত, আসক্তির কর্মগ্রন্থীরূপ সঙ্কীর্ণতা হইতে মুক্তি কিংবা যাঁহার অপ্রতিহত শক্তিতে বিশ্ব নিয়ন্ত্রিত, বিধৃত ও অনুপ্রাণিত, সেই বিশ্ব পুরুষের ভাবাপন্ন বা তাঁহার সহিত সহিত একাত্মা হইয়া উঠা। ইহার মর্মার্থ, বিশ্বসত্তার সহিত অভিন্নতা বোধ নয় এবং বিশ্বের অন্তর্য্যামী পুরুষের সহিত, অন্তরের অন্তর্য্যামী পুরুষের, সর্ব্বক্ষণ সর্ব্বাবস্থায় যুক্ত থাকার অনিবার অনুভব।

তাৎপর্য্য এই, প্রকৃতির প্রেরণায় জাগতিক বিষয় ব্যাপারে অবিরত অতৃপ্ত চিত্তের মধ্যেও, যে আনন্দানুভূতির স্বাভাবিক বা স্বতঃ প্রবৃত্ত বৃত্তি চিরজাগ্রত,-

আমি আমার ধর্ম

অত্যন্ত গম্ভীর গায়ত্রী মন্ত্রের অন্তর্নিহিত শক্তি প্রভাবে, পার্থিব সম্পর্ক শূন্য, ক্ষুদ্র অভিনিবেশ হইতে মুক্ত,- সেই নিরুপাধিক অনাবৃত চেতনাকে, দিব্য ও রমণীয় করিয়া, অন্তরে কল্যাণ স্পন্দনের চির প্রতিষ্ঠ;- কিংবা যাঁহার চাইতে বৃহত্তর আর কিছুই না,- সেই অসীম সত্তার বিরাটত্বের ক্ষেত্রে, তাঁহার স্বতঃ স্ফূর্ত আনন্দময় স্বরূপের সহিত,- অর্থাৎ ঈশ্বর পরমাত্মা বা ব্রহ্মের সগুণ মূর্তির সাথে, জ্ঞানস্বরূপ 'শুদ্ধ আমির' নিবিড় পরিচয় লাভরূপ প্রিয় সম্মিলন,- যাহা অজ্ঞানে আবরণ হইতে মুক্ত, প্রশান্ত অমল জ্যোতিতে ভাস্বর; ব্রহ্ম সন্নিধির অধীন নিত্য কমনীয় মূর্ত্ত বিকাশের, অপরিমেয় শাশ্বত আনন্দে আমি বোধের নিত্য অবস্থা

ভাবার্থ এই,- ব্রহ্মানুসন্ধান তৎপর সাধকের হৃদয় গুহা হইতে, উর্দ্ধে প্রসারিত সূক্ষ্মপথ অবলম্বনে, যেন ব্রহ্মসান্নিধ্যে ব্রহ্মময় হইয়া আমি সত্তার ব্রহ্মানন্দে অবাধ বিচরণ,-যাহা জ্ঞানময়, আনন্দময়, কল্যাণময় দিব্যভূমিতে অবস্থিতি। এই মহোত্তম ভূমিকায় স্থিত থাকিয়া, নিঃস্বার্থ সেবাব্রতের অনুসরণে বা সংসার কর্ত্তব্য পালনের যেই কর্ম করা হয়, তাহাই কর্মযজ্ঞ বা ভগবৎ আরাধনা কিংবা শুচিতা ও পবিত্রতায় পরিপূর্ণ হইয়া ওঠা এবং ইহাই জীবের যথার্থ ধর্ম।

এই চলমান জীবনের শেষ গন্তব্যস্থল শ্মশান,- শেষ নিদর্শন চিতভস্ম। তথাপি এই ক্ষণস্থায়ী জীবনকে চিরস্থায়ী ভাবিয়া, ইহাকে সুসজ্জিত রাখিবার অক্লান্ত প্রয়াস, অহর্নিশি দুশ্চিন্তা, অবিরাম জীবন সংগ্রাম। ইহাই মায়ামুগ্ধ জীবজীবনে স্বধর্ম বিচ্যুতি। কারণ দিন ও রাত্রির পাশাপাশি অবস্থানের মত, পার্থিব জীবনে জীবন ও মৃত্যু পার্শ্ববর্ত্তীভাবে বিরাজমান,- অথবা জাগরণ ও নিদ্রিত অবস্থার ন্যায়, একই সূত্রে গ্রথিত,- কিংবা আলোকের সাথে আঁধারের মতন, পরস্পর সংলগ্ন। জন্ম হইলে, তাহার মৃত্যু অনিবার্য্য,- অর্থাৎ জাতব্যক্তির মৃত্যু নিশ্চিত এবং স্বীয় কর্মানুসারে মৃতব্যক্তির নবীন দেহে পুনরায় ধরার ধূলিতে জন্ম গ্রহণ অবশ্যম্ভাবী। ইহা গীতা ও কঠোপনিষদের আপ্তবাক্যে প্রতিপাদিত এবং এই ধ্রুব বিশ্বাস যুগযুগান্তর ব্যাপী মানবমনে অহরহ প্রবহমান রহিয়া, কেবল যে অনুভবে প্রতীয়মান,- শুধু তাহাই মাত্র নহে,- পরন্তু ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ প্রতিদিনই পাওয়া যাইতেছে। তথাপি ইহাই বিস্ময়কর ব্যাপার যে,- জীবাত্মার এই একান্ত অনিবারণীয় গতাগতি বা দুঃখময় সংসারে পুনঃপুনঃ দেহ ধারণরূপ পরিণামের কথা ভুলিয়া থাকিয়া, কেবল ইহলোকের ক্ষণস্থায়ী মান মর্য্যাদা ও প্রতিষ্ঠালাভের অলীক মোহে, তৎপ্রতীকার সম্পর্কে অবহিত হইনা বা বিষয়াদি নিরপেক্ষ অলৌকিক আনন্দলাভের প্রয়াস করি না।

আমি ও আমার ধর্ম

সকল্পের সঙ্কারণে প্রাণক্রিয়াশীল হইলেই প্রকাশশশীল মনের জাগরণ ঘটে এবং প্রণালীবদ্ধ আন্তর ক্রিয়াতেই মনের শুদ্ধ বিকাশ। তাই উচ্চতর স্পন্দন বা দিব্যানুভূতি লাভের জন্য জড়ভূত মনের জড়তা বা বহির্মুখীনতা অতিক্রম করিতে, প্রতিদিন অন্ততঃ সকাল সন্ধ্যায় ভগবৎ প্রণিধান প্রয়োজন,- আবশ্যক সতত পরমার্থ চিন্তন, সৎসঙ্গ সৎগ্রন্থ অনুশীলন, এই কর্ম পারাবার সংসার ক্ষেত্রে থাকিয়াই সর্বক্ষণ, বিশ্বাত্মা, বিশ্বনিয়ন্তা, বিশ্বকর্তা, ভগবানের প্রতি মনোনিবেশ দরকার ইহাতেই অন্তঃকরণ ক্রমশঃ দিব্যদীপ্তিতে উজ্জ্বল হইয়া উঠে, বিষয়ের মধ্যেও ব্রহ্ম সংস্পর্শ অনুভূত হয়,- মানস জ্ঞানকে অতিক্রম করিয়া, সত্য সঙ্কল্পের গতি অপ্রতিহত থাকে,- অর্থাৎ অজ্ঞানের আবরণ হইতে মুক্ত অন্তর স্বচ্ছ হয়,- স্বভাবজাত প্রবৃত্তি শান্ত হইয়া আসে,- ব্রহ্মস্বরূপত্ব। সুস্পষ্ট হইয়া প্রাণমন পূর্ণানন্দে প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

উল্লেখযোগ্য যে, চিত্ত স্বচ্ছ না হইলে সর্বজীবে ব্রহ্মরূপ বা ব্রহ্মের অধিষ্ঠান অন্তরে প্রতিফলিত হয়না এবং উপাসনা দ্বারাই বিশ্বচেনার সহিত জীবচেতনার প্রভেদ অপসারিত হইয়া. অন্তরে ও বাহিরে কল্যাণরূপের অনুভাবে চিত্ত, স্বচ্ছতা ও স্বাচ্ছন্দ্যে পূর্ণ হইয়া দিব্যভাবে অনুপ্রাণিত হয়। এই ভক্তিস্নাত অন্তঃকরণ কেবল দিব্য বুদ্ধিই প্রকাশ করায় না,- আকর্ষণ করে দিব্য প্রসাদ, জীবনে ঘটে ঐশী শক্তির আবির্ভাব,- যাহা ভগবৎ কৃপাশক্তি লাভের অন্তরায় অপসৃত করিয়া মুক্তিপথ প্রশস্ত করে। শ্বেতাশ্বতর ও কৌষিতকী উপনিষদে নিমুক্তি প্রাপ্তি জন্য ঐশ্বরিক কৃপার উল্লেখ রহিয়াছে।

অতএব ইহাই সিদ্ধান্ত হয়-, বিশ্বজগতের যিনি সবিতা-, যিনি সর্বপ্রাণীর সৃষ্টি ও পালন কর্তা,- ধারণাতীত এই বিপুল বিশ্বের অনন্ত সম্ভার, শ্বাস প্রশ্বাসের মত প্রতি মুহূর্তেই যেই ব্রহ্মসত্তা হইতে স্বতঃই বিকীর্ণ হইতেছে,-যাঁহার অসীমশক্তির বশীভূত রহিয়া চন্দ্রসূর্য্য গ্রহতারকা অন্তহীন শূন্যপথে অবিরাম প্রধাবিত, অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড মহাকাশে বিরাজিত,-ব্রহ্মরূপে যিনি সকলের আশ্রয়,-পরমাত্মা ভাবে ব্যষ্টি জীবের অন্তর দীপ্ত ও নিয়মিত করিতে, অন্তরের অন্তর্যামী হইয়াও, অন্তরদ্বারা পরিচ্ছিন্ন বা সীমাবদ্ধ নহেন,-অমৃতলোকের অধিবাসীস্বরূপে সগুণ মূর্তির স্বমহিমায় পরম ঈশ্বর,- যাঁহার সহিত মানসিকভাবে যুক্ত থাকিলে, জাগতিক যাবতীয় স্পন্দন, মহীয়ান গবী য়ান হইয়া, প্রাণ মনবুদ্ধির সূক্ষ্মতায়, চেতনার গভীর স্তরে, দিব্যস্বচ্ছতা, দিব্যবোধের আবির্ভাব ঘটে অন্তঃকরণ ছন্দোবদ্ধ হইয়া, ক্রমশঃ কারণাতীত বিরাটের বা ব্রহ্মবোধের উপলব্ধিতে, জীবনময় লক্ষ্য বা আদর্শ হয়, তাঁহাকে সর্বান্তঃকরণে বরণ

করিয়া, উদার তৃপ্তি ও অতুলনীয় শান্তির জ্ঞান বৈরাগ্য অনুভবে, তাঁহার পরমা নন্দময়তা আস্বাদন করা। অর্থাৎ সগুণ ব্রহ্মানুভূতিতে মগ্ন থাকিয়া, ঋতময়, জ্ঞানময়, আনন্দময় সত্তায় অবস্থিতি, যেই অবস্থা প্রাপ্তি ঈশ্বরে লীন না হইয়া তাঁহার জ্ঞান, আনন্দ ও ঐশ্বর্যে প্রতিষ্ঠা বা দিব্যস্বচ্ছতা, দিব্যতেজ ও দিব্যানন্দে অবস্থান।

যেহেতু বোধি বা পরমজ্ঞানের মাধ্যমেই, সকল কারণের কারণ,-বিশ্বপ্রজ্ঞা, বিশ্বপ্রাণ, মানবিক সম্বন্ধের অতীত, সেই বিশ্বেশ্বরের সহিত আমাদের যোগসূত্র এবং অস্মিতাসূত্রের সহিত, মহান আত্মার বা ব্যষ্টিক অন্তরদীপ্তির সহিত, বিশ্ব দীপ্তির নিগূঢ় সম্পর্ক রহিয়াছে,-তাই ধী-শক্তির চিন্তাসূত্রে, অর্থাৎ বিশ্বের সকল পদার্থে মানসদৃষ্টির অতীত ব্রহ্মদৃষ্টি স্থাপনদ্বারা, মানবীয় বৃত্তি দূরীভূত করিয়া, ব্রহ্মদীপ্তিতে উজ্জ্বল প্রাণমনবুদ্ধির সূক্ষ্মতা ও সমতাদ্বারা, অস্মিতায় ভাগবতীয় বৃত্তি স্থাপনের প্রয়াসে, অর্থাৎ ঐশ্বরিক শক্তির সহিত, ঐক্য অনুভবদ্বারা জীবন্মুক্তির উদারতৃপ্তিরূপ অতুলনীয় শান্তি আস্বাদনের মানসে,-অধ্যাত্ম ভক্তির মৌনস্বচ্ছতায়, প্রাণের অভ্যন্তরে হৃদয়াকাশে সদা সন্নিবিষ্ট সর্বান্তর্যামী পরমাত্মা পরমব্রহ্মকে তাঁহাতে প্রবেশের সহায়ক 'ধ্যান' বা প্রতিনিয়ত স্মরণ করিতে হইবে এবং ইহাই জীবাত্মা বা আমার ধর্ম।

প্রদীপ হস্তে অন্ধকার গৃহে প্রার্থিত বস্তু অন্বেষণ করিয়া তাহা হস্তগত হইলে, যেমন হস্তধৃত প্রদীপ পরিত্যাগ করা হয়,-সেইরূপ অভীষ্ট বস্তুর সন্ধান মিলিলে, জ্ঞানদীপের আর প্রয়োজন বোধ হয় না। কারণ যুক্তি নির্ভর শাস্ত্রজ্ঞান কেবল তত্ত্ববস্তু নিরূপণ করিতে পারে মাত্র। কিন্তু অতীন্দ্রিয় বস্তুলাভ অথবা সংসারের অসংখ্য বন্ধন মধ্যে, বিষয়ানুরাগ দমন করিয়া, অহং কর্তৃত্বাভিমানের অসত্যভূমি হইতে, মহানন্দময় ব্রহ্মানুভূতির সত্যভূমিতে উপনীত করাইতে পারে না। প্রয়োজন বুদ্ধিবৃত্তির সাধারণ সঙ্কীর্ণতা হইতে মুক্ত হইয়া, জ্যোতির্ময় ব্রহ্মসত্তার সহিত পরিচিত হইবার অভিলষিত অন্তরে কোন জীবমন্ত্র অবলম্বনে ঐকান্তিক ভক্তিপথে ভগবৎ পরায়ণতায় অভিনিবিষ্ট থাকা। কারণ বেদমন্ত্র এমনি শক্তির দোতক যে, তাহা বিষয়ে আকৃষ্ট চেতনাকে ক্রমশঃ বৃহত্তরবোধে প্রতিষ্ঠিত করিয়া ইষ্টলাভ ত্বরান্বিত করে,-আমিত্বের সমুজ্জলিত প্রকাশে অন্তঃ জগতের ক্ষুদ্রতা অপসারিত হইয়া যায়, দিব্য সংস্কার প্রাপ্ত হইয়া, অন্তর দিব্যভাবে অনুপ্রাণিত হয়।

যেহেতু জীব জীবনে লক্ষ্য একাধিক ; প্রাপ্তির ইচ্ছারও অবধি নাই ; তাই বিফলতা ও অশান্তির আঘাতও অত্যধিক। এইক্ষেত্রে চিত্তকে যদি মহত্তম নিত্যবস্তুর প্রতি আকৃষ্ট বা অনুরক্ত করান যায়, তবেই অনিত্য বিষয়াভিলাষ নিকৃষ্টবোধ হইয়া,

পরাশান্তির আলোকিত আঙ্গিনায় প্রবেশ লাভ ঘটে। তাই ভগবানকেই একমাত্র আকাঙ্খিত বস্তুরূপে জীবনের লক্ষ্য স্থির করিয়া, ভক্তিপথে নিত্যই তাহাকে চিত্ত ভরিয়া বরণ করিতে হইবে। সর্ব্ব সংশয় মুকত বুদ্ধির অতীত, অমৃতময় কল্যাণরূপে, যিনি জীবহৃদয়ে নিত্যবিরাজিত, আত্মসমর্পণরূপ আন্তরিক তর্পণে তুষ্ট করিয়া, ভকতি যোগে তাঁহার সহিত যুকত থাকিতে হইবে। ভকতি সূত্রেই বাঁধিতে হইবে, ভকতানু গ্রহ কাতর ভগবানকে। ইহাই উপনিষদের উপাসনা, যাহা বিশ্বপ্রাণের নিস্তরঙ্গ মহিমাকে অনুভবের দ্বারা আনন্দ লাভ করা।

ভগবদ্ভকতি বিহীন শুষ্কজ্ঞান জীবনকে ব্যর্থতার বিতৃষ্ণায় বিফল করিয়া দেয়। রকতবর্ণ পলাশ কুসুম পক্ষীকুলের নিকট ক্ষণিকের বিভ্রান্তি সৃষ্টি করিলেও, মধুগন্ধহীন বলিয়া তাহা যেমন অচিরেই পরিত্যক্ত হয়, ঠিক তেমনি শাস্ত্রজ্ঞানের বিরাট পাণ্ডিত্য আপাত চমক জাগাইলেও, তাহা মুমুক্ষুর মনোহরণে ব্যর্থ হয়; যেমন বরফ, জলেরই রকমফের হইয়াও, তৃষ্ণা নিবারণ করিতে পারেনা। পরন্তু বহুবিদ্যায় সমৃদ্ধ জ্ঞান মস্তিষ্ক পুষ্ট করিলেও, হৃদয় শুষ্ক রহিয়া যায় বলিয়া, জ্ঞানীর অহংকৃত অন্তরের অন্ধকার কারাগারে অবরুদ্ধ, ভকত বৎসল ভগবান প্রেমময়রূপে সম্যক প্রকাশিত হইতে পারেনা ; জ্ঞানের দীপ্তশিখা কেবল উর্দ্ধপুণ্ড্ররূপে ললাটেই বিরাজ করে; অন্তর স্পর্শিত হয়না।

জ্ঞানমার্গ তত্ত্বজিজ্ঞাসার লক্ষ্য যুকতির; অর্থাৎ বুদ্ধিবৃত্তির প্রতি এবং ভকতিমার্গে তত্ত্বের রসাস্বাদনের দৃষ্টি চিত্তের, অর্থাৎ হৃদয়বৃত্তির দিকে। তাই ত্রিগুণ নিরাকার নির্বিশেষ, পরমব্রহ্মের তত্ত্বজ্ঞান আয়ত্ত করিয়া, তাঁহার শাসকরূপের স্থলে, চিরনবীনতায় চিরবিদ্যমান, লীলাপুরুষোত্তম রূপের সর্ব্বভূত মনোহর মহিমময় পরমকরুণার মহিমা, উপলব্ধি করা যায় না এবং ভকতিলভ্য দিব্যবোধে জীবাত্মার ধর্ম, পরমাত্মার প্রতি প্রিয়ত্বে চিত্ত উদ্বুদ্ধ না হইলে, লোকচিত্ত অভিভূত করিয়া, তাহাতে চিরস্থায়ী প্রভাব বিস্তার সম্ভব হয় না। তাই শাস্ত্রজ্ঞানকে বলা হয় 'প্রয়োজন তত্ত্ব' এবং ভকতি যোগ সাধনতত্ত্ব'। নৌকা অবলম্বনে নদীতীরে পৌঁছিয়া, যেমন তাহা পরিত্যকত হয়; তেমনি জ্ঞানরূপ তরণীসহায়ে ভকতি রাজ্যে উপনীত হইলে, ভকতিভাবই আলোকবর্ত্তিকা হয়, জ্ঞানালোকের প্রয়োজন থাকে না।

সূর্য্যকিরণ ধারায় কোমল কুসুম কলিকায়, যেমন একে একে শতদল বিস্তারিত হয়, তেমনি অন্তরভকতিরস সিকত হইলে ক্ষীণসত্তা হইতে মুকত জীবাত্মার বিকশিত হইয়া পরিপূর্ণ শুদ্ধ প্রেমে অসীমসত্তা, পরমাত্মার প্রতি অর্ঘ্যরূপে নিবেদিত হইবার যোগ্য হয়। এই যোগ্যতা কোন অর্জিত শকতিলাভ নয়; পরন্তু উদার জ্ঞানের সহিত

অলৌকিক ভক্তি মাধুর্যের সংমিশ্রণে, মানবত্বের স্থানে অতিমানবত্বের প্রতিষ্ঠা বা দিব্য প্রেমে অন্তর উদ্ভাসিত রাখা। জীবাত্মা যখন জীবত্বের সংস্কার হইতে মুক্ত হয়, তখনই ভগবৎ প্রেম প্রতিষ্ঠিত।

অন্তরের দীপ্তিতে প্রকৃতি প্রভাব মুক্ত হওয়া ব্যতীত; মহনীয় সত্তার বিরাটানুভূতিতে আত্মমগ্ন থাকা কিংবা অধ্যাত্মশকতি ও সামর্থ্যকে জাগরিত করিয়া, চিত্তকে বিশ্বাতীত সত্তাব প্রতি উন্মুখ করা সম্ভব নয়। তাই ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধির পরিধি হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রাকৃত অনুভূতির গভীর স্তরে নিমগ্ন, অলৌকিক আনন্দ অনুভবের ভূমিকায় অন্তরকে উত্তীর্ণ করিয়া, অন্তঃপ্রেরণাকে ঈশ্বরানুভূতির দিকে অগ্রসর রাখিতে, শুদ্ধাভকতি বা ভগবানের প্রতি পবিত্র প্রেম প্রয়োজন এবং ঊর্দ্ধভূমির শক্তি দ্বারা সঞ্চারিত, ইহাই প্রকৃষ্ট পন্থা। কারণ ভগবান ভকতহৃদয়ের স্বতঃস্ফূর্ত প্রেম মাধুর্য্যের ভোকতা এবং তাঁহাকে সদা সর্ব্বান্তঃ করণে স্মরণেই এই বিস্মৃত সৌহার্দ্দ্য সজাগ হয়।

মানবজীবন দুঃখে ভরা। সংসারের দুঃখজ্বালার যেন অবধি নাই। তাই দুঃখ দূর করিয়া, সুখলাভ করিতেই জীব সদা সচেষ্ট। কিন্তু জাগতিক কোন উপায়ে প্রারব্ধজনিত সংসার দুঃখের নিবৃত্তি হয়না। শ্রুতিতে তাই দুঃখের কারণ ও তাহা নিরাকরণের উপায় সম্পর্কে বলা হইয়াছে যে, ক্ষুদ্র প্রাপ্তিতে সীমাবদ্ধ অন্তরের অতৃপ্তিই দুঃখদায়ক, অনাবৃত অন্তর অসীম বা ব্রহ্মের সহিত যুকত হইলেই দুঃখের চির নিবৃত্তি বা মনের আরাম, যেমন গ্রীষ্মকালীন তাপে তপ্ত বদ্ধগৃহের গবাক্ষ উন্মুক্ত করিলে আপনা হইতে শীতল বাতাস সঞ্চারিত হয়।

উপনিষদ মতে ব্রহ্ম বা ভূমা, ইন্দ্রিয়মন বুদ্ধির অতীত হইলেও, 'উপাসনা সহায়ে যতই তাঁহার সমীপবর্ত্তী হওয়া যায়, অন্তঃকরণে ততই দুঃখাতীত অবস্থার উদ্ভব ঘটে। বেদান্তদর্শনে বলা হইয়াছে,—জীবের মধ্যে এমন যোগ্যতা সুপ্ত রহিয়াছে, ধ্যান যোগে তাহা উজ্জীবিত করিলে, ব্যষ্টিজীব ব্রহ্মভূত হইয়া দুঃখবিনির্মুকত ভূমিতে উপনীত হইতে পারে। পরন্তু শ্রীমদ্ভাগবতের অপূর্ব্ব সংবাদ এই, শ্রবণমন রসায়ন মধুময় ভাগবতীয় কথা শুনিলেই, জীবনে কল্যাণোদয় হইয়া, দুঃখের আশু উপশম হয়।

তাৎপর্য্য এই, দুঃখতপ্ত কলিগ্রস্ত সংসারী লোকের পক্ষে, ধ্যান উপাসনা দ্বারা অন্তরের পূর্ণ বিকাশে ব্রহ্মজ্ঞান লাভের যোগ্যতা অর্জ্জন করিয়া, প্রসন্নাত্মা অবস্থায় স্থিতিলাভ করা, বস্তুতঃই সময়সাধ্য, কঠিন সাধনা,- যদিও শাস্ত্রানুমোদিত ভজন, পূজন, আরাধন,-চিত্তমার্জ্জন বা অন্তরের আগন্তুক মালিন্য অপসারণের এবং চিত্তবৃত্তি নিরোধের উপায়। পক্ষান্তরে ভাগবতীয় কথায় অনুগূঢ় চিত্তাকর্ষকারী

মাহাত্ম্য রহিয়াছে যে, ইহা কেবলমাত্র শ্রবণেই অশেষ মঙ্গল হয়। অর্থাৎ চিরকল্যাণ প্রদ হরিভক্তি রসমাধুর্য্যে, চিত্ত তদ্বৎ তৎপর বা কৃষ্ণানুপ্রাণিত হইয়া, পরমানন্দ এবং সুখস্বরূপ পরমকীর্ত্তি মুরারি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অশেষ অনুরক্তি আনয়ন করিয়া, এমনি মঙ্গলময় পরমাশ্রয় বিধান করে, যাহাতে জীবনে কখনও বিপদগ্রস্ত হইতে হয় না;-অধিকন্তু জীবনযাত্রা অবসানে জীবাত্মার পরমধামে গতিলাভ হয়। ইহাই শ্রীমদ্ভাগবত মহাগ্রন্থের নিরুপম সংবাদ বা পরম করুণার মঙ্গলময় বার্ত্তা।

'মঙ্গল' কথাটির আভিধানিক অর্থ 'কল্যাণ, এবং যেই কথা সাহিত্য শ্রবণ মনন ও অনুশীলনে অকল্যাণ অপসৃত হইয়া, ত্রিতাপ দগ্ধ জীবজীবনে সুশীতল শান্তিবারি সিঞ্চিত হয়; দুঃখজ্বালা দূর হয়, মনের মালিন্য অপসারিত হইয়া মঙ্গল আলোকে অন্তর উদ্ভাসিত হয়,— তাহাই 'মঙ্গলকথা' বা কথামৃত। সার সংক্ষেপ পূর্ব্বাপর সঙ্গতি রাখিয়া, পরিশেষে মঙ্গলেরও মঙ্গল, ভক্তিরসামৃত কথা উপস্থাপিত।

—×—

" সারথি যেমন নিজের রথের অশ্বদিগকে তার,
সংযত রাখে কৌশল করি, রশ্মিতে বারে বার,
সেইমত ঠিক বিষয় বাসনা অভিমুখে ধাবমান,
ইন্দ্রিয়গুলি সংযমে রাখে, যারা হয় বিদ্বান" (মনুসংহিতা)

"Thus constantly his mind to me, the jogi of discip-llnd mind, attains the everlasting peace, consisting of supreme bliss, which abides to me." Gita 6/15

" জীবনে সুখদুঃখের কোনটাই সত্যি নয়, সত্য তার চঞ্চল মুহূর্ত্তগুলি, শুধু তারা চলিয়া যাইবার ছন্দটুকু।" শরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (শেষপ্রশ্ন)

"যাহা যথার্থ গভীর এবং স্থায়ী, তাহার মধ্যে বিনা চেষ্টায় বিনা বাধায়, আপনাকে সম্পূর্ণ নিমগ্ন করিয়া রাখা যায় বলিয়া তাহা গৌরব আমরা বুঝিতে পারিনা। যাহা চঞ্চল ছলনা মাত্র, যাহার পরিতৃপ্তিতেও লেশমাত্র সুখ নাই, তাহা আমাদিগকে পশ্চাতে ঊর্দ্ধশ্বাসে ঘোড়দৌড় করায় বলিয়াই, তাহাকেই চরম কামনার ধন মনে করি।" রবীন্দ্রনাথঠাকুর (চোখের বালি)



আমি ও আমার ধর্ম

পরিশেষ

"জড় তামস খণ্ড উত্তীর্ণ, ক্লান্তিজাল করো দীর্ণবিদীর্ণ,
দিনঅন্তে অপরাজিত চিত্তে, মৃত্যু তরণ তীর্থে করো স্নান।"

সারাজীবনের অক্লান্ত প্রয়াসে, যখন নিজের ইচ্ছায় কিছুই ফলবতী হয় না এবং নিঃসংশয়রূপে আশ্রয় করিবার মতজগতে কিছু পাওয়া যায়না,- তখনই মানব জীবনে অন্তর্বেদনার সূচনা ঘটিয়া,প্রকৃত জীবন জিজ্ঞাসার জাগরণে অন্তরে ধর্মবুদ্ধি সূচিত হয়,- ইহাই শ্রীমদ্ভাগবত গীতার প্রথমঅধ্যায় বিষাদযোগের বিশেষ তাৎপর্য্য। অধিকন্তু প্রতিনিয়ত লক্ষ্য করা যায়,- একদিকে জন্মলাভ করিয়া, অপরদিকে তাহাই মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে। মৃত্যুর সাথেই কি জীবজন্মের সমাপন,- অথবা চলমান জীবন অবসানের পরও কি কোনভাবে তাহার অস্তিত্ব রহিয়া যায়,- এই বেদনা পীড়িত প্রশ্ন, স্বতঃই চিন্তাশীল মনকে ব্যাকুল করে। তাছাড়া এই দৃশ্যমান পৃথিবীতে যতকিছু বিরাট ও মহান, তাহাদিগের পরিচালক শক্তি. নিশ্চয়ই ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র প্রাণী হইতে আরম্ভ করিয়া বুদ্ধিজীবি মানবেরও চালক,- তাঁহার সহিত, বা কিভাবে সংযোগ স্থাপন করা যায়,- ইহাই যথার্থ ধর্ম জিজ্ঞাসা,- যাহা অন্তরে উদিত হইলে অন্তরের আলোকই পথ প্রদর্শন করায়।

বস্তুতঃ এমন একটি অধ্যাত্মশক্তি বা তত্ত্বপরিনাম রহিয়াছে, যাহা লাভ হইলে এই দুঃখময় ও মৃত্যু আকীর্ণ সংসার ভূমিতে পুনরাবর্ত্তন রূপ জন্ম গ্রহণ ঘটে না,- গতি হয় উর্দ্ধ লোকে,- ভগবৎ ধাম অভিমুখে এবং এইরূপ সার্থক পরিণতি লাভের প্রয়াসই, জীব জীবনের শ্রেষ্ঠ ব্রত,- সকল সাধনার সামগ্রিক লক্ষ্য।

আমরা যখন জড়ের মধ্যে প্রাণ প্রকাশ লক্ষ্য করি,- তখন ক... আশ্চর্য্য বোধ করিলেও, প্রাণের মধ্যে মানস চেতনার উন্মেষে বিচলিত হই-, এবং যখন মনোগত চেতনাকে উদ্ভিন্ন করিয়া, অতি মানসিক চেতনার বিকাশ ঘটে,- তখন সেই অন্তর্মুখীন মনঃ সম্বন্ধীয় ঐশ্বর্য্য. তুলনায় বহির্মুখীন মনের প্রকাশকে ক্ষণিক বা অকিঞ্চিৎকর বলিয়া অনুভূত হয়। কারণ সেই অবস্থায় প্রকৃতি ও জীবনকে পরিব্যাপ্ত করিয়া যেই একটি সুদূর প্রসারী মঙ্গল অভিপ্রায় কাজ করিয়া চলিয়াছে, তাহার যথাযথ উপলব্ধি ঘটিয়া সমাজ সংসারকে বিভীষিকা বলিয়া প্রতীত হয়।

মনুষ্য জাতির ভিতর ভগবানের যে প্রকাশ, তাহা প্রকৃতি জাত বিষয়ের মত সহজ, সুন্দর, শান্ত ও একই নিয়মের অন্তর্গত নয়। মানবজীবনে কর্মানুসারী আঘাত সংঘাত রহিয়াছে, হৃদয়াবেগের প্রাবল্যে বিচিত্র প্রবৃত্তির গোপন প্রয়াসের নির্মম দহন জ্বালা আছে। তদুপরি প্রাত্যহিক জীবনের দুঃখকষ্ট, অভিনব অভি-

ময়ের বিড়ম্বনা বিদ্যমান। ইহারই সহিত নিয়ত সংগ্রামরত থাকিয়া মানুষকে অতি মানবত্ব লাভ করিয়া: পরিপূর্ণ কল্যাণের অভিমুখীন হইতে হয়। ক্রমে ভগবৎ ইচ্ছার নিকট সর্ব্বক্ষণ সমর্পিত থাকায় অভ্যস্ত হইয়া পরিলে, সেই অচিন্তনীয় অসীম কেমন করিয়া সীমারূপে, এই নিখিল বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ও জীব লোকরূপে প্রকাশিত হইলন,- তাহা প্রহেলিকা বলিয়া মনে হয় না। প্রত্যুষের সূর্য্যালোকে যেমন ক্রমশঃ আপ্লুত হইয়া উঠে পূর্ব্ব গগন,- শিহরিত হয় ধরণীতল, ,- তেমনি ঐশ্বরিক প্রভায় প্রদীপ্ত অন্তর, ক্রমে ভগবৎ বন্দনায় মুখরিত হইয়া, দেহেন্দ্রিয়কে নন্দিত করে। অলভ্যকে লাভ করিবার, অধরাকে ধরিবার বাসনা,- আর অক্ষমের বিলাসভাবনা মনে হয় না। বরং ভগবৎ নির্ভরতার মত, আর কোন নিরাপদ আশ্রয় নাই,- ইহাই অন্তরে চির প্রতিষ্ঠিত হয়।

এই মানসিক অবস্থার স্থিতিতে, বিষয়াদিকে বিষম বিষরূপে অনুভূত হয়। মন ও সংসার নিলয়ের সকল ভোগস্পৃহা ও যাবতীয় অনুরাগের বন্ধন হইতে অনেক দূরে সরিয়া গিয়া নবজীবন লাভের পথ অপাবৃত করিয়া দেয়। তখন নিশ্বাস গ্রহণের মতই অন্তরিন্দ্রিয় সেই পরম রমণীয়কে চিত্ত ভরিয়া বরণ করিতে প্রয়াসী হয়। সেই জীবনে সুখদুঃখ বোধ নাই,- উল্লাস বা অনুশোচনা নাই,- লাভ অলাভ, জয় পরাজয়, প্রিয় অপ্রিয়ের দ্বন্দ্ব নাই। এই জীবন আত্মজ্ঞানের স্বর্গীয় আলোক ভাস্বর, সর্ব্বত্যাগের মহিমায় অভিমণ্ডিত এক আলোক সাধারণ, পরম প্রশান্তি-বোধের মহিম জীবন। দেহবোধ থাকিলেও কোনরূপ অভিমান অভিপ্রায়ের বেদনা, এই জীবন্মুক্ত জীবনে কিছুমাত্র কোনরূপ উদ্বেগ বা বিঘ্ন সৃষ্টি করিতে পারে না। নিভৃত অন্তলোকের অতি সুকুমার, অতিশয় পেলব, অত্যন্ত আন্তরিক, অস্ফুট অনুভবের আশ্বাসের আত্যন্তিক অনুভাবনায়,- তখন লোভ অন্তর্হিত হয়,- মোহ বিদূরিত হইয়া যায়। এই পরমপথের পথিককে যেসকল কঠিন কঠোর অগ্নি পরীক্ষার মধ্য দিয়া জীবনপথ অতিক্রম করিয়া চলিতে হয়,- সংসারাসক্ত সাধারণ মানব সম্প্রদায়, সেই গূঢ় কাহিনীর দুঃখদগ্ধ ইতিবৃত্ত, সহজে অনুধাবন করিতে পারে না।

জীব ঈশ্বরাংশ এবং ঈশ্বর সৃষ্টিকর্তা বলিয়া, তিনি একাধারে নিমিত্ত ও উপাদান হওয়ায়,-জীব ও ঈশ্বর স্বরূপতঃ অভেদ। পক্ষান্তরে জীবাংশে মায়া বর্ত্তমান এবং ঈশ্বর মায়াতীত,- সেই কারণে উভয়ে ভেদজ্ঞানও রহিয়াছে। সুতরাং ভগবানের সহিত, জীবের ভেদ ও অভেদ উভয়ই বিদ্যমান এবং বুদ্ধিযোগে মননশীল মানবজাতিতে এই স্বতন্ত্রতা বোধ স্বতঃসিদ্ধরূপে বর্ত্তমান,- যাহা আত্মজ্ঞানহীন ব্যক্তিবর্গের মধ্যে আচ্ছাদিত বা অপরিস্ফুট। তাই কর্ম যখন অবিদ্যাকৃত ভাবনাবশে কেবল নিজের

স্বার্থ সিদ্ধিতে এবং কাম্যবস্তু লাভের অন্যায় আকাঙ্খায় নিয়োজিত হয়,- সেই কর্মজাত সংস্কার বন্ধনের কারণ হইয়া পড়ে। পরন্তু কর্মচিন্তা ও কর্মের আচরণ,- যখন ঈশ্বর উদ্দেশ্য সমর্পিত থাকিয়া চিত্ত ও শ্রীভগবানে নিবেদিত হইয়া যায়, তাঁহাই হয় যথাযথ মনোগত ধর্ম। বৃহদারণ্যক উপনিষদ চতুর্থ ব্রাহ্মণের বত্রিশমন্ত্রে ভগবানকেই পরমানন্দ স্বরূপ উল্লেখ, বলা হইয়াছে,- এই ব্রহ্মানন্দের কণিকামাত্রই প্রাণিগণ বিষয়ানন্দভাবে ভোগ করে। শ্রীগীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের ছেচল্লিশশ্লোকে, নিষ্কাম কর্মদ্বারা চিত্তশুদ্ধ হইলে, এই আনন্দ আপনা হইতেই অন্তরে অনুভূত হয়, কথিত রহিয়াছে,- যেহেতু শুভকর্মের ফলরূপ সমস্ত ক্ষুদ্রানন্দ তখন ব্রহ্মানন্দের অন্তর্ভুক্ত হইয়া যায়।

কর্মে আসক্তি বা ভোগাভিলাষের অভিনিবেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক, অর্থাৎ কর্মজনিত ফললাভের আকাঙ্খা না করিয়া,-ভগবৎ অভিপ্রায়ের প্রতি একান্ত অনুরক্ত থাকিয়া, ভগবানই শ্রেষ্ঠ আশ্রয়,-এইরূপ জ্ঞানে, সিদ্ধি ও অসিদ্ধি উভয়ই তুল্যমূল্য বা সমান ভাবিয়া, সংসারযাত্রা নির্ব্বাহের জন্য যতটুকু প্রয়োজন,-সেই অনুসারে কায়িক, বাচিক ও মানসিক কর্ম করাই জীবের যথার্থ ধর্ম বলিয়া, শ্রীগীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে সুনির্দিষ্ট অভিমত। তৃতীয়অধ্যায়ে এই তত্ত্বেরই প্রণিধান যোগ্য সবিস্তার উপদেশ সন্নিবিষ্ট। চতুর্থঅধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে যে,- যে সকল কর্মের ফল, অর্থাৎ অতীত অনেক জন্মের সঞ্চিত অজস্র সংস্কার এই শরীরে ভোগ বা ভোগোন্মুখ হইতেছে, তাহা ভগবৎ শরণাগতিদ্বারা শুদ্ধ হইয়া পড়ে। ভাবার্থ এই, দীর্ঘকাল প্রযত্নদ্বারা কর্মযোগে চিত্ত শুদ্ধ হইলে, মুমুক্ষু জন্মান্তর গ্রহণ না করিয়াই শাশ্বতী শান্তিময় লোক প্রাপ্ত হন। পঞ্চম অধ্যায়ে কর্মযোগীর লক্ষণ সম্পর্কে বিস্তারিত উল্লেখ রহিয়াছে যে,-ভগবৎ উদ্দেশ্যে কর্মফল অর্পণ করিয়া, তিনি কেবলমাত্র জীবনরক্ষা ও চিত্তশুদ্ধির জন্য শরীর, মন ও মমত্ব বুদ্ধি বর্জ্জিত ইন্দ্রিয় দ্বারা কর্মানুষ্ঠান করিয়া থাকেন। ষষ্ঠঅধ্যায়ে বিবেকযুক্ত মনের সহায়ে নিজেকে সংসার আসক্তির সঙ্কট হইতে উদ্ধার করিবার কথা আছে। দ্বাদশ অধ্যায়ে বলা হইয়াছে,-বিবেকশূন্য অভ্যাস অপেক্ষা, জ্ঞান শ্রেয়ঃ, জ্ঞান অপেক্ষা ধ্যান উত্তম,-ধ্যান হইতেও কর্মফল পরিত্যাগ শ্রেষ্ঠ।

যিনি কামনা পরিহার করিয়া নিস্পৃহ, নিরহঙ্কার ও প্রচেষ্টা বিহীন হইয়া, নিষ্কামকর্ম দ্বারা ভোগ্যবস্তু সমূহ উপভোগ করেন,-তিনি জন্মবন্ধন হইতে চিরমুক্তি লাভ করিয়া থাকেন। অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াদিকে মনের দ্বারা, মনকে বুদ্ধির দ্বারা এবং বুদ্ধির নিয়ন্তার চেতনাকে, পরিণামে দিব্যচেতনার আধারে রূপান্তরিত করিয়া, যে বিষয়ভোগ বা বৈষয়িক কর্মানুষ্ঠান,-তাহা বন্ধনস্বরূপ হয় না,-ইহাই শ্রীগীতার প্রতিপাদিত। তাৎপর্য্য এই,-পরমাত্ত যার পরিতোষ ভিন্ন যাহার অন্য কোন ইচ্ছা বা সাধ্য

বিষয় নাই,-জগতে সেই নিশ্চিত বুদ্ধিই একমাত্র সুবুদ্ধি। যেমন দীপের জ্যোতি কম হইলেও, তেজ প্রকাশে বাধা হয় না,-তেমনি ঈশ্বরের উদ্দেশ্য অনুষ্ঠিত কর্ম প্রচেষ্টা, অতি অল্প হইলেও, তাহাতে নিষ্ফলতা আসেনা,-বরং এইরূপ কর্মানুষ্ঠান বহুবিধ দুঃখবিপত্তি হইতে রক্ষা করে। সূর্য্যের উদয়ে ভালমন্দ সকল পথই দেখা যায় বলিয়া, যেমন নিকৃষ্ট পথে গমন করা সঙ্গত নয়,-তেমনি সুবুদ্ধির উদয়ে হিতা হিত জানলাতে কুকর্মের সহিত সম্পর্ক না রাখিয়া শাস্ত্রবিহিত পথে জীবনযাপনই সব সাধনার সেরা সাধন।

শ্রীগীতায় যাহাকে 'প্রকৃতি' অভিহিত করা আছে, তাহা বিশ্বকর্ত্তার চিৎশক্তির বাহ্যতম বা সৃষ্টিকার্য্য নির্ব্বাহরূপ দেহেন্দ্রিয়াদিতে পূর্ব্ব জন্ম সংস্কারের যেন জমাট বাঁধা অবস্থা,-অর্থাৎ জীবের মধ্যে ইন্দ্রিয় প্রাণমন ও বুদ্ধিকে আশ্রয় করিয়া যে বিশিষ্ট ব্যক্তিগত প্রকৃতি, তাহা জন্মান্তরীণ সংস্কার দ্বারা সৃষ্ট,-যাহা স্থূলদেহে যন্ত্রের মত ক্রিয়াশীল হইলেও, ইহার পশ্চাতে ভগবানের জাগ্রত চৈতন্যের ঐশী অভিলাষ অভিব্যক্ত। তাই কর্মফল ভোগের অন্যথা হয় না এবং স্বভাবতঃ গুণাধীন মানব জীবন, পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত ও সংস্কারগত অভ্যাসের অনুসরণ করিয়া চলে। কাজেই যত কাল প্রকৃতির প্রতিক্রিয়ার পরাক্রম অতিক্রম করিতে না পারা যায়, ততকাল শম ত্যাগ বা কর্ম করিতেছি, ভাবা অজ্ঞানতার পরিচয়,-যেহেতু বিহিত কর্মাদি ত্যাগ করিলেও, ইন্দ্রিয়াদির ক্রিয়া নিবৃত্ত হয় না। বাক্য স্তব্ধ রাখিলেও, শ্রবণেন্দ্রিয় শুনিবার কাজ বন্ধ করে না,-নেত্রও দেখিয়া যায়,-নাসারন্ধ্র গন্ধ গ্রহণ করিতে থাকে,-প্রাণ অপান বায়ুর ক্রিয়া চলিতে থাকে,-চরণের গতি, হস্তের ক্রিয়া নিবৃত্ত হয় না,-মন নির্ব্বিকল্প হইলেও, ক্ষুধাতৃষ্ণার ইচ্ছা অব্যাহত থাকে। মহাভারতের শান্তিপর্বে তাই সংকল্প ত্যাগের উপদেশ এবং ইহাই জীবনের চরম আদর্শ "সংকল্প সন্ন্যাস" নামে শ্রীগীতায় খ্যাত।

প্রকৃতির অধীন এবং মায়াপ্রভাবে বিকার প্রাপ্ত, নিষ্কর্মা ব্যক্তিকেও স্ব-স্বভাব অনুসারে অবশভাবে নিরন্তর কর্মের অনুষ্ঠান করিতে হয়। কারণ কর্মেন্দ্রিয়ের প্রবৃত্তি কে নিরোধ করিলেও, মনে কর্মের ভাবনা থাকিয়া যায়। কাজেই কর্মত্যাগ করিয়া জীবনধারণ সম্ভব নয়। যে ব্যক্তির বাহ্য ব্যবহার লোকাচার সম্মত,-কিন্তু চিত্ত পরমা ত্মার চিন্তায় লীন,-প্রাপ্ত কর্ত্তব্য নির্ব্বাহে অবহেলার অবকাশ নাই,-অথচ কামনার বশীভূত না হওয়ার কর্মরত কর্মেন্দ্রিয়াদির বিকারে ব্যাপ্ত বা মোহে লিপ্ত নহেন,-পরন্ত সাধারণ মানুষের মত আচরণ করিয়াও, সংসারে নির্লিপ্তভাবে বাস করেন, তাঁহাকে শ্রীগীতায় "আশাপাশরহিত" মুক্তপুরুষ বলা হইয়াছে।

যতকিছু কর্ম করা হয়, তাহার শুভাশুভ ফলকামনা শ্রীভগবানে অর্পণ করিয়া, কর্মফলের সিদ্ধি অসিদ্ধিতে সমান জ্ঞান করিবার মনোধর্ম্মের সাম্যভাবকে শ্রীগীতায় "যোগস্থিতি" আখ্যাত। যেহেতু মনে বিষয়বাসনা বা মনোভিলাষ, আত্মসুখের অন্তরায় হয়; তাই যাঁহার অন্তঃকরণ সর্ব্বপ্রকার মনোগত কামনা পরিহৃত হইয়া আত্মজ্ঞানে পূর্ণ, দুঃখে অক্ষুব্ধচিত্ত, সুখে স্পৃহাশূন্য; যিনি অনুকূল বিষয়কে অভিনন্দন এবং প্রতিকূল বিষয়কে দ্বেষ করেন না; চিত্ত পরমাত্মায় নিত্যযুক্ত; অন্তর নিত্যতৃপ্ত,—সেইজন "স্থিতপ্রজ্ঞ" কথিত। সাংসারিক অজস্র দুঃখজ্বালায় জড়িত থাকিয়াও, যাঁহার চিত্ত উদ্বেগহীন; সুখপ্রাপ্তির আর্ত্তি বা ইচ্ছায় মন অভিভূত নয়; কামক্রোধ অন্তরে সাড়া দেয় না; আত্মচিন্তায় নিরবধি স্থিত, তিনি "স্থিরবুদ্ধি"

উত্তম কিছু লাভ হইলেও, সন্তোষ যাঁহাকে বিহ্বল করে না; কোন অপ্রাপ্তিতেও মনে বিষাদ আসেনা, হর্ষশোকরহিত আত্মবোধের আনন্দে অবস্থিত, এই প্রকার লোক "প্রজ্ঞাযুক্ত"। যাঁহার ইন্দ্রিয় ইন্দ্রিয়াদি বশীভূত না হইয়া আত্মজ্ঞানের আলোকে ভাস্বর, বিষয়সংস্পর্শে আসিলেও তাহা জানিবার কৌতুহল হয়না; ইন্দ্রিয়াদি কর্মে প্রবৃত্ত হইলেও, অন্তঃকরণ আশানুরূপ ফল প্রাপ্তির প্রত্যাশায় উদাসীন; দেহের সুখদুঃখে নির্লিপ্ত, তিনি "যোগারূঢ়" সংজ্ঞিত। যথাশক্তি কর্মের আচরণ করিয়াও, নিজেকে কর্মের কর্ত্তা না ভাবিয়া, যিনি কর্মফলপ্রাপ্তির অভিলাষ উপেক্ষা করিয়া চলেন; সংসারমধ্যে বিচরণ করিলেও, নিরাকাঙ্খ বলিয়া যাঁহাকে সাংসারিক ভোগসুখ আকর্ষণ করেনা; আত্মসুখের তৃপ্তিতে সতত মগ্ন থাকায় বাহিরেও আনন্দের অনুসন্ধান করিতে হয় না, তাঁহার অন্তরেই আত্মজ্ঞানের অধিষ্ঠান; তিনি "আত্মতৃপ্ত"।

মনুষ্যলোকই জীবের কর্মাধিকার ভূমি। তাই জগতে কাহারও পক্ষেই কর্মহীন হইয়া জীবনধারণ সম্ভব নয়। যেইরূপ আচরিত কর্মে বুদ্ধির প্রয়োগ নাই; নাই কোন বিচার বিবেচনা; যাহা বালকের খেয়ালী উদ্যোগের ন্যায়, কেবলমাত্র দেহেন্দ্রিয়াদির অলস বা শ্রমবিমুখভাবে কৃত হইয়া থাকে; তাহা "শারীর কর্ম"। কোন অভিপ্রায় ব্যতীত ইন্দ্রিয়াদির অগোচরে, যে সকল ব্যাপার অনায়াসে ঘটিয়া যায়; তাহা "মানসিককর্ম"। কোন কারণ ব্যতিরেকে যাহাকিছু কর্ম সম্পাদিত হয়; তাহা "অনায়ত্ত ইন্দ্রিয় কর্ম"। সবকিছু জানিয়া বুঝিয়া, বিচার বিবেচনা সহকারে যেই কর্ম করা হইয়া থাকে; তাহা "নিশ্চতবুদ্ধিরকর্ম"। কোনরূপ কর্ত্তৃত্বে অভিমানশূন্য হইয়া, যে সকল কর্ম করা হয়, তাহাই "নৈষ্কর্ম"। বৃহদারণ্যক উপনিষদের চতুর্থঅধ্যায়ের চতুর্থব্রাহ্মনের তেইশকারিকায়, ইহাকে ব্রহ্মজ্ঞের নিত্যমহিমা

উল্লেখে বলা হইয়াছে, ইহা কর্মের দ্বারা বর্দ্ধিত বা হ্রাসপ্রাপ্ত হয়না এবং পাপ স্পর্শ করিতে পারেনা। অর্থাৎ কর্ম্মাদি যদি শাস্ত্রসম্মত হয় এবং কামনা বিরহিত ভাবে, যথোচিত উপায়ে কৃত হয়, তবে সেই নিষ্কাম কর্ম গীতোক্ত 'নিত্য যজ্ঞে' পরিণতি লাভ করিয়া মুক্তির কারণ হইয়া থাকে। সুতরাং ইন্দ্রিয়গ্রামকে স্বেচ্ছাচার হইতে না দিয়া, বিবেকের অনুসরণে নিজ বৃত্তি অনুযায়ী আপনাকে ব্রহ্মযজ্ঞে আহুতি প্রদানরূপে অর্থাৎ স্বীয় প্রচেষ্টাকে ভগবৎ বিধানের অনুগত রাখিয়া, কর্মকরা সঙ্গত; যাহা শ্রী গীতায় নির্দ্দেশিত।

জলচর জীব যেমন জলের আশ্রয় পরিত্যাগ করিয়া তীরে উঠিলে, মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তেমনি স্বধর্ম ভুলিয়া স্বভাববিরুদ্ধ ধর্ম অবলম্বন করিলে, দুর্দ্দশা প্রাপ্তিঘটে। তাৎপর্য এই, অপরগৃহস্থ তাদের পক্ষে রুচিকর বা উত্তম; অথচ নিজের পক্ষে নিষিদ্ধ, এইরূপ আহার্য্য দ্রব্য যেমন গ্রহণ করা যায় না; কিংবা অন্যের রমণীয় বাসস্থান দেখিয়া, আপন জীর্ণ কুটির পরিত্যাক্ত হয়না অথবা শর্করা, মিষ্টতার জন্য প্রসিদ্ধ হইলেও, কৃমিরুগীর পক্ষে তাহা বর্জ্জনীয়, সেইরূপ যাহা 'পরধর্ম' ;অর্থাৎ নিজেরর পক্ষে অনুচিত, অথচ অন্যের পক্ষে বিহিত হইলেও তাহার আচরণ বা অনুসরণ অকর্ত্তব্য। তাৎপর্য্য এই,— কোনরূপ স্বার্থবুদ্ধিতে আসক্ত হইয়া, অপরের দ্রব্যসম্ভারের বোঝা বহন করিলে, তাহাতে যেমন নিজ দায়িত্ব আসিয়া যায় ও পীড়াদায়কও বোধহয়, —তেমনি পূর্ব্বজন্মের সংস্কারবশে ইন্দ্রিয়গুলি যে নিজ নিজ ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইয়া আপনাপন নির্দ্দিষ্ট কর্ম সম্পাদন করিতেছে; নিজেকে তাহার কর্ত্তা বা কার্য্যকারক মনে করিয়া, নির্দ্দিষ্ট কোন ফলপ্রাপ্তির আশায়, ইহা করিতেছি, এইরূপ অভিমান বোধ করিলে; অর্থাৎ ত্রিগুণের পরিণাম দেহেন্দ্রিয়াদিতে 'আমি' ও 'আমার' রূপ ভ্রান্ত বুদ্ধিতে 'আমারকর্ম' মনে ভাবিলে; কর্মবন্ধনে আবর্ত্ত হইতে হয়। সারার্থ এই, যাহা আত্মার ধর্ম নয়, অর্থাৎ পরমাত্মার অনুজ্ঞা প্রাপ্ত নহে প্রবৃত্তিবশে তাহাতে প্রবৃত্ত হওয়াই পরধর্ম আশ্রয়।

বর্ত্তমান জন্মের আদিতে অভিব্যক্ত পূর্ব্বজন্মকৃত ধর্মাধর্মাদির সংস্কার প্রকৃতির গুণত্রয়রূপে যখন শরীরেন্দ্রিয়াদিতে সংক্ষোভে পরিণত হইয়া, রাগদ্বেষ অবলম্বন পূর্ব্বক, জীবকে কার্য্যে নিয়োজিত করে; তাহা 'পরধর্ম' পরিচায়ক। পক্ষান্তরে পরমাত্মায় নিয়ত অভিনিবিষ্ট হইয়া, তাঁহার প্রেরণাবশে কর্মে প্রবৃত্ত হওয়াই, জীবের 'স্ব-ধর্ম'। উল্লেখ যোগ্য যে, ত্রিগুণের পরিণাম কার্য্যকারণ সংঘাতে দেহেন্দ্রিয়াদিদ্বারা কৃত কর্মাদি জীবাত্মার বা 'আমার' কর্ম নহে, ইহা দেহের কর্ম বা পরধর্ম। প্রকাশস্বরূপ সূর্য্য যেমন নিজের স্বরূপভূত প্রকাশের 'কর্ত্তা' বলিয়া কথিত হইয়া থা কেন, জ্ঞানস্বরূপ

জীবাত্মাও তেমনি জীবদেহে অবস্থানকালে, দেহেন্দ্রিয়াদির 'কর্ত্তা' বলিয়া প্রতীয়মান হন। গঙ্গাজলে কিংবা সুরাপাত্রে, সূর্য্য প্রতিবিম্বিত হইলে যেরূপ তাহার দোষ গুণের লিপ্ততা হয় না; সেইরূপ শুভাশুভ কৃতকর্মের সাক্ষী ও দেহের চেতনাকারী আত্মাতেও. কর্মের মালিন্য বা প্রভাব স্পর্শ করে না। যেহেতু বিষয়াসক্ত মন বন্ধনের এবং নির্ব্বিষয় মন মুক্তির কারণ হয় এবং কামনাবাসনা মনেই বাস করে; জীবের আতমাতে নহে,— তাই চিত্তকে সতত পারমার্থিক চিন্তায় নিযুক্ত রাখিয়া জীবাত্মাকে পরমাতমায় সমাহিত রাখার অবিরত প্রচেষ্টাই জীবের ধর্ম।

যেমন খোসাদ্বারা আচ্ছাদিত অবস্থাতেই বীজ উৎপন্ন হয়, গর্ভকে বেষ্টন করিয়া থাকে, গর্ভাশয়ের আবরণ, ভ্রূণ ত্বক সহকারে ভূমিষ্ঠ হয়; ধূমাচ্ছন্ন হইয়াই অগ্নির প্রকাশ; দর্পণ ময়লায় আবৃত থাকিয়াই দৃশ্য গ্রহণ করে, তেমনি পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের সংস্কার সহযোগেই জীবদেহে জ্ঞানের উৎপত্তি ঘটে। তাৎপর্য্য এই,—মনুষ্য পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত সংস্কারের ক্রিয়ানুরূপই স্বীয় প্রকৃতি লাভ করিয়া থাকে, যাহা জীব স্বভাবে লগ্ন হইয়া, রাগ ও দ্বেষ অবলম্বনে সহজাত প্রবৃত্তি অনুযায়ী ইন্দ্রিয়াদিকে কর্মে নিয়োজিত করে। অবচেতন মনে প্রসুপ্ত এই জন্মান্তরিণ সংস্কার,—কখনও স্বধর্ম পরিত্যাগ ঘটাইয়া, কিংবা পরধর্মের প্রতি আকৃষ্ট করিয়া, জ্ঞানীপুরুষকেও বিভ্রান্ত করে এবং কোনটি ত্যাজ্য বা গ্রাহ্য, নিপণ করিতে না পারিয়া; স্থিতি ভ্রষ্টরূপে অন্যপথে লইয়া যায়; সংসারত্যাগী হইয়াও, বিষয়ব্যাপারে লালায়িত করিয়া তোলে; সর্ব্ব সংস্কার হইতে মুক্তি কামনা পোষণ করিয়াও, মায়ামোহে আকৃষ্ট হইয়া পড়ে। সুতরাং কর্ত্তব্য ও অকর্ত্তব্য নির্দ্ধারণে; যাহার দ্বারা ধর্মাধর্ম এবং সংসারগতি হইতে মুকতি লাভ প্রভৃতি নিগূঢ় পদার্থের ও দুষ্প্রবেশ্য বিষয়ের জ্ঞান উপলব্ধি হয়,—সেই শাস্ত্রীয় বিধি নিষেধের স্বরূপ জানিয়া, বিহিতানুষ্ঠান পূর্ব্বক কামক্রোধের আশ্রয়স্থল বা প্রবৃত্তির উৎস, বহির্মুখ ইন্দ্রিয়াদিকে সর্ব্বথা নিরস্ত রাখাই সকলের কর্ত্তব্য ধর্ম।

চন্দ্রোদয়ের পূর্বেই দৃষ্টিশক্তিরহিত হইয়া, বায়স যেমন চন্দ্রমাকে চিনিতে পারে না,-তেমনি আত্মজ্ঞান লাভের অগ্রেই আত্মহিত সম্পর্কে বিশ্বাসহারা হইয়া, সাধারণ মনুষ্য সংসারনিলয়ের যথাযথ রহস্য বা প্রহেলিকা,-তথা চৈতন্যময়সত্তা আপন আত্মার আনন্দকে জানিতে পারে না! সুতরাং ক্ষণস্থায়ী বিষয় বাসনাবশে নশ্বরদেহের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত না হইয়া, জরা মৃত্যু ও জন্মবর্জ্জিত,-অক্ষয়, অবিনাশী, অপার আনন্দ স্বরূপ, অচল অচ্যুত, অনন্ত; সর্বরূপ, সর্বগত, সর্বান্তর্য্যামী, সর্ব্বাতীত, অব্যাকৃত ও ব্যাকৃত, নিরাকার ও সাকার,-পরমাত্মাকে সতত অন্তরবাহ্য ব্যাপারের বিষয় করিয়া, বায়ু যেমন আকাশের অঙ্গে মিশিয়া থাকে, তেমনিভাবে সর্ব্বকর্মে, সর্বব্যাপক শ্রীভগ

বানের মধ্যে অবস্থান করিয়া, আপন চিত্তবৃত্তি ও অন্তরকে তাহার পূজামন্দিরের যজ্ঞ বেদী করিয়া তোলাই, আমি বা আমার প্রকৃত ধর্মচরণ।

যদিও কিরণ ব্যতীত, সূর্য্যের সত্তা এবং দাহিকাশক্তি ভিন্ন, অগ্নির অস্তিত্ব সম্ভব নয় বলিয়া সূর্য্য ও তাহার কিরণ এবং অগ্নি ও তাহার দাহিকাশক্তি অভিন্ন রূপে উপমিত হয়,-তথাপি সূর্য্য ও কিরণ স্বরূপতঃ এক হইয়াও, যেমন কার্য্যতঃ পৃথক, কিংবা অগ্নির শিখা ও তাহার দাহিকা শক্তি দৃশ্যতঃ একই বোধ হইলেও ক্রিয়াপ্রকাশে প্রভেদ, তেমনি শক্তি ও শক্তিমান যুগপৎ ভিন্ন ও অভিন্ন। এইরূপ উপমার অনুসরণে, পরমেশ্বর ও তাঁহার শক্তির প্রকাশ জীব, স্বরূপতঃ ঈশ্বরের সহিত অভিন্ন হইয়াও, ব্যবহারিক ক্ষেত্রে পৃথক। ঈশ্বর ও জীবে, এই ভেদজ্ঞান, আগন্তুক বা আরোপিত অথবা ঔপাধিক নহে। ইহা নিত্যভেদ বা নিত্যকাল ব্যাপী ভিন্ন,-মুক্তাবস্থাতেও তাহার অন্যথা হয় না। অর্থাৎ মুক্তিলাভেও জীব পৃথক ভাবে অবস্থান করে, যাহাকে 'স্বরূপে স্থিতি' বলা হয়। অতএব যিনি জীব জীবনের আলোকস্বরূপ ও মনন শক্তিরও উৎস এবং সর্ব্বদাই আমাদিগকে আশ্রয় প্রদান করিয়া রহিয়াছেন,-সেই শরণাগতরক্ষক শ্রীভগবানের প্রতি জীবাত্মা বা তাঁহাকে, অর্থাৎ যেই ভগবদংশরূপ চৈতন্যসত্তা, তিলের মধ্যে তৈলের মতঃ,-কিংবা দুগ্ধে ঘৃতের মতন, জীবশরীরে সদা সন্নিবিষ্ট রহিয়াছেন, তাঁহাকে চিন্তায়, ভাবনায়, কর্মে, আচরণে, সতত স্মরণে রাখিলে,-অন্তরে জ্ঞান, হৃদয়ে প্রেম, মনে পবিত্রতা এবং আত্মায় পরিতোষের আলোকপাত হয়। তাই চিত্তবৃত্তিকে নিরন্তর ভাগবতীয় ভাবনায় নিবদ্ধ রাখিয়া, মনদ্বারাই মনকে সংসার মোহ বন্ধ হইতে মুক্ত রাখিবার প্রবৃত্তই জীবধর্ম বা আমার ধর্ম।

মনন করা মনের, নিজস্ব কাজ এবং ইহা জন্মান্তরীণ সহজাত সংস্কারের প্রেরণা বশে উদ্ভূত হইয়া থাকে। তাই বিভিন্ন ব্যক্তির মানসিক প্রতিক্রিয়া ও অভিরুচি পৃথক। পরন্তু মন কোন একটি বিশেষ ভাবনায় অধিকক্ষণ সংলগ্ন হইয়া থাকিতে পারে না এবং এক সাথে বা একই সময়ে, একাধিক পৃথক ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়ায়, মনঃ সংযোগ করিতে অক্ষম হয়। তবে মানসিক ভাবনা তৎক্ষণাৎ এক বিষয় হইতে বিষয়াস্তরে ধাবিত হইতে পারে,-তাহা শ্রেয়ঃ কিংবা প্রেয়ঃ যাহাই হউক না কেন। এতদ্ব্যতীত সতত চঞ্চলভাবে আবর্ত্তিত সংসারের তরঙ্গমাতে মনের স্বভাবও বিলক্ষণ চঞ্চল,-যাহা সংযত না হইলে জীবনে অনেক অশান্তি ও অধঃপতন আনয়ন করে। কিন্তু স্বভাবতঃ চঞ্চল হইলেও মনের একটি উত্তম বৈশিষ্ট্য এই যে,-যাহাতে রসের আভাস পায় মন তাহাতেই অধিকতর আকৃষ্ট হয়।

উপরোক্ত সিদ্ধান্তের সরলার্থ এই যে,-অজ্ঞবিজ্ঞ, পণ্ডিতমূর্খ সকলেই আনন্দলাভের অভিলাষী অর্থাৎ মানুষমাত্রই আনন্দরস পিপাসু, যদিও তাহার উপকরণ সংগ্রহের পদ্ধতি স্তরভেদে নানারকমের হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে জাগতিক বস্তুমাত্রই অস্থির ও নশ্বর হওয়ায়, সংসারের কোনকিছুতেই স্থায়ী রস বা অনাবিল আনন্দ পাওয়া যায় না। তাই ব্যর্থ বাসনার অনলদহনে ক্ষণিকের সুখ,-অর্থবিত্ত, পুত্রকলত্র, মানযশ, প্রভাব প্রতিপত্তির মধ্যে আনন্দলাভের আশায়, মানবমন আলেয়ার পিছনে ছুটিবার মত, বিফল মনোরথে অনিবার ঘুরিয়া বেড়ায়,-যেমন যেই ফুলে মধু নাই, মধু লালুপ মধুমক্ষিকা অবলীলাক্রমে সেই ফুল হইতে অন্য ফুলে চলিয়া যায়। সংসারে নিত্য সুখ বা স্থায়ীআনন্দ পাওয়া যায় না বলিয়া, সংসারজীবন নিরানন্দময়। মন তাই নিত্য সুখের লালসাতেই ব্যাকুল। সুতরাং মনকে এমন বিষয়ে নিবিষ্ট করিতে হইবে যাহা অনিত্য, অসার বা ক্ষণস্থায়ী নয়,-পরন্তু মধুময়, আনন্দময় এবং নিত্যই নূতন।

তৈত্তিরীয় উপনিষদ তৃতীয়অধ্যায়ের ষষ্ঠ অনুবাকে, ব্রহ্মকে সত্যস্বরূপ, জ্ঞান স্বরূপ, আনন্দস্বরূপ উল্লেখে বলা হইয়াছে,-এই পরমআনন্দ হইতেই ভূতবর্গ জাত ও বর্দ্ধিত হইয়া,-সেই আনন্দাভিমুখেই গমনকরে এবং মুণ্ডক উপনিষদ দ্বিতীয় মুণ্ডক দ্বিতীয় খণ্ডের সপ্তম অষ্টম মন্ত্রে উল্লেখ রহিয়াছে,- জীবহৃদয়ে সদা স্ফুরিত এই আনন্দ স্বরূপ ও অমৃতস্বরূপ পরমব্রহ্মকে বিশিষ্ট জ্ঞান সহায়ে উপলব্ধি করিয়া, জীবের বুদ্ধিতে আশ্রিত কামনা বিনাশ প্রাপ্ত হয়,-সকল সংশয় ছিন্ন,-হয়এবং কর্মসমুহ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। সুতরাং জীবমমাত্রই সেই আনন্দময়ের সহিত মিলিত হইবার পথ অনুসন্ধান তৎপর এবং এই নশ্বরজগতে স্থায়ী অথচ রসের আলয় একমাত্র ভগবান,-যাঁহাকে জানিবার বা লাভ করিবার জন্যই মানবমন ব্যাকুলভাবে বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে ভ্রাম্যমাণ। তাঁহাকে সদা স্মরণ করিলেই অন্তঃকরণ আনন্দরসে পূর্ণ হইয়া, অশান্তমন শান্ত হয়,-আনন্দলাভের অভিলাষে মনের ইতস্ততঃ পরিভ্রমণের অবসান আসে।

গর্ভস্থ ভ্রূণ যেমন কোন উদ্যমের ব্যাপার না জানিয়া, একান্ত মনে প্রাকৃতিক নিয়মেই ভুমিষ্ঠ হইবার অপেক্ষায় থাকে,-তেমনিভাবে যাহারা অনন্যগতি চিত্তে ভগবান কে সর্ব্বক্ষণ স্মরণে রাখিয়া প্রতি সর্ব্বতোভাবে মন সম্পণ পূর্বক জীবনধারন করেন, শ্রীভগবানই তাহার সকল দায়িত্ব, কর্ত্তব্য সমাধান করিয়া দিয়া থাকেন,-সাংসারিক ভাবনা আপনা হইতে দূর হইয়া যায় যেমন নৌকা তীরে লাগিলে আর দোলে না, তেমনি রসময় ভগবৎ অভিনিবেশে মনলগ্ন হইল তাহা অচঞ্চল হয়, বিষয় বাসনায় দোলায় না,-তত্ত্বটি শ্রীগীতার নবমঅধ্যায়ের বাইশশ্লোক,-দশমঅধ্যায়ের দশমশ্লোক,-দ্বাদশ অধ্যায়ের সাতাশ্লোক এবং অষ্টাদশ অধ্যায়ের ছেষট্টি শ্লোকের অনুসরণ।

আমি ও আমার ধর্ম্ম

নদী জলধারা যেমন কামনা বিরহিত হইয়া আপন স্বভাবের অনুবর্ত্তন সাগরসঙ্গমে প্রধাবিত, তেমনি কোনরূপ কামনার বশবর্ত্তী না হইয়া, ফলানুসন্ধান শূন্য ও একান্ত প্রীতির সহিত অব্যবহিত চিত্তকে ভগবৎ সন্নিধানের অভিমুখীন রাখিতে হইবে। কারণ শ্রী ভগবানের প্রতি পরমানুরক্তিরূপ শ্রদ্ধা জাগ্রত না হইলে অন্তরে পরিপূর্ণ ভক্তির উদয় হয় না। পক্ষান্তরে শ্রদ্ধার তারতম্য অনুসারে ভক্তিলাভের অধিকারীরও পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। যথা,- শ্রদ্ধা যাহার শাস্ত্র ও যুক্তি নির্ভর, তাঁহাকে 'উত্তম অধিকারী' বলা হইয়া থাকে,- শাস্ত্রবচনের নির্দ্দেশ না জানিয়াও, কায়মন বাক্যে ঈশ্বরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ব্যক্তিকে, বলা যাইতে পারে 'মধ্যম অধিকারী',- শ্রদ্ধা যাহার চঞ্চল, কখনই চিত্ত একাগ্র নয়, তাহাকে বলা হয় 'কনিষ্ঠঅধিকারী' উল্লেখযোগ্য যে, শ্রদ্ধাসহকারে সাধনভজনে প্রবৃত্ত থাকিলে কিংবা নিষ্ঠার সহিত প্রাণমন পরমেশ্বরের প্রতি নিবেশিত রাখিলে, ক্রমে উত্তমভক্ত বলিয়া পরিগণিত হওয়া যায় এবং ভগবদ্ভক্তের কখনই পরাভব প্রাপ্তি ঘটে না,- শ্রীগীতার নবম অধ্যায়ের একত্রিশ শ্লোকে, ইহা ভগবদ্বাক্য। ষষ্ঠ অধ্যায়ের চল্লিশ শ্লোকে বিশেষ উক্ত এই রূপ যে,- কল্যাণ কর্মকারীর ইহলোকে কিংবা পরলোকে অধোগতি হয় না।

শ্রীভগবানের প্রতি প্রকৃত ভক্তিমান বাহ্যিক ব্যবহারে সদা ভগবৎ বিষয়ক কথা শ্রবণ কীর্ত্তনাদি করিয়াও অন্তরে নিরবচ্ছিন্ন ভাবনারূপ আন্তরিক আরাধনা করিয়া থাকেন। তাৎপর্য্য এই,- ভগবানের প্রতি অনুরক্ত ব্যক্তি, নিজেকে তাঁহার ভৃত্য, সখা, প্রিয়জন বা প্রেয়সী কল্পনা করিয়া,- সেই ভাবের অনুভাবে উপাসনা দ্বারা জীবন অতিবাহিত করেন। ক্রমশঃ প্রেম উপজাত হয়,- এবং এই ভগবৎ প্রেমই প্রয়োজন ও প্রার্থনীয়। স্নেহাতিশয্য এই ভাগবতীয় প্রেমের পরিণতিতে, বিবৃদ্ধ বাসনার আবিলে মলিন মন, শোধিত হয়,- অস্বচ্ছ বুদ্ধির লক্ষ্য, চিন্তার গভীরতায় ও চিত্তের একাগ্রতায়, উজ্জ্বলভাব ধারণ করে,- চিত্তদর্পণ মার্জ্জিত হয়,- ভবমহাদাবাগ্নির নির্ব্বাপণ ঘটে,- ভগবদ্ভক্তির সুস্মিত মঙ্গল জ্যোৎস্নায় মনোমন্দির ভরিয়া থাকে,- হৃদয়ে শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস চিরতরে প্রতিষ্ঠিত হয়,- চঞ্চলমন ধৈর্য্যের আশ্রয় পাইয়া, আত্মস্থানে অবস্থান করে,- যেই অনাবিল আনন্দের মাধুর্য্যে, মন সংসারের অলীক বন্ধনজাল অনায়াসে ছিন্ন করিয়া, বাসনাকামনার চিন্তন ও পরিত্যাগ করে তখন অন্তর হয়,- সন্তোষের সাম্রাজ্য,- জ্ঞান জাতৃত্ব প্রাপ্ত হয়,- অন্তর ও বাহির প্রকৃতির সামগ্রিক অনুসঙ্গকেই, সুস্নিগ্ধ আলোকের পরশে উন্মোচিত করে পূর্ণতা ও চির সার্থকতা লাভের অভিমুখে।

সচরাচর যেই মন. বুদ্ধিকে বিপর্য্যস্ত করে,- নিশ্চিত বিষয়কেও রাখে, সংশয়ে

আচ্ছন্ন,- স্থৈর্য্যকে ফাঁকি দিয়া পালায়, বিবেককে বিভ্রান্ত করে; সন্তোষের মধ্যেও বিষয় বাসনার বিষাক্ত বীজ বপন করিয়া দেয়,- শান্ত হইতে চাহিলেও, চারিদিকে দৃষ্টিকে চালনা করে,- সেই মনকে স্বভাবগত অভ্যাস পরিহার করাইয়া, পারমার্থিক ভাবনায় নিমগ্ন রাখিয়া নিশ্চল করা কঠিন অধ্যবসায় সাপেক্ষ। পরন্তু অন্যান্য ইন্দ্রিয় বাহিরের ব্যাপারের উপর নির্ভর বলিয়া, তাহাদের নিরুদ্ধ করিলে, ইহারা ক্রিয়াহীন হইয়া পড়ে। কিন্তু অন্তরিন্দ্রিয় 'মন' বাহিরে দেখা যায়না এবং মননেন্দ্রিয় যোগ না দিলে, বহিরিন্দ্রিয়াদি কাজ করিতে পারে না। পক্ষান্তরে সকল ইন্দ্রিয়ের কর্ত্তাস্বরূপ এই মনকে নিরোধ করিলে, সুখদুঃখ বা আনন্দের অনুভূতি অন্তর্হিত হইয়া, মন জড়পিণ্ডবৎ অবস্থান করে। সুতরাং নিজের মনকে এমন একটি নিয়মে আবদ্ধ করিতে হইবে, যেন যেই বিষয়ে কৃতনিশ্চয় হওয়া গিয়াছে,- অর্থাৎ অব্যাহত ভগবৎ চিন্তায় মন নিবেশিত করিবার যে ব্রত অবলম্বন করা হইয়াছে,- তাহার কিছুতেই অন্যথা করা হইবে না।

চঞ্চল মন যদি বহির্মুখ বিষয়ান্তরে গমন করে,- বুদ্ধির স্থৈর্য্য অভ্যাসদ্বারা তাহাকে তৎক্ষণাৎ নিবৃত্ত করিতে হইবে। ক্রমশঃ এই ধৈর্য্যের দ্বারা স্বভাবতঃই আনন্দরস পিপাসু মন, পরমানন্দ রসস্বরূপ ভগবৎ অনুধ্যানে অভ্যস্ত হইয়া পড়িবে। তিক্ত ঔষধ আস্বাদের পক্ষে বিরক্তিদায়ক হইলেও দৃঢ়মনে সেবন করিলে, যেমন পরিশেষে ব্যাধি হইতে আরোগ্য লাভের কারণ হয়,- তেমনি মনের নিগ্রহ প্রাথমিক দিকে কষ্টকর হইলেও পরিণামে অবশ্যই কল্যাণ কারক হইয়া থাকে। জলে উৎপন্ন শৈবাল, যেমন জলকেই আচ্ছন্ন করে,- মেঘের অন্তরালে, তাহারই আশ্রয় আকাশ অবলুপ্ত দেখায়,- তেমনি মন হইতে উত্থিত বহির্মুখী ভাবনা-সমূহ, মনকে যবনিকার ন্যায় ভগবৎ ভাবনা হইতে আড়াল করিয়া রাখে। জলে জাত মুক্তা ক্রমশঃ দৃঢ় হইলে, কিংবা মৃত্তিকাদ্বারা প্রস্তুত ইট দগ্ধ করিয়া কঠিন করিলে, যেমন কোনভাবেই গলিয়া যায় না,- তেমনি বহির্মুখীন সংস্কার কর্ত্তৃক গঠিত মন, ভগবৎ অভিনিবেশ প্রয়োগে সিদ্ধি প্রাপ্তি, তথা সুদৃঢ় নিশ্চয় হইয়া বহির্জগতের ভাবতরঙ্গ আঘাতে কথনও বিচলিত বা বিগলিত হয়না,- বরং অধিকতর সুন্দর, সার্থক ও সম্পূর্ণ হইয়া ওঠে।

প্রশ্নোপনিষদে তৃতীয় প্রশ্নের দশমকণ্ডিকায় বিচারিত হইয়াছে, জীব জীবিতকালে যেরূপ দেহলাভের চিন্তা করিয়াছে, মরণকালে সেইরূপ সঙ্কল্প বিশিষ্ট হইয়া, মনোমধ্যে প্রবিষ্ট ইন্দ্রিয়গণের সহিত, প্রাণবৃত্তিকে অবলম্বন, তথা জীবাত্মার সহিত মিলিত রহিয়া, যথা সঙ্কল্পিত লোকে শরীরান্তর প্রাপ্ত হয়। ছান্দোগ্য উপনিষদ

ষষ্ঠ অধ্যায় অষ্টমখণ্ডের ষষ্ঠ কারিকার মর্মার্থ এইরূপ, দর্পণে প্রতিবিম্বিত মুখচ্ছবি, যেমন উক্ত দর্পণ ভঙ্গ হইলে অন্য দর্পণ প্রাপ্তির, প্রত্যাশায়, স্বীয় মুখরূপেই অবশিষ্ট থাকে, তেমনি দেহভঙ্গে জীবাত্মা ভিন্নদেহ লাভের অপেক্ষায়, আপন চৈতন্য সত্তারূপে অবস্থান করেন। অষ্টমঅধ্যায়ের সারার্থ এই,- সূক্ষ্মভাবে আকাশে লীন মেঘ, যেমন দক্ষিণ বায়ু প্রভাবে স্থূল বিদ্যুতলতা আকারে প্রকাশিত হয়- জীবাত্মাও তেমনি সংস্কার প্রভাবিত হইয়া বিভিন্নরূপ ধারণ করে।।

শ্রীগীতার নবমঅধ্যায়ের একুশশ্লোক এবং মুণ্ডক উপনিষদের প্রথম মুণ্ডকের অন্তর্গত দ্বিতীয়খণ্ডের দশম শ্লোক অনুযায়ী উপরোক্ত সিদ্ধান্তের ভাবার্থ এইরূপ,- পার্থিবদেহে কৃতকর্ম অনুসারেই, দেহত্যাগের পর অবিনশ্বর জীবাত্মা সূক্ষ্ম বা আতিবাহিকদেহে, ভুবর্লোক বা অন্তরীক্ষে অবস্থান করে,- তারপর গতি হয়, স্বর্লোক বা স্বর্গভূমিতে। তথায় স্বর্গীয় সুখভোগ কাল অবসানের পর, পুনরায় ভূর্লোক বা পৃথিবীতে দেহধারণ করিয়া জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকে। শ্রীগীতার অষ্টমঅধ্যায়ের ষোল এবং একুশশ্লোকে অভিসংবাদিত ভগবদোক্তি এই যে,- যিনি একাগ্রমনে নিরন্তর শ্রীভগবানকে স্মরণরূপ আরাধনা করেন, তাঁহার পুনরায় ইহজগতে জন্মলাভ হয় না এবং পরবর্ত্তী পঞ্চদশ অধ্যায়ের ষষ্ঠশ্লোকে বিশেষ উকতি এই, তাঁহার পরম উর্দ্ধগতি ঘটে, দিব্যালোকের ভগবংধামে , যাহা উৎকৃষ্ট পদপ্রাপ্তি। কঠোপনিষদে দ্বিতীয়বল্লীর পঞ্চদশ শ্লোকে, মুণ্ডক উপনিষদের দ্বিতীয় মুণ্ডক দ্বিতীয়খণ্ডের দশম শ্লোকে, শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের দ্বিতীয়অধ্যায়ের পঞ্চদশ মন্ত্র এবং তৃতীয়অধ্যায়ের চতুর্দ্দশমন্ত্রে এইতত্ত্ব আভাসিত।

শ্রীমদ্ভগবত গীতার অষ্টম অধ্যায়ের পঞ্চমশ্লোকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিজেই বলিয়াছেন, ইহাই নিয়ম যে, মরণ মুহূর্ত্তের ভাবনাঅনুযায়ীই মানব মরণোত্তর গতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এই মহাবাক্যের তাৎপর্যাএই,— মৃত্যুকালে পূর্ব্বকৃত পাপপুণ্যাদির ভোগায়তনরূপ স্থূলদেহকে জীবাত্মা যখনসূক্ষ্মশরীর অবলম্বনে পরিহার করিয়া যায়, মনের সঙ্কল্পশক্তি সেই সময়ে যেইরূপ প্রবল বাসনাকে ভাবনাদ্বারা আশ্রয় করিয়া থাকে,-মনোময় সূক্ষ্মদেহও তদ্ ভাবাপন্ন হইয়া তদনুরূপ সূক্ষ্মভাবায়তন রচনা করিয়ালয় এবং সেই অভিমুখে গতি প্রাপ্ত হয়। জীবাত্মার দেহত্যাগকালে ইন্দ্রিয়াদি অবশ হইয়া পড়িলেও, মনস্থির থাকে এবং সেই অন্তিম সময়ের মনের গতি অনুসারেই, অর্থাৎ যে দেবতাকে চিন্তা করিতে করিতে দেহত্যাগ হয়, সেই দেবতানিষ্ঠাতে সারা জীবন অভ্যস্ত ব্যক্তির সূক্ষ্মশরীর, সেই দেবলোকেই গমন করে। পরন্তু সতত স্মরণ মনন নিদিধ্যাসনের অভ্যাস না থাকিলে অন্তঃকালে, ইষ্টস্মৃতি আসেনা এবং মোহন্ধ

কারের অতীত, সকলের কর্মফলদাতা, পরমপুরুষ সর্ব্বজন, আরাধ্য, সর্ব্বময় শ্রীভগবানের ভাবনা মনে উদিত হয় না।

সুতরাং অভ্যাসরূপ জ্ঞানযোগে যুক্ত থাকিয়া, নিষ্কামকর্মযোগে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া, বিষয়ান্তরে গতিহীন চিত্তের অধ্যবসায় দ্বারা, ভক্তিযোগ অবলম্বন পূর্ব্বক, অবিচ্ছিন্ন তৈলধারার মত বা অনর্গল প্রবাহ স্রোতোবহার ন্যায়, ভগবৎ অনুভাবনার অবিচ্ছেদ গতি প্রবৃদ্ধ রাখাই শ্রীগীতার উপদেশ। অধিকন্তু সপ্তম অধ্যায়ের সতের ও নবম অধ্যায়ের তেইশ এবং দ্বাদশ অধ্যায়ের সাত শ্লোকে; ঈশ্বর ব্যতীত অন্য অবলম্বন শূন্য হইয়া, নিত্যযুক্ত, একনিষ্ঠ ও অনন্যচিত্তে নিরন্তর ভগবৎ স্মরণশীল ব্যক্তির নিকট শ্রীভগবান সহজলভ্য হন, উল্লেখে বলা হইয়াছে যে, শ্রীভগবানের প্রতি অনবরত যোগযুক্ত এবং তাঁহাতেই আবিষ্টচিত্ত ভক্তগণের জীবিকার সকল দায়িত্ব তিনি স্বয়ং গ্রহণ করিয়া, মৃত্যুময় সংসারসাগর হইতে, তাহাদিগের সত্বর উদ্ধারকারী হইয়া থাকেন। এই সম্পর্কে মুণ্ডক উপনিষদের প্রথম মুণ্ডকের দ্বিতীয়খণ্ডের দশমমন্ত্রে, সতর্ক অনুশাসন এই, সংসার প্রমত্ত ঈশ্বরবিমুখ ব্যক্তিগণ, এই মনুষ্যলোক বা হীনতর লোকে প্রবেশ করে।

ইহধাম হইতে মহাপ্রয়াণ সময়ে, সকল ইন্দ্রিয় জড়তা প্রাপ্ত হইলে, প্রাণবায়ু রুদ্ধ হয়; মন বিকল হইয়া, স্মৃতিভ্রমের মধ্যে লুপ্ত হইয়া পড়ে। সজল ঘনমেঘ পূর্ণ চন্দ্রকে আচ্ছাদিত করিলে, অন্ধকারবোধ না হইলেও যেমন উজ্জ্বল চন্দ্রালোক চলিয়া যায়; মনে হয় যেন গোধূলি সময়ের মত সায়ংকাল; তেমনি তৎক্ষণাৎ মৃত্যু না হইলেও, চেতনা ক্রমে আচ্ছন্ন হইতে থাকে; দৃষ্টিতে ঘোর আসিয়া যায়। ভাবনায় ভাসিতে থাকে, যেন অন্ধকারময় পরিবেশ। দেহ তখনও সজীব থাকিলেও, এমনি স্তব্ধভাব ধারণ করে; যেন পরমায়ু জীবনমৃত্যুর সীমারেখায় পেঁাছিয়া মরণ সময়ের অপেক্ষা করিতেছে। জীবনবায়, শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগকালে, অন্তঃকরণ আপনা হইতে যাহার কথা স্মরণ করে, মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই সূক্ষ্মদেহধারী জীবাত্মার অন্তিম স্মৃতিপথে আগত, সেই বাসনা পরিপূরণের অবস্থা প্রাপ্তির উপযোগী গন্তব্য স্থানে গতি প্রাপ্তি লাভ হয়।

মন্থন করিয়া একবার মাখন বাহির করিলে, তাহা যেমন, আর কোন মতেই ঘোলের সহিত মিশান যায়না; কিংবা কাষ্ঠ ঘর্ষণ করিয়া উৎপাদিত অগ্নি, যেমন পৃথক সত্তা হইয়া পড়ে,— সেইরূপ কর্মবিধাতা জীব মাত্রকেই শরীররূপ যন্ত্রে স্থাপন, পূর্ব্বক প্রাক্তন কর্মানুসারে দুঃখাদি দ্বারা পেষণ করিয়া, সংসারের প্রতি যে নির্ব্বেদ জাগরিত করেন, তাহার অপনয়ন নাই। বস্তুতঃ সংস্কারসূত্রে জড়িত জীবের চিন্তার যে স্বত

প্রবক্তা রহিয়াছে, সেই আত্মজ্ঞান প্রভাবে, মনের ভাবনা, তথা সর্ব্বকর্ম ফলস্পৃহা শ্রীভগবানের উদ্দেশ্যে সমর্পণ করিয়া, তাঁহারই অনুস্মরণে অন্তর যেই চিরপ্রসন্নতা লাভ করে, যাহা জ্ঞান ও ভকতির পরিপূর্ণতা হইতে উৎপত্তি প্রাপ্ত, অথচ আত্মবোধে আত্মস্বরূপের সহিত অনন্য; তাহার বিনাশ নাই। এবং সেই ভগবৎ অনুধ্যানরূপ স্মৃতির সঞ্চয়; যাহা পরলোক যাত্রাপথের পাথেয় তাহা দেহত্যাগ কালের মূর্চ্ছিত অবস্থাতেও বিস্মৃত স্মৃতিপথে অগ্রে উদিত হয়।

যেমন বালকের পক্ষে নির্ভয়ে নদীপার হইতে, মাঝিনির্ভর নৌকা প্রশস্ত; তেমনি সাধারণ জনের পক্ষে ভবনদী অনায়াসে অতিক্রম করিতে, ভগবৎ নির্ভরতারূপ চিত্ত তরণী অবলম্বনীয়। যাহার মন 'আমি' ও 'আমার' ভাবনা ভুলিয়া গিয়া, বিষয়াদির প্রতি আসক্তির আকর্ষণ হইতে দূরে সরিয়া গিয়াছে; তাহার পক্ষে সংসারত্যাগের প্রয়োজন নাই। কারণ এই অবস্থায় অহংভাব তিরোহিত হয়; 'আমি কর্মের কর্ত্তা' এই মনোগতভাব লোপ পায়; দেহের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি লক্ষ্যও বিস্মরণ প্রায় হয়। দেহরক্ষার জন্য আহার্য্য গ্রহণ করা হইতে থাকিলেও লোভ পরিত্যক্ত হইয়া যায়। স্বভাববশে দেহেন্দ্রিয়াদি কর্ত্তব্যকর্ম নিষ্ঠার সহিত নির্ব্বাহ করিয়া যায় বটে; কিন্তু আসকতির স্পর্শহীন বলিয়া, মন কর্মের বন্ধনে আবদ্ধ হয়না।

বিষয়াসকতি হইতে আপন মনোবৃত্তি যে ব্যাকতি এইরূপ সরাইতে পারিয়াছে বা বহির্মুখ ইন্দ্রিয়কে বশে আনিয়াছে, আত্মা হইতে উৎসারিত আনন্দমাধুর্য্য রস সতত আস্বাদনের ফলে, বিষয়ে বীতরাগ এবং প্রকৃতির প্রভাব হইতে মুকত; তাঁহার অন্তঃকরণে অন্তকাল ঈশ্বরভাবনাই প্রবল হইয়া ওঠে। ফলতঃ পঁহুছায় ঊর্দ্ধলোকে দিব্যধামের অভিমুখে। পক্ষান্তরে যাহার মন ভগবৎ বাক্যের প্রতি সংশয়রূপ কুহেলিকার ফাঁদে আবদ্ধ হইয়া, পরমার্থলাভের মুকতিপথ অবরুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে; তাহার পক্ষে পরমার্থলাভের উপায়, অন্তরে অঙ্কুরিত হইয়াই বিলীন হইয়া যায়; সাংসারিক জীবনেও সুখপ্রাপ্তি হয়, সুদূর পরাহত। এই সম্পর্কে শ্রীগীতার চতুর্থঅধ্যায়ের চল্লিশ শ্লোকের বিধান এইরূপ, শাস্ত্র বাক্যে সন্দিগ্ধচিত্ত ব্যক্তি, পরমার্থ বা জীবজীবনের শ্রেষ্ঠ কাম্যবস্তুলাভের অযোগ্য হইয়া থাকে; তাহার ঐহিক শান্তি সুখও অন্তর্হিত হয়। সুতরাং পূর্ব্ববর্ত্তী চৌত্রিশ শ্লোকের নির্দ্দেশ অনুসারে,— সশ্রদ্ধ জিজ্ঞাসাদ্বারা তত্ত্বদর্শী জ্ঞানীব্যক্তির নিকট হইতে উপদেশ গ্রহণ করিয়া সংসারমোহ ও সংশয়বুদ্ধি অপসারণ কর্ত্তব্য।

প্রতিটি জীবদেহে যে জীবাত্মা অধিষ্ঠিত, তিনিই 'পুরুষ' সংজ্ঞায় অভিহিত। বহিরিন্দ্রিয়দ্বারা বাহির ব্যাপারের জ্ঞানলাভ করা হইয়া থাকে এবং অন্তরিন্দ্রিয় প্রদান

করে আন্তর অবস্থার অনুভূতি। যিনি বহিরিন্দ্রিয় ও অন্তরিন্দ্রিয় সহায়ে জাগতিক অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন এবং ইন্দ্রিয়াদির পরিবর্ত্তনে, নিজে পরিবর্ত্তিত না হইয়া, চৈতন্যসত্তায় অবস্থান করেন, তিনি আত্মা বা পুরুষ। এই প্রজ্ঞারূপী আত্মা যখন দেহের সহিত সংশ্লিষ্ট হয়, তখনই তাহাতে প্রাণ সঞ্চারিত হইয়া কামনাবাসনা উদয় হয় এবং মৃত্যুর সাথেই আত্মা দেহ হইতে বিযুক্ত হইয়া থাকে। এই পুরুষ বা জীবাত্মা; অনাদি, শাশ্বত। পুরুষ হইতেই জীব প্রকৃতি বা দেহগত সংস্কার, জীবন প্রাপ্ত হইয়া, জীবের মনবুদ্ধি অহঙ্কার প্রমুখ জ্ঞানেন্দ্রিয়াদিদ্বারা যাবতীয় কর্ম করাইতেছে, যেমন গৃহের অভ্যন্তরে যাহারা বাস করে তাহারাই পরিচর্য্যা করে।

পুরুষ, অব্যয় বা অপরিবর্তনীয় সত্তা, প্রকৃতি সমুদায় ক্রিয়া উৎপত্তির মূল কারণ। প্রকৃতি হইতেই ইচ্ছা ও বুদ্ধি, অহঙ্কারের সহিত উৎপন্ন হয়। এবং পূর্ব্ব জন্মের সংস্কারগত ইচ্ছার উন্মাদনা জাগিলে, মন উদ্বুদ্ধ হইয়া থাকে। এই জাগরিত মন, যখন বুদ্ধি প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গুলিকে কার্য্যে প্ররোচিত করে, তখন 'আমি এই কর্ম্মের কর্ত্তা' এইরূপ আপন ব্যক্তিত্ব জ্ঞানের অহঙ্কার প্রকাশ পায়। বস্তুতঃ প্রকৃতিই কার্য্যকারণ ও কর্তৃত্বের মূল এবং এই তিনটি একত্রিত হইয়াই কর্ম প্রচেষ্টা দেখা যায়,-যাহা ব্যক্তি বিশেষের সত্ত্ব, রজ, তম গুণের অনুরূপ হয়। যেমন দিবা ও রাত্রি পৃথক হইয়াও, একই সঙ্গে মিলিত,-কিংবা শব্দের সহিত অর্থ যথা,-তেমনি পুরুষ ও প্রকৃতি পরস্পর সংযুক্ত। বস্ত্র যেমন সূত্র নহে,-পরন্তু সূত্র হইতেই বস্ত্র রূপ গ্রহণ করে,-সেইরূপ পুরুষ ও প্রকৃতিতে ঐক্য রহিয়াছে।

প্রকৃতি, ক্ষেত্র;-পুরুষ ক্ষেত্রজ্ঞ। গাভীর দেহে যেমন দুগ্ধ লুকায়িত থাকে,-অগ্নি নিহিত থাকে কাষ্ঠে,-প্রদীপের জ্যোতি চিমনীদ্বারা আবৃত থাকে,-তেমনি পুরুষ, প্রকৃতির সংসর্গে আসিয়া আপন মহিমা হারাইয়া ফেলে এবং নিজেকে জন্মমৃত্যুর অধীন মনে করে। পুরুষ দেহের অবস্থান কালে, ইন্দ্রিয়াদি কার্য্যকলাপের "উপদ্রষ্টা" অর্থাৎ স্বতন্ত্র হইয়াও, সামীপ্যবশতঃ আপনা হইতে কর্মসূত্রে আগত সুখদুঃখাদির পেক্ষ দর্শক। দেহাদির কার্য্য স্বয়ং প্রবৃত্ত না হইয়াও, প্রবৃত্তির ন্যায় তাহাদের অনুকূলরূপে প্রতিভাত বলিয়া "অনুমন্তা" বা অনুমোদন কর্তা মনে হয়। পুরুষ বা আত্মার অবস্থানেই দেহেন্দ্রিয় ও মনোবুদ্ধি চেতনাপ্রাপ্ত হয় বলিয়া "ভর্ত্তা" বা পালক বলা হয়। সংস্কারাচ্ছন্ন বুদ্ধির সুখদুঃখ মোহাত্মক প্রত্যয় সমূহ, চৈতন্যস্বরূপ আত্মা কর্তৃক, যেমন অভিভূত হইয়াই জাত হয় ভাবিয়া "ভোক্তা" বলা হইয়া থাকে। সারার্থ এই,-জীবাত্মা অন্তরিন্দ্রিয় ও বহিরিন্দ্রিয়ের কার্য্য সমূহের দ্বারা অবভাসিত বা প্রকাশিত হইলেও, তিনি ইন্দ্রিয়গণের সংশ্লেষ রহিত।

আমি ও আমার ধর্ম

আকাশ, যেমন অবকাশে সর্ব্বত্র ব্যাপিয়া আছে,-তন্তু বস্ত্রমধ্যে বসনরূপ ধারণ করিয়া রহিয়াছে,-রস, জলে পরিব্যাপ্ত,-তেজ, প্রকাশিত দীপ, পুষ্প, সৌরভ অবস্থিত,-ইন্দ্রিয়াদির ক্রিয়া দেহে প্রকট,-অগ্নির উত্তাপ নানরূপে বিস্তৃত,-তেমনি ব্রহ্মবস্তু সর্ব্বস্বরূপ হইয়াও, সর্ব্বব্যাপীরূপে এবং সূক্ষ্মভাবে সমস্ত বিশ্ব যুগপৎ দূরে ও সন্নিকট সমভাবে বিরাজিত রহিয়াছেন। লবণাক্ত বারি যেমন পরিষ্কৃত জিহ্বার আস্বাদন দ্বারা বুঝা যায়,-তেমন পবিত্র অন্তরদ্বারাই পরমব্রহ্ম কে উপলব্ধি করা যায়। তিনি গুণাতীত, অবস্থাতীত, অন্তর্য্যামী পরমাত্মা স্বরূপে সর্ব্ব জীবে অবস্থান করিতেছেন এবং বিশ্বের সমস্ত অবস্থাই তাঁহারই নিয়ন্ত্রাধীন।

যেহেতু ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইলে, ব্রহ্মবিষয়ে তন্ময়তা বশতঃ, আর কিছুই লাভ করিবার অবশিষ্ট থাকে না এবং অন্তর অনুক্ষণ পূর্ণানন্দে পরিপূর্ণ থাকে,-তাই ব্রহ্মবস্তুই জ্ঞেয় বা জ্ঞাতব্য অথবা জ্ঞানের বিষয়। পক্ষান্তরে বাক্য ও মনের অগোচর পরব্রহ্মকে জানা বা লাভ করা অথবা অন্তরে অনুভব করা অসম্ভব ব্যাপার নহে। কারণ বিশুদ্ধ চিত্তবৃত্তির অভিব্যক্তিরূপ সংবিদ বা অধ্যাত্মা চেতনা অথবা দিব্যজ্ঞান ও তিনি,-এবং চিত্তের নির্ম্মলতা ঘটিলেই ব্রহ্মবস্তু সকলের অব্যবহিতরূপে, অনুভূত হন। এই তত্ত্ব শ্রীগীতার ত্রয়োদশ অধ্যায়ে সবিস্তার বর্ণিত।

ছান্দোগ্য উপনিষদে বিস্তারিত বর্ণনায় উল্লেখ রহিয়াছে,-শরীরের সহিত নিত্য সম্বন্ধ নহে, এইরূপ বেশভূষাদির পরিবর্ত্তে, যেমন দেহের ছায়াও পরিবর্ত্তিত হয়,-তেমনি দেহের ধর্ম্ম সুখদুঃখাদি শরীরে আসা যাওয়ার সহিত সম্বন্ধহীন, অথচ তাহার সাক্ষীস্বরূপ জীবাত্মাকে জানা যায়। কিংবা রূপদৃশ্যাদির উপলব্ধির করণ চক্ষু, দেহের সহিত সংহত হইলেও, তাহা তদতিরিক্ত যেই কর্ত্তার ভোগের বা অনুভবের জন্য ব্যবহৃত হয়,-অর্থাৎ চক্ষুসহায়ে যিনি দৃশ্যমান বিষয়াদির উপলব্ধা বা অন্যান্য ইন্দ্রিয় অবলম্বনে বিভিন্ন অনুভবনীয় পদার্থের জ্ঞাতা,-তিনি শরীর, অথচ অশরীর চেতন আত্মা। প্রশ্নোপনিষদে বলা হইয়াছে,-অকর্ত্তা হইয়াও, সূর্য্য যেরূপ নিজের স্বরূপভূত প্রকাশের কর্ত্তাবলিয়া প্রতীত হন,-সেইরূপ অকর্ত্তা হইয়াও, জ্ঞানস্বরূপ আত্মা, মনের কার্য্য সংশয়, বুদ্ধির নিশ্চয়, অহংভাবের গর্ব্ব ও চিত্তের স্মৃতি দিক, পরিচালিত করিয়া পরিচিত হন। মুণ্ডক উপনিষদের মতে,-চক্ষু, বা অন্যান্য ইন্দ্রিয়দ্বারা, আত্মা গৃহীত হয় না এবং দুগ্ধে ঘৃতেরন্যায়, কাষ্ঠে অগ্নির ন্যায়, আত্মা কর্ত্তৃক জীবগণের ইন্দ্রিয়সহ সমস্ত চিত্ত পরিব্যাপ্ত থাকিলেও, চিত্তেই তাঁহার বিশেষ প্রকাশ বলিয়া, বিশুদ্ধ চিত্তদ্বারা তাঁহাকে জানা যায়।

তৈত্তিরীয়ো উপনিষদ বলেন,- হৃদয়ে অপরোক্ষ আনন্দলাভের অভিলাষ রহিয়াছে,-

অথচ মন ও বাক্য আপনি আপনাকে এই আনন্দলাভের বিষয় করিতে অক্ষম হয় বলি।, জগৎগুহায় অবস্থিত, আনন্দস্বরূপ আত্মাকে চিন্তাদ্বারাই অবগত হওয়া যায়। শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে বলা হইয়াছে,-যেমন পরস্পর অসম্বন্ধ বস্তু,- অর্থাৎ ইষ্টক কাষ্ঠাদি উপকরণ,- গৃহাদিরূপে সংহত হইয়া গৃহস্বামীর ভোগের জন্য বিদ্যমান থাকে,- তেমনি দেহেন্দ্রিয় সমষ্টির কার্য্যালম্বনের প্রতি লক্ষ্যকারী ও অন্তঃকরণ বৃত্তির সাক্ষীরূপে অবস্থিতি রূপ ভোক্তা, আত্মাকে উপলব্ধি করা যায়। মাণ্ডুক্যোপনিষদের অভিমত এই, নাম অবলম্বনে কোন ব্যক্তি বিশেষকে জানিতে হইলে, যেমন নাম ও নামী অভিন্নবোধ হয়,- কিংবা কার্য্যযোগের কারণ ভাবনা করিলে উভয়েরই একই কর্ত্তা মনে হয়, অথবা নিদ্রাকালে কোন কার্য্যকারণ না থাকিলেও, নিদ্রা ও জাগরণ স্মৃতির ধারক 'অনুভূতি' থাকে, সেই জীব সম্বিত, সর্ব্বাবক্ষেপরহিত কেবল অনুভূতি স্বরূপ, আনন্দময় এবং অসম্বদ্ধরূপ আনন্দভোগকারী, দেহস্থিত অথচ দেহাতিরিক্ত তত্ত্ববস্তুই আত্মা।

কেনোপনিষদে বলা হইয়াছে, অন্তঃকরণ সহায়ে যাঁহাকে চিন্তা করা যায় না, অথচ প্রাণমন ইন্দ্রিয়াদি যাঁহার চৈতন্যজ্যোতি প্রভাবে উদ্ভাসিত হয়, কিংবা জ্ঞাত ও অজ্ঞাত বলিয়া, ফলতঃ তিনি জ্ঞাতার সহিত অভিন্ন, সেই মনের মন ইন্দ্রিয়ের ইন্দ্রিয়ই আত্মা। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদেরমতে, সকল স্থানে স্থিত কাষ্ঠগত অগ্নির স্বরূপ দৃষ্ট না হইলেও, ঘর্ষণের দ্বারা যেমন তাহা গৃহীত হয়, এবং স্বভাবতঃ জড় বাহিরের ঘাত প্রতিঘাতে ক্রিয়াশীল দেখিয়া তাহাতে চৈতন্যের অস্তিত্ব জানা যায়, তেমনি অন্তরকে পুনঃ পুনঃ ধ্যানরূপ মথনদ্বারা অর্থাৎ জ্ঞান ও যোগের দ্বারা লভ্য চৈতন্যবস্তুই আত্মা। বৃহদারণ্যক উপনিষদে উল্লেখ রহিয়াছে; স্বভাবতঃ চৈতন্য স্বরূপ আত্মার ক্রিয়ার প্রকাশ না থাকিলেও বুদ্ধিতে উপহিত হইয়া বুদ্ধি সাদৃশ্য বশতঃ দেহেন্দ্রিয় সঙ্ঘাতকে অবভাসিত করিয়া তাহাতে যে ক্রিয়া আরোপিত হয়; অর্থাৎ সেই আমি দেখিতেছি, সেই আমিই শুনিতেছি কিংবা বলিতেছি, ইত্যাদি রূপভাবে প্রতিভাত হইলেও, অন্তর্জ্যোতি স্বরূপ এক অনুভবকারীরূপে আত্মাকে জানা যায়। তাৎপর্য এই,- যাহা আমা কর্ত্তৃক দৃশ্য, তাহা দ্রষ্টা আমি হইতে অবশ্যই ভিন্ন.- সুতরাং শরীর ও ইন্দ্রিয়াদিতে, যাহা কিছু দৃশ্য অনুমেয় আছে, তাহাদিগের একমাত্র দ্রষ্টা চৈতন্যাংশই, আত্মা।

ঈশোপনিষদে জানা যায়,- জীবগণের হৃদয়গুহাতে স্থিত, আত্মা হইতে মন যতদূরে, ইন্দ্রিয়গণ অধিক দূরবর্ত্তী বলিয়া মন তাঁহাকে জানিতে পারিলেও, ইহা বুঝা যায় যে, প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি বিষয়ে মন স্বাধীন নহে,- কেননা অকর্ত্তব্য বিষয়ে সংস্কার-

বশে প্রবৃত্ত হইলে মনকে নিবৃত্ত করিবার প্রেরণাদাতা কেউ রহিয়াছে,- নির্মল বুদ্ধি দ্বারা উপলব্ধ, তিনি আত্মা। কঠোপনিষদে উল্লেখ রহিয়াছে,- এই পুরুষ জীবমাত্রেই অবিদ্যাচ্ছন্ন থাকায়, আত্মারূপে প্রকাশিত না হইলেও, মনের নিয়ন্তা একাগ্রতা-রূপ বুদ্ধিসহায়ে বিষয় কল্পনা শূন্য মনোবৃত্তি দ্বারা তাঁহাকে উপলব্ধি করা যায়। পরন্তু কোন কিছুর গুণ বা ধর্মকে একটি অবলম্বন গ্রহণ করিতে হয় বলিয়া, বুদ্ধিরূপ গুণের আশ্রয়রূপে আত্মার সত্তা স্বীকৃত। প্রাসঙ্গিক দ্বিতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় বল্লীর তৃতীয় ও চতুর্থ মন্ত্রের সারাংশ উল্লেখ করা যাইতে পারে, এইরূপ যে,- যিনি দেহ হইতে বিমুক্ত হইলে, দেহেন্দ্রিয় সমষ্টি চেতনাশূন্য বিধ্বস্ত হয় কিংবা যাঁহার অবস্থান ব্যতীত চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় ও পঞ্চপ্রাণ পরস্পর সংহত হইয়া কার্য্য করিতে পারে না,- দেহাদি হইতে পৃথক, তিনি আত্মা।

শ্রীগীতার সপ্তম অধ্যায়ে বিশেষ উক্তি এইরূপ,- আত্মতত্ত্ব বিষয়ে প্রতিবন্ধ জ্ঞান লইয়া জাতব্যক্তি ধনজন যৌবনের আড়ম্বরে মৃত্যু ভাবনা ভুলিয়া গিয়া আত্মাকেও বিস্মৃত হয়, ফলে এই দুঃখদগ্ধ জগতে পুনরায় জন্মলাভ ঘটে। সুতরাং নিরন্তর যাতনাময় সংসার ভূমিতে পুনর্জন্মের কারণ রোধ করাই জীবের প্রধান ধর্ম। মুণ্ডক উপনিষদের প্রারম্ভেই উক্তি এই; ব্রহ্মজ্ঞানই পরাবিদ্যা,- যাহা সুবিদিত হইলে আত্মতত্ত্ব প্রভৃতি সমস্তই বিজ্ঞাত হইয়া, কর্মবন্ধন হইতে মুক্তিলাভ ঘটে। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ চতুর্থ অধ্যায়ের। দশমমন্ত্রে, অবিদ্যারদ্বারা বদ্ধজীবের, আত্মজ্ঞানরূপ বিদ্যার উদয়ে মোক্ষপ্রাপ্তির কথা আছে। ঐতরেয়োপনিষদ প্রথম অধ্যায়ে দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথমেই বর্ণিত হইয়াছে যে,- অন্য সকল জীবদেহ কেবলমাত্র পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত পাপপুণ্যের ফলভোগের উপায় মাত্র,- কিন্তু মানবদেহে স্বীয় প্রচেষ্টায় পুণ্যাদি নূতন কর্মফল অর্জ্জিত করা যায়। সুতরাং ইহাই নির্দ্ধারণ করা যায় যে, অতীত কর্মফল অনুভবের বাসনা, যাহা সংস্কার নামে বিদিত; নিষ্ক্রিয় আত্মার উপলব্ধি দ্বারা, নিজেকে কর্মাদির দ্রষ্টারূপে দেখিয়া পূর্ব্ব জন্মবাসনার সংস্কার নাশ করিবার প্রচেষ্টাই যুক্তিযুক্ত সিদ্ধান্ত।

সাংখ্য ও যোগদর্শনে মীমাংসা এই,- পুরুষ বা আত্মা, স্বরূপতঃ মুক্ত ও নিত্য সত্ত্বেও, অজ্ঞানতাবশতঃ বা অবিবেক প্রসূত অথবা অবিদ্যার প্রভাবে কিংবা মায়া-কর্ত্তৃক পরাভূত থাকিয়া, নিজেকে দেহমন ইন্দ্রিয়াদির সহিত একত্ব অবধারণ করিয়াও দেহে সুখদুঃখাদিতে অভিভূত হইয়া, ভববন্ধন দশা প্রাপ্ত হয়,- অর্থাৎ জন্মমৃত্যুরূপ ভবলীলার অন্তর্গত হইয়া থাকে। আত্মা দেহমন প্রভৃতি হইতে সম্পূর্ণ ভাবে পৃথক সত্তা,- যোগসাধনা অবলম্বনে চিত্তশুদ্ধি করিয়া, এইরূপ জ্ঞানদ্বারা বিষয়ের

স্বরূপ উপলব্ধিতে বিবেক বা তত্ত্বজ্ঞান উদয় হইলে জীবাত্মা সংসার বন্ধন হইতে চিরতরে মুক্ত হইয়া স্বরূপ, অর্থাৎ নিজ মহিমায় প্রতিষ্ঠালাভ করে, ইহাই জীবের মুক্ত অবস্থা।

বেদান্ত দর্শন বলেন,- আত্মা স্বরূপতঃ শুদ্ধ ও মুক্ত। কিন্তু দেহাশ্রয় করিয়া মায়াবশে, দেহের জন্মমৃত্যু সুখদুঃখ প্রভৃতিকে জীবাত্মার বা নিজের ভোগ বলিয়া মনে করে। জীবের স্বরূপ জ্ঞানের অভাবই, বদ্ধাবস্থার কারণ। পরজ্ঞান লাভ হইলেই অবিদ্যার মোহজাল অপসারিত হইয়া, জীব স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। আত্মজ্ঞান লাভ করিতে, চতুর্ব্বিধ সাধনার প্রয়োজন। যথা, নিত্যানিত্য বস্তু বিবেক,- অর্থাৎ অনিত্য বস্তু হইতে নিত্যবস্তু যে ভিন্ন, তাহার যথাযথ তাৎপর্য্য উপলব্ধি, ভোগবিরাগ,- অর্থাৎ সংসারের যাবতীয় ভোগ্যবস্তুর প্রতি লোলুপতার নিবৃত্তি বা ভোগে উদাসীন্য। ইন্দ্রিয় ও মনের সংযম অভ্যাস,- অর্থাৎ ধ্যানাভ্যাস ও বিষয়ভোগে বিতৃষ্ণা সাধনদ্বারা মনকে এরূপ সংযত করিতে হইবে, যেন মনোবৃত্তি অন্যের দুঃখের হেতু না হইয়া, বরং দুঃখ নিবৃত্তির কারণ হইয়া থাকে। চিত্তে মুক্তি লাভের প্রবল আকাঙ্খা,- অর্থাৎ জ্ঞানপ্রবণ প্রবৃত্তির প্রাবল্যে মানব সংসারের সহিত সম্বন্ধ বিরক্তিকর বোধ হইয়া, পরমার্থ সদ্ বস্তুতেই জীবনের লক্ষ্য স্থির রাখা।

বৈশেষিক দর্শন মতে,- দেহমন ও ইন্দ্রিয়াদির সহিত সংযোগ ঘটিলেই, জীবাত্মা বদ্ধাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া থাকে,- ফলতঃ দুঃখভোগ অনিবার্য্য হইয়া পড়ে। বহির্জগতের সংস্পর্শে দেহস্থিত ইন্দ্রিয়াদি, যেসকল বিরুদ্ধ পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়, তাহা অন্তরে অনবরত সংক্ষোভ সৃষ্টি করে, যাহার বেদনাবোধে আত্মাও অভিভূত হয়। সুতরাং ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া দেহ ও ইন্দ্রিয়াদির আকর্ষণ হইতে সম্পূর্ণ নিষ্কৃতি না হওয়া পর্য্যন্ত আত্মার মুক্তি সম্ভব নয়। দেহাদি হইতে জীবাত্মা স্বতন্ত্র স্বরূপ,- এইরূপ জ্ঞান বা অজ্ঞান, উভ কালেই জীব পরমার্থতঃ ব্রহ্মস্বরূপ,- বিস্মৃতি অপগত হইলে ব্রহ্মত্বের জ্ঞান সম্যক উদ্ভাসিত হয় মাত্র, অর্থাৎ 'আমি ব্রহ্মসদৃশ' এইরূপ তত্ত্বজ্ঞানের উপলব্ধি হয়। এই অবস্থা প্রাপ্তি বা লাভের উপায়,- শ্রবণ, অর্থাৎ আত্মার যথার্থ স্বরূপ সম্পর্কে ব্রহ্মজ্ঞানীর বাক্য অনুধাবন বা শাস্ত্রাদির অনুশীলন। মনন, অর্থাৎ বিষয়াদি দুঃখপ্রদ, ভোগকালে এবং ভোগান্তেও দুঃখদায়ক, এরূপ অনবরত বিচার বিবেচনা করা। নিদিধ্যাসন, অর্থাৎ উপাসনাবস্তুকে চিত্তের বশীকরণ দ্বারা, তৈলধারার ন্যায় প্রত্যয় প্রবাহে স্থিত থাকিয়া, বিজাতীয় ভাব উদয় হইলে, তাহা অপসারণ করিয়া, সজাতীয় ভাব বা ইষ্ট চিন্তায় মনকে সতত প্রবুদ্ধ করা।

বিশিষ্টাদ্বৈত মতবাদ অনুসারে, কর্মফল ভোগের জন্যই আত্মা দেহে বন্ধন

প্রাপ্ত হয়। দেহবুদ্ধির প্রাবল্যহেতু আত্মবুদ্ধি অন্তর্হিত হইয়া যায়,- জীব ক্ষুধাতৃষ্ণা জন্মমৃত্যু, জরাব্যাধি প্রভৃতি জড়ধর্মের আধীন হয়। আত্মার দেহধারণই বন্ধন দশা। দেহের প্রতি আত্মার মোহমুক্তি জ। প্র[illegible]জন,- যুগপৎ জ্ঞান ও কর্মের অনুশীলন। অনাসক্ত হইয়া কর্তব্যকর্ম করিলে, ক্রমে চিত্তশুদ্ধি ও পরে জ্ঞানলাভ হয়। জ্ঞানের উদয়ে ভক্তিভাব জাগ্রত হই[illegible], অন্তরে দেবত্ব প্রস্ফুটিত হইয়া থাকে। মন তখন অন্তর্মুখীন ও একাগ্র হইয়া আত্মায় স্থিত হয়,- উপলব্ধি হয় আত্মা ও দেহ ভিন্ন,- আত্মা ব্রহ্মের অংশীভূত ও ব্রহ্মকর্তৃক নি[illegible]ন্ত্রিত। কিন্তু ইহা দ্বারা মোক্ষলাভ সম্ভব হয় না,- ভগবৎকৃপার প্রয়োজন হয়। সেই কৃপা [illegible]। তদনুরূপ ঈশ্বরধ্যানরূপ উপাসনা দ্বারা, জীব ভগবৎ সাক্ষাৎকাররূপ মুক্তি[illegible] যোগ্য হয়। মুক্তিতে জীব শুদ্ধচৈতন্য অবস্থালাভ করে বটে,- কিন্তু একেবারে ব্রহ্ম হইতে পারে না। কারণ সসীম জীবাত্মার পক্ষে অসীম ব্রহ্ম হওয়া সম্ভব নয়। দেহবন্ধন হইতে মুক্তি প্রাপ্ত জীব 'আমি' অভিমান সহ স্বীয় স্বতন্ত্র মহিমায় বিরাজ করে,- অর্থাৎ 'আমি আছি' মুক্তিতেও জীবাত্মার এইরূপ অনুভব বিলুপ্ত হয় না।

শ্রীমদ্ভাগবত প্রথমস্কন্ধ দ্বিতীয় অধ্যায়ের দশম শ্লোকে, বলা হইয়াছে,— জীবন যাত্রা নির্বাহের জন্য বিষয়ভোগে প্রবৃত্ত থাকিতে হইলেও, মানবজীবনের প্রধান প্রয়োজন 'তত্ত্বজিজ্ঞাসা'। এইসম্পর্কে পরবর্তী একাদশশ্লোকে উল্লেখ রহিয়াছে, তত্ত্বজ্ঞ আচার্যগণ যেই অদ্বয়জ্ঞানকে 'তত্ত্ব' অভিহিত করেন, তাহাই ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান, এই তিনপ্রকারে সংজ্ঞিত। তাৎপর্য্য এই সাধকের অনুভূতির ভেদবশতঃ একই পরমতত্ত্ব কখনও ব্রহ্মরূপে, পরমাত্মারূপে কিংবা ভগবানরূপে, প্রতিভাত হন। অর্থাৎ জ্ঞান প্রবণ মনোবৃত্তির চরমোৎকর্ষ অবস্থায়, যেই তত্ত্ব নামরূপাতীত, এক অদ্বিতীয় স্বয়ংপ্রকাশ চৈতন্যরূপে, অন্তরে স্ফুরিত হন—, তাহা 'ব্রহ্ম' নামে নিরূপিত, ভাবপ্রবণ মানবমন যে তত্ত্বকে অন্তর্যামীভাবে ধ্যান ও [illegible]রূপে অন্তরে অনুভব করে,— তাহাই 'পরমাত্মা' বলিয়া শব্দিত, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে পরিচালকের প্রতি যখন প্রেম সঞ্চারিত হয়, ভক্তের সেই পরম উৎকর্ষ দশায়, সর্ব্ব পুরুষার্থের সিদ্ধি, সর্ব্বসুখ প্রদাতা, সর্ব্ব কল্যাণ কারী ভক্তের ইষ্টদাতা 'ভগবান' নামে পরিকীর্ত্তিত।

মানবের শ্রেয় পরমার্থ তত্ত্বের উপলব্ধিকৃত স্বরূপ সম্পর্কে শ্রীগীতার সর্ব্বশেষ অধ্যায়ের, তিপান্ন হইতে ছাপান্ন শ্লোকে যে অপূর্ব্ব সমাধান রহিয়াছে, তাহা এইরূপ, দেহেন্দ্রিয়াদিতে আত্মবুদ্ধি; কামরাগাদিযুক্ত বল, দর্প, অহংকার ত্যাগ করিয়া, জীবন পরিবেশ বিষয়ে মমতাবর্জিত ও বাহিরের ব্যাপারে চিত্তবিক্ষেপহীন হইলে; এই জীব

সেই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়। ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হইলে সদা প্রসন্ন হ, কোনবস্তুর, বিয়োগে শোকগ্রস্ত এবং অপ্রাপ্ত বস্তু লাভ করিতে অভিলাষী হন না; সকল প্রাণীর প্রতি সমত্ব বুদ্ধি উৎপন্ন হই।, তাঁহাতে পরাভক্তি উদয় হয়। এই একনিষ্ঠ ভক্তি প্রভাবেই, ভক্তগণ, ভক্তানুগ্রহকাতর সর্বান্তর্যামী পরমপুরুষ শ্রীভগবানের অপার মহিমা, জানিতে বুঝিতে ও তাঁহার তত্ত্বে প্রবেশ করিতে সমর্থ হইয়া ভগবৎ ইচ্ছার প্রতি চিত্ত সমর্পিত ও ভগবৎ বিধানে আত্মসমর্পণ করিয়া মুক্ত হই, জীবলীলা অবসানে সাধক অসংশয়ে লাভ করিয়া ইষ্টদেবতার সান্নিধ্যে উপনীত হন, জীবের ইহাই চরমগতি ও পরম প্রাপ্তি।

ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবানের প্রতি জীবের ভক্তি বা অনুরক্তি, জীবাত্মার স্বাভাবিক বৃত্তি শ্রীমদ্ভাগবত প্রথমস্কন্ধ সপ্তম অধ্যায়ে দশম শ্লোকে, ইহা উল্লেখ আছে, ভগবৎমহিমার এমনই অনির্বচনীয় গুণ যে, সমস্ত কাম রহিত, এমন কি সর্ব্বসম্বন্ধ মুক্ত মুনিগণও, শ্রীভগবানকে অহৈতুকী ভক্তিপূর্ব্বক ভজনা করিতে ভালবাসেন গীতা সপ্তম অধ্যায় সপ্তদশ শ্লোকে বলা হইয়াছে, যাঁরা ভগবানের সহিত সর্ব্বদাই যুক্ত, বিশেষ শরণাগত ভগবদ্ভক্তের চিত্তে, এইরূপ বুদ্ধি সুদৃঢ় হইয়া থাকে। যে হেতু আমরা জীবাত্মা ব্যক্তিরূপে পাইতেই ইচ্ছা করিয়া থাকি, তাই তাঁহাকে সাকার ভগবানভাবে আরাধনা করাই, সর্ব্বোত্তম বলি। এইভাবে উপাসনা সম্পর্কে, শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধ দ্বিতীয় অধ্যায়ের ছত্রিশ শ্লোক অনুসারে, অর্থাৎ কায়, মন, বাক্য, বুদ্ধি দ্বারা প্রকৃতির প্রেরণাবশে, যাহাকিছু কার্য্য অনুষ্ঠিত হয়, তৎ সমুদয় পরাৎপর উদ্দেশ্যে নমস্কার বলিয়া, পরমপুরুষ শ্রীভগবানকে সমর্পণ করিবে। স্কন্দপুরাণে উল্লেখ, মধুর হইতে মধুর, মঙ্গল হইতে মঙ্গল, শ্রীভগবানের চিৎস্বরূপ নাম হেলায় বা শ্রদ্ধায় উচ্চারণ করিবেন, তাহা উপাসনা করা হয়; ভববন্ধন হইতে ত্রাণের...।

গীতা দ্বিতীয় অধ্যায়ে সাতচল্লিশ শ্লোকে উল্লেখ হইয়াছে, যেহেতু কর্ম্ম ফল তৃষ্ণাই, কর্ম্মফল প্রাপ্তির হেতু হয়, তাই কর্ম্মে জীবের অধিকার, ফলপ্রাপ্তি বা কর্ম্মত্যাগের প্রবৃত্তিতে নহে। নবম অধ্যায়ের সাতাইশ শ্লোকে যাবতীয় কর্ম্মের অনুষ্ঠান, ভগবৎ উদ্দেশ্যে অর্পণ করিয়া থাকে,— শুভাশুভ ফলবিশিষ্ট কর্ম্মের বন্ধ হইতে মুক্ত হইবার উপায় নির্দ্দেশ বর্ণিত পরবর্ত্তী চৌত্রিশ শ্লোকে, এই সুখহীন অনিত্য মর্ত্ত্যলোকে জীবনে, ভগবৎস্বরূপের ভজনা করিবার উপদেশ। দ্বাদশ অধ্যায়ের অষ্টম শ্লোকে, সেইহেতু পরমানন্দ স্বরূপে স্থিতিলাভ জন্য, মনবুদ্ধিকে ভগবানের প্রতি,— অর্থাৎ পঞ্চদশ অধ্যায়ের অষ্টাদশ শ্লোকে কথিত, পুরুষোত্তম নামে প্রখ্যাত, ভগবৎ বিধানের অভিমুখে স্থির রাখিবার জন্য সম্বন্ধ উক্তিরূপ নির্দ্দেশ। অষ্টাদশ অধ্যায়ের বাষট্টি শ্লোকে, সর্ব্বজীবের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত থাকিয়া, যন্ত্রারূঢ় পুত্ত

লিকার ন্যায়, তাহাদিগের চালনাকারী,—অন্তর্যামী নারায়ণক চিন্ত, বাক্য ও কর্ম দ্বারা সর্ব্বতোভাবে শরণাগত হইবার নির্দ্দেশ। অতএব ইহাই প্রতিপাদিত হয় যে ভগবৎস্বরূপই জীবের আরাধ্য এবং তাঁহার কৃপালাভের জন্য সর্ব্বকর্ম ফলস্পৃহা তাঁহাকে উপহার প্রদান করিয়া সংসারকর্তব্য পালন বিধেয় এবং যেহেতু তাঁহার অনুগ্রহেই তাঁহাকে স্তুতি করিতে পারা যায়, তাই অবিরত ভগবৎ নাম জপদ্বারা চিত্তশুদ্ধি করিয়া ভগবৎকৃপা আকর্ষণের ক্ষেত্র প্রস্তুত করাই 'সাধনা'।

যাঁহার ভক্তিপূত, সুনির্মল সর্ব্বভূত হিতোন্মত, শান্তোজ্জ্বল, অমিয়মধুর যশো জ্যোৎস্নার করুণা কিরণে অভিনবরূপে উদ্ভাসিত বঙ্গভূমির পারমার্থিক চিত্ত, কলি যুগ প্রভাবিত বহির্মুখ জীব জীবনে, অধ্যাত্ম অর্থবোধের নবতর রূপ সন্ধান পাইয়া, সমস্ত অনুভূতি সমগ্র চেতনা, সকল আকাঙ্খাকে, অনাবিল রূপরসে পরিপ্লুত করিয়া সারাভারতে চিরস্মরণীয় রূপ বিস্তারিত হইয়াছিল, এবং সদ্‌গতি প্রাপ্তির পথ সহজতর বোধে, তাঁহার প্রবর্তিত অচিন্ত্য ভেদাভেদ তত্ত্ব, পরমশ্রদ্ধায় নিখিলবিশ্বে সম্যকরূপে প্রসারিত হইয়া, নগরাদি গ্রামগ্রামান্তরে প্রচারিত ও পরিশীলিত, যিনি ভগবৎনাম অন্তরের আর্ত্তিতে সতত উচ্চারণরূপ জপসাধনাকেই উপাস্য ও সর্ব্বৈকার পুরুষার্থ সিদ্ধির তথা অপরিণামী ভগবৎ পার্ষদরূপ নিত্যপদ প্রাপ্তির একমাত্র উপায় বলিয়া উদাত্তকণ্ঠের জলদগম্ভীরস্বরে ঘোষণা করিয়াছেন, যাহার যথাযথ অনুশীলনের অনুবর্তন প্রভাব অন্তরকে নির্মল করিয়া লক্ষ লক্ষ দীনদুর্গত অজ্ঞ অসহায় নরনারীর সংসার তাপদগ্ধহৃদয়ে অদ্যবধি অবিরল ধারায় শান্তি বারি সিঞ্চন করিয়া অবর্ণনীয় সুখানুভূতি ও অফুরন্ত আধ্যাত্মিক শক্তি অনুভবের সন্ধান প্রদান করিতেছে—

পঞ্চশতবর্ষকাল পূর্ব্বে বঙ্গদেশের তৎকালীন প্রধানতম বিদ্যাপীঠ নবদ্বীপ নগরে বৈদিক ব্রাহ্মণকুলে বিষ্ণুভক্ত নিঃসপত্ন উদার, অপরিসীম বিদ্যাবত্তার অধিকারী, সর্ব্বজনবরেণ্য পণ্ডিত জগন্নাথমিশ্রের দ্বিতীয়পুত্ররূপে অবতীর্ণ হইয়া, যিনি ভগবৎ প্রেম ভক্তি আপনি আস্বাদন করিয়া তাহা অনুভবের সরল উপায় আপামর সর্ব্ব সাধা রণের মধ্যে বিতরণ করিবার অভিলাসে নীরব নিভৃত অরণ্য শ্বাপদ সঙ্কুল গিরিকান্তার পথ ক্লান্তশ্রান্ত পদে একাকী বিচরণ করিয়াছিলেন, যাঁহার অধ্যাত্ম দর্শনের বিচার শক্তি আধ্যাত্মিক গভীরতা ও অনুভূতির অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা ভাবপ্রকাশের অসা ধারণতা তাৎকালিক ভারতের শ্রেষ্ঠ বৈদান্তিক পণ্ডিতবর্গকে পরাভব স্বীকার করাইয়া স্বমতে আনয়ন করাইয়াছিল;

সেই রাধাভাবদ্যুতি শবলিত অলোকসামান্য কনককান্তি সদৃশ অসাধারণ সৌন্দর্য্য ময় অতি উন্নত সুগঠিত লাবণ্যময় ও চিন্ময় দেহধারী দীনদয়াল প্রেমের ঠাকুর সুগৃহীত নামা পুণ্যশ্লোক মুণ্ডিত মস্তক কটি মাত্র বস্ত্রপরিবৃত দণ্ডকমণ্ডলধারী প্রতিভা দীপ্ত তরুণ সন্ন্যাসী।

আমি ও আমার ধর্ম

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর করুণা পূর্ব্বক সমর্পিত উজ্জ্বলরসের ধর্মীয় তত্ত্বাদর্শ,-অর্থাৎ স্বার্থ গন্ধবিরহিত অকৈতব ভগবৎ প্রেমরূপ বৈষ্ণবধর্মের, অন্তর্নিহিত মৌলিক তত্ত্বের শ্রবণ, মনন ও অনুধ্যান, তথা ভগবানের দীপ্তিময় ও চৈতন্যস্বরূপ নামের মাহাত্ম্য বা তাৎপর্য্য না জানিয়াও, তাহা সতত জপ বা যথাবিধি উচ্চারণ অথবা যথারতথায়,যে কোন অবস্থায় তাহার স্মরণ-কিংবা বহুজন মিলিত হইয়া পরমামৃতায়মান শ্রবণ মঙ্গল সর্ব্বশ্রীবর্দ্ধক সর্ব্ব পাপনাশী, ভগবানের প্রীতিসম্পাদক নামলীলা গান অনুশীলনদ্বারা; সাধকোচিত মনোবৃত্তি আয়ত্ত করিয়া, জীবনকে নিজমহিমায়, প্রতিষ্ঠিত করাইয়া,-অর্থাৎ সর্ব্বত্র, সকলদিকে, প্রত্যেক জীবে সমভাবে প্রকাশমান, সর্ব্বলোকমনোহর' সর্ব্বাকর্ষক, সর্বজন সুহৃদ, সর্বদাই করুণাময়, সদাজনগণের হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট, শ্রীভগবানের আনন্দময় ঐশ্বর্য্যময় পরমসত্তার বিকাশ অনুধাবনদ্বারা,-অন্তরকে জ্যোতির্ময়, জ্যোতিষ্মান বা প্রদীপ্ত করিয়া,-অর্থাৎ চিত্তবৃত্তিকে ভগবপ্রীতিরূপ রসমৃত সিন্ধু অভিমুখে ক্রম বিস্তারশীল রাখিয়া,-ভক্তিপথে,-অর্থাৎ এই ত্রিতাপসঙ্কুল মৃত্যুময় ভবসমুদ্রের' মৃত্যুহীন অপরপারে দিব্যধাম উত্তীর্ণ হইবারজন্য, যাগযজ্ঞ বা ঈশ্বরের প্রতি অনুরাগহীন ভেলা বা প্লব সুদৃঢ়নহে, নিশ্চয় স্থির করিয়া,-সর্ব্বমাধুর্য্যের সার, আত্মার আত্মা, প্রাণের প্রাণ সকল জীবের সুহৃদ শ্রীভগবানের প্রীত্যর্থে নিজেকে বিলাইয়া দিয়া, তাঁহারই ইচ্ছার নির্ভরে বাঁচিয়া থাকারূপ আত্ম নিবেদিত প্রেমের উপলব্ধিতে,-সংসারদশা,-অর্থাৎ জন্মমৃত্যুরূপ ভববন্ধনের আবর্ত্ত হইতে, চিরমুক্তি প্রাপ্তি ও নামের প্রতিপাদ্য পরম দেবতাকে আত্মবৎ লাভ করিয়া, পূর্ণ মনোরথ হইবার, উৎকৃষ্ট অথচ অনায়াস লভ্য পথ বা কলিহত জীবের পরম উপায়।

" Whatever celetial from a devotee chooses to worship with reverence, I stabilize the faith of that particular devotee in that very form' gita 7/21.

"গৃহস্থ যবে দেখে আপনার শিথিল চর্ম' আর
চুল পেকে গেছে, জরা দেয় উঁকি জন্মেছে নাতি তার,-
বাড়ী ঘরদোর বিষয় আশয়, ত্যাগ করে সব মায়া,
নির্জনে গিয়ে আশ্রয় নেবে, অসার জেনে এ কায়া।" (মনুসংহিতা)

" ধর্মের পুরস্কার আর্থিক লাভ নয়। তাহা হইলে ধর্ম একটি উচ্চ ব্যবসায় হইত ধর্মের পুরস্কারই।" (গিরিশচন্দ্র ঘোষ)

আমি ও আমার ধর্ম

১২ পৃষ্ঠার পর হইতে,-

"ঘরের ছেলের চোখেতে দেখেছি বিশ্বরূপের ছায়া,
বাঙ্গালীর হিয়া অমিয় মাথিয়া নিমাই ধরেছে কায়া।"

কিঞ্চিদধিক পাঁচশত বৎসরকাল পূর্বে, পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে,- রাষ্ট্রশক্তি হারা জাতীয় জীবনে দুর্যোগ যখন ঘনীভূত,- জাতিভেদ দূষিত অনুদার সমাজে ধর্মান্তরিত ক্রমবর্দ্ধমান,- ধর্মাচরণ অন্তরের সংযোগহীন কেবল আচার অনুষ্ঠানে পর্য্যবসিত,- বিত্তশালী ব্যক্তিগণ, ভিন্ন ধর্মীয় শাসককুলের অনুশাসন অনুসরণে, আপনাপন স্বার্থসিদ্ধিতে অনুরক্ত,- বিপুল পাণ্ডিত্য ও ক্ষুরধার বুদ্ধির অধিকারী, সমাজের শীর্ষ স্থানীয় পাণ্ডিতবর্গ, বিদ্যার দম্ভ ও আভিজাত্যের গর্বে আত্মবিস্মৃত এবং ভগবদ্ভক্তি অবলুপ্ত,- সেই ঘোর কলিকাল প্রভাবিত, অজ্ঞান তমিস্রায় আচ্ছন্ন ম্রিয়মান ধর্মসঙ্কট যুগে, এই বঙ্গদেশে বিদ্যাচর্চার অন্যতম কেন্দ্র নবদ্বীপ নগরীতে, ২৩শে ফাল্গুন শনিবার ১৪০৭ শকের সন্ধ্যাকালে দোলপূর্ণিমা তিথিতে,- অর্থাৎ ২৭শে ফেব্রুয়ারী ১৪৮৬ খৃষ্টাব্দে, পরবর্ত্তী সময়ে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নামে খ্যাত, নিমাই পণ্ডিত আবির্ভূত হইয়া, তৎকালীন বৈদিক সংস্কৃতির বিপর্যয় জনিত, আধ্যাত্মিক দুর্মতির দুঃসময়ে ও মহাজনপন্থার বিকৃতভাষ্যে উদ্‌ভ্রান্ত, জনসমাজের ভগবৎ বিমুখ মানসিকতাকে, ভাগবতীয়ভাবে উদ্‌বুদ্ধ করিয়া, সনাতন ধর্মের অস্তিত্ব পুনরুজ্জীবিত করিবার মানসে, সমগ্র ভারতভূমি পদব্রজে পর্য্যটন করিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন,-

ভগবান অখণ্ড রসস্বরূপ। তিনি পরমানন্দময়। সর্ব্বত্রই তাঁহার প্রসারিত প্রসন্নতা। রস বা আনন্দই পরতত্ত্বের পরম ও চরমস্বরূপ। আনন্দই তাঁহার ভাব,- আনন্দই তাঁহার উপাদান,- আনন্দেইনিতি অবস্থিত এবং আনন্দই সৃষ্টির রহস্য। আমরা জাগতিক যাহাকিছুর জন্য লালায়িত,তাহা সমস্তই অস্থায়ী এবং যাহা চির দিন থাকে না, তাহার জন্য আকাঙ্খা ও অভাববোধই মানবের স্বভাব। তাই জীব-জীবনে যত দুঃখ। দয়াময় ভগবানকে মন হইতে দূরে রাখাই দুর্ব্বুদ্ধি এবং ভগবৎ চিন্তা ছাড়িলেই দুশ্চিন্তা আসে। সর্ব্বদা ভক্তিপূর্ব্বক ভগবানের মহিমময় যেকোন নামজপেই, জীবনকে তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট করিয়া অন্তর পবিত্র ও কল্যাণে পূর্ণ করিবার প্রকৃষ্ট উপায়। পরন্তু ভক্ত যেমন তাঁহার সহিত যুক্ত হইতে প্রয়াসী,- ভক্ত-বৎসল ভগবানও তেমনি ভক্তহৃদয়ে প্রেমভক্তির অভ্যুদয়ে, তদীয় ভক্তের মনো-বাঞ্ছা পূরক হইতে প্রত্যাশী। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থের মধ্যলীলা বিংশপরিচ্ছেদ অন্তর্গত- "কে আমি ? কেন আমায় জারে তাপত্রয়" শ্রীমৎ সনাতন গোস্বামীর এই সার্ব্বজনীন তত্ত্বজিজ্ঞাসার উত্তরে, শ্রীমন্মহাপ্রভু উপদিষ্ট উপরোক্ত তত্ত্বসন্দেশের

মর্মবাণী, এই পুস্তকের প্রথমবীজ বা মধ্যবস্তু রূপে অনুসৃত হইয়াছে।

প্রাসঙ্গিক উল্লেখযোগ্য যে, ভগবানবা তাঁহার শক্তি বিশেষ প্রয়োজনে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন,- যাহা জন্মমৃত্যুহীন পরমেশ্বরের মানবশরীর ধারণ করিয়া জন্ম গ্রহণ, বা বিশ্বব্যাপী বিশ্বেশ্বরের ভূতলে অবতরণ ও অবস্থান। এই তত্ত্ব আপাতবিরোধী বোধ হইলেও, যুগে যুগে অপার্থিব অভিপ্রায়ে জগদীশ্বরে জগতে আগমন. ঐতিহাসিক সত্য ঘটনা,- তখন তাঁহার প্রচলিত সাধন পদ্ধতিকেই যুগোপযোগী নবভাবে রূপায়িত করিয়া, ভগবৎ ভক্তি বৈভব প্রকাশ দ্বারা জনগণকে ভক্তিমার্গের উচ্চতর আদর্শের অভিমুখে অনুপ্রাণিত করেন। বস্তুতপক্ষে আত্মাকে আশ্রয় করিয়া, যে ধর্ম প্রকাশ পায়, তাহাই অধ্যাত্মধর্ম এবং পরমাত্মার প্রতি জীবাত্মার যে আত্মসমর্পণ, তাহা আত্মধর্ম। পুস্তকের দ্বিতীয়াংশে উপনিষদ গীতা অনুসরণে এই জৈবধর্ম যথাসম্ভব আলোচিত।

"অনুমানে প্রমাণে নহে ঈশ্বরতত্ত্ব জ্ঞানে।
ঐশীকৃপা বিনা কেহ সেই তত্ত্ব নাহি জানে।

ভগবৎ মহিমা তথা ধর্ম সাধনার মাহাত্ম্য, উপলব্ধি করিতে, সর্ব্বান্তঃকরণে অধ্যাত্ম পথের পথিক হইতে হয়,- তবেই ঐশ্বরিক অভিলাষের অনুপ্রেরণা অন্তরে সুস্পষ্ট হইয়া, থাকে। লৌকিক সাহিত্য কল্পনা আশ্রিত,- পরন্তু ভাগবতীয় সুনৃতবাকের উৎপাদয়িতা,- লোকের সুমতিদানকারী, ধী-শক্তির প্রেরণাদাতা ঐশ্বরিক শক্তি হইতে উৎসারিত। তাই ভাগবতীবিদ্যা আয়ত্ত করিতে মহাপ্রাণের সহিত যোগে যুক্ত হওয়া প্রয়োজন এবং ইহার উপায় নির্দ্ধারণই ভারতীয় প্রাচীন সংস্কৃতির অতুলনীয় সম্পদ,- তথা চিরন্তন মহিমার বাণী। শাস্ত্রকারগন প্রথমেই সৎ সংসর্গদ্বারা শাস্ত্রাদি সম্পর্কে শ্রদ্ধাশীল হইবার উপদেশ প্রদান করিয়াছেন,- যাহাতে সাধু অনুগমনের ফলে বহির্মুখীন চিত্ত, অন্তর্মুখীন দিব্যচেতনার সহিত যুক্ত হইয়া আত্মস্বরূপের অনুভূতি দ্বারা পল্লবিত হইতে থাকে দিব্যভাবে।

প্রনিধানযোগ্য যে জীবাত্মার স্বরূপ অধিগত না হইলে,-অর্থাৎ চিৎ-প্রকর্ষের ঐশ্বর্য্য গোচরীভূত করিতে না পারিলে, সত্যানুভূতির পথ উন্মুক্ত হয় না'- তত্ত্বাবধারণ কেবল বুদ্ধি কৌশলের আচার অনুষ্ঠানরূপ বিচিত্র মূঢ়তায় পর্য্যবসিত হয়,-মর্মের গ্রন্থি পরমাত্মার সহিত বিশ্লিষ্ট হইয়া, ধর্মাচর্চায় আড়ম্বর উদ্দীপনাই অধিক প্রকাশ পায়, চিত্তে রিক্ততা আসিয়া আসন্ন আলোকের আভাসও, অন্ধকার বলিয়া ভ্রম হয়। কারণ নিত্য নৈমিত্তিক সদাচার দ্বারা মানসিক বৃত্তির উৎকর্ষ হইলেও, শাস্ত্রীয় সূক্ষ্মভাবনার উপর প্রতিষ্ঠিত দিব্যসম্পদলাভ করিয়া পরমাত্মাকে প্রিয়তম অনুভব করা যায় না।

আমি ও আমার ধর্ম

যেহেতু মানবের ইন্দ্রিয়বৃত্তি কেবলই ভোগাভিমুখীন এবং প্রাণবৃত্তি জীবের অস্তিত্ব রক্ষায় সতত তৎপর,-অগ্রতিদ সংকোচ হইতে প্রাণেন্দ্রিয়ের সংবেগ সরাইয়া চেতনা অতিমানসরূপের পরিচয় ঘটানই অধ্যাত্মজীবনের ভিত্তিক। তাই প্রথমেই প্রয়োজন "আমি কি বস্তু, তাহা অবধারণ। কারণ আত্মজ্ঞানহীন জীবন, ইন্দ্রিয় প্রাণ মনের নিম্নভূমিতে সংবদ্ধ রহিয়া যাওয়ায়; মন্ত্যভূমে গতাগতি অবরুদ্ধ হয় না।

সকলেই আপন অন্তঃসত্তায় 'আমিবোধ' অনুভব করিয়া থাকে। কারণ ইহাই তাহার অস্তিত্বের কেন্দ্র। কিন্তু আলোকের স্বভাব অন্ধকার অপসারণ করা হইলেও, ইহার স্বরূপ যেমন দীপ্তি,-যেমনি অহং এর স্বরূপ, জ্ঞানের প্রকাশ। পরন্তু আলোকের নিকটস্থ বস্তুমাত্রকে আলোকিত করিবার ন্যায়, আত্মস্বরূপের জ্ঞান, সমীপবর্তী বিষয়াদি প্রকাশ করিয়াও, চিত্তকে বিষয়াতীত পরতত্ত্বের প্রতি প্রসারিত করিতে পারে। ইহাই জ্ঞানস্বরূপ আমির প্রকৃত পরিচয় এবং আমি জ্ঞানী, আমি কর্তা, ইহা তাঁহার স্বরূপ। যেহেতু এই আমিবোধ অবলম্বন করিয়াই, জ্ঞান ইচ্ছা, ক্রিয়া প্রকাশশীল,-তাই 'আমি কেন' বা আমির ধর্ম বা যথার্থ করণীয় কি, তাহাই মুমুক্ষু জীবের প্রধান অনুধাবনা।

"শুধু তোমার বাণী নয়গো, হে বন্ধু, হে প্রিয়'
মাঝে মাঝে প্রাণে তোমার পরশখানি দিও।"

উপনিষদে ঈশ্বরকে অন্তর্যামীপুরুষ বলা হইয়াছে। তাই ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রত্যেকের মনেই অনুস্যূত এবং এই ঈশ্বরবোধ হইতে, জীবের অহংবোধের বিকাশ। কারণ সমষ্টিচেতনা ঈশ্বর ও ব্যষ্টিচেতনা জীবের মধ্যে স্বতন্ত্রতা স্বীকার না করিলে, বিশ্বপতির সহিত বিশ্বজনের প্রেমসূত্রের সম্বন্ধ নির্ণয় করা যায় না। অর্থাৎ বিষয় ও বিষয়ীতে, জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়তে; গুণ ও গুণীতে, যেমন পার্থক্য পরিলক্ষিত,-তেমনি উপমা আরোপে, ঈশ্বর ও জীবে ভেদ স্থাপন না হইলে শাস্ত্রানুমোদিত পূজা উপাসনা নিরর্থক গণ্য হইয়া পড়ে। তাৎপর্য্য এই,-ব্রহ্মের ভগবান স্বরূপে, তিনি জীবের প্রেমাস্পদ এবং অহংভাবিত জীব কর্তৃক তিনি উপাসিত কিংবা জীব প্রেমের অভিলাষী। যেহেতু সম্বন্ধবোধ প্রায়শঃ মানসবুদ্ধি প্রসূত এবং অধ্যাত্ম অনুভূতি ব্যক্তি বিশেষে সন্নাত বুদ্ধির অতীত হইয়াও, তাহার অহংবোধের মাধ্যমেই স্ফুরিত ও ক্রিয়াম্বিত, তাই 'আমি' কি বস্তু এবং কি ভাবে ইন্দ্রিয়াদি সহায়ে তাহার প্রকাশ,-সাধনপথে প্রবেশের প্রাককালে, তাহাই অনুধাবনীয়।

এই প্রাথমিক প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিয়া, সাধারণজনের মনে আত্মপরিচয় সঞ্চারিত করিবার আগ্রহে, জীবের স্বরূপ সম্পর্কে একটি সহজবোধ্য পুস্তক রচনার অভীপ্সা, বহুকাল পূর্ব্ব হইতেই কল্পনায় সঞ্চরমাণ ছিল। যদিও চাকুরী জীবনের

প্রথমাবধিই, অবকাশ সময়ে আধ্যাত্মিক বিষয়ক প্রবন্ধ ও পুস্তক লেখা, আমার বিশেষ প্রিয় বিষয় বা খেয়াল,- কিন্তু সরকারী চাকুরী হইতে অবসর হইবার অব্যবহিত পরদিবসই, ত্রিপুরা শিক্ষাপর্ষদে দায়িত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত হইয়া, প্রায় পাঁচ বৎসর কাল একাদিক্রমে তথাকার বিভিন্ন বিভাগে অভিনব কর্ম জীবনের বহু ব্যস্ততার মধ্যে এবং বিশেষ কার্য্য ব্যপদেশে অনবরত মফঃস্বল সহরে যাতায়াত কারণে, পুস্তকরচনা করিবার নিশ্চিন্ত সুযোগ বা মানসিক স্থৈর্য্য লাভ করিতে পারি নাই।

অতঃপর শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর পঞ্চশতবর্ষ পূর্ত্তি উৎসব উপলক্ষে গঠিত, ত্রিপুরা রাজ্য কমিটির সাধারণ সম্পাদক,- প্রাক্তনমন্ত্রী শ্রীযুত যতীন্দ্রকুমার মজুমদার মহাশয়ের আগ্রহাতিশয্যে "শ্রীচৈতন্য আলেখ্য" নামে একটি গ্রন্থ প্রণয়নে ব্রতী হই এবং ইহার রচনা ও যুগপৎ মুদ্রণে বৎসরাধিক কাল অতিবাহিত হইয়া যায়। ইত্যোমধ্যে কয়েকজন বাল্যের সহপাঠীও নিকট আত্মীয় এবং 'প্রগতি বিদ্যাভবন' প্রতিষ্ঠায় আমার নিঃস্বার্থ সহযোগী গোপাল চক্রবর্ত্তীর জীবলীলায় অবসান ঘটে। মৃত্যুব্যথিত ও বেদনাকাতর চিত্তবিষাদে কোনরূপ লেখালেখির উদ্যম একেবারেই তিরোহিত হইয়া যায়,- জীবনের নশ্বরতার 'অনুভাবনাই প্রাণমনকে অনুক্ষণ ভারাক্রান্ত করিয়া রাখে,- যদিও উপরোক্ত পুস্তকের ভূমিকায়, শ্রদ্ধেয় যতীনবাবু বিশেষ উল্লেখ করিয়াছিলেন,- পরবর্ত্তী পর্য্যায়ে 'শ্রীরূপসনাতন শিক্ষা' প্রসঙ্গে এই লেখকেরই "আমি ও আমার ধর্ম" প্রকাশের বাসনা রইল এবং এই সম্পর্কে তাহার অবিরত অনুসন্ধিৎসা অব্যাহত ছিল।

"তটের বুকে লাগে জলের ঢেউ, তবে সে কলতান উঠে,
বাতাসে বনলতা শিহরি কাঁপে, তবে সে মর্মর ফোটে"

লেখকের রচনাবিন্যাস, প্রাক্তন জন্মবিদ্যার সহজাত সংস্কারবশেই, প্রকাশোন্মুখ হইয়া থাকে,- যেমন তৃণভক্ষণ করিয়া, গাভীই দুগ্ধ দেয়; বৃষ দিতে পারেনা। উপরন্তু সার্থক সৎ সাহিত্যে কাহারও অনুপ্রেরণা অবশ্যই স্বীকার করিতে হয়। কারণ নদীস্রোতে ভাসমান কতশত তরণীর ন্যায়, মানবের চিত্তক্ষেত্রে অসংখ্য চিন্তাভাবনা, আশাআকাঙ্ক্ষা আরূপ ভেলা অনবরতই ভাসিয়া চলিয়াছে, নৌকার মতই ইহাদের কোনটির গতি দ্রুত, কোনটার মন্থর, কোন একটি চরাভূমিতে আটকাইয়া গিয়াছে বা তীরে নোঙ্গর ফেলিয়া রহিয়াছে। সেইরূপ সাহিত্যচর্চাকারীর মর্মস্থলে অবিরত আসাযাওয়া করা ভাবান্তরের মধ্যে, বিশেষ কোন ভাবস্রোত রচনার আবেগ যেন স্থায়ী আসন পাতিয়া বসে,- যাহা ঐশী অভিপ্রায়ে

আমি ও আমার

কোন মর্মজ্ঞব্যক্তির অনুপ্রাণনায় লেখকের অন্তঃবেদনার জাগরণ ঘটাইয়া তাহার মনোমন্দিরের নিভৃতে লীন ভাবনার কুসুম কোরক নিকর, যথাসময়ে লেখনীমুখে প্রস্ফুট কথার মালায় রূপায়িত হইতে থাকে, যেমন পক্ষীকুলের কলরব মুখরিত উষাকালেই যখন সূর্য্যোদয়ের আলোকে আপ্লুত হইয়া উঠে পূর্ব্বগগন,- তখনই শয্যাত্যাগের সময় হয় এবং ঐশীবিধান ফলোন্মুখ হইলেই, লেখকের লেখনী-ক্রন্দন আরম্ভ হয়।

শ্রীমদ্ভাগবত দশমস্কন্দ চতুর্দ্দশ অধ্যায়ের একবিংশতি শ্লোকে বলা হইয়াছে,- ত্রিলোকে কোন্ ব্যক্তির মধ্যে, কখন, কেন, কি প্রকারে যোগমায়া কর্ত্তৃক ভগবৎ লীলা বৈভব বিস্তার হইয়া, ভাগবতীয় কথাপ্রসঙ্গ প্রচারিত হইবে, তাহা কেহই পূর্ব্বে জানিতে পারেনা। প্রাসঙ্গিক উল্লেখযোগ্য যে, বিগত ১৩ই শ্রাবণ ১৩৯৪ বঙ্গাব্দ, ইংরাজীমতে ২১শে জুলাই ১৯৮৮ সন, শ্রীগুরুপূর্ণিমা দিবসের অতি প্রত্যুষে শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র বাবুর সুমধুর কণ্ঠের; ভজ গোবিন্দ, কহ গোবিন্দ, লহ গোবিন্দের নামরে; যেজনা গৌরাঙ্গভজে সে হয়, আমার প্রাণরে; কীর্ত্তনধ্বনিতে নিদ্রাভঙ্গ হইল। শশব্যস্তে শয্যাত্যাগ করিয়া দরজা উন্মুক্ত করিলাম। এই শুভদিনেই পুস্তকটি সম্পর্কে 'লেখা' আরম্ভ করিতে নির্ব্বন্ধ রাখিলেন তিনি।

তাঁহার আন্তরিক অনুজ্ঞা ঐশীপ্রেরণা জ্ঞান করিয়া ঐদিন প্রভাতকালে লিখা কার্য্য আরম্ভ করি এবং অনলস অধ্যবসায়ে ক্রমাগত লিখিতে লিখিতে রচনা সমাপ্ত হয়. ৭ই কার্ত্তিক ১৩৯৪ বঙ্গাব্দের কোজাগর কৌমুদী পূর্ণিমার শ্রীশ্রী লক্ষ্মীপূজা আরম্ভের প্রায়ঃ সন্ধ্যাকালে, অর্থাৎ ২৪ শে অক্টোবর ১৯৮৮ ইংরাজী সনের দিবা বসানে। অতঃপর পরবর্ত্তী ৬ই নভেম্বর তারিখ তীর্থক্ষেত্র পরিক্রমার উদ্দেশ্যে বাহির হইয়া পড়ি এবং ছয়মাসকাল নানাতীর্থ পর্য্যটন করিয়া, তরামে অপরাহ্নে স্ব-গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার কয়েকদিন পরে অতিদ্রুত লিখিত খসড়া, অক্ষর বিন্যাসকদিগের অসুবিধার কারণ হইবে অনুমান করিয়া, পাণ্ডুলিপি পুনর্লিখনে মনোনিবেশ করি এবং আমার লেখার উৎসাহ ও প্রেরণাদাতা, শ্রীযুক্ত মজুমদার মহাশয়ের উদ্যোগে ও দৈনিক জনপদ পত্রিকা প্রেসের স্বত্বাধিকারী শ্রীযুত কমল কুমার সিংহ মহাশয়ের ঔদার্য্যে লেখাগুলি উক্ত পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইয়া, যুগপৎ পুস্তক আকারে মুদ্রণের সূচনা হয়, ১৩৯৬ বঙ্গাব্দের ২৮শে ভাদ্র বৃহস্পতিবার(১৪ | ৯ | ৮৯ইং শারদীয় পূর্ণিমার পূর্ব্বাহ্ন হইতে এবং ছাপাখানার বহুব্যস্ততাজনিত অনিবার্য্য কারণে পুস্তকের মূলঅংশ মুদ্রণ সমাপ্ত হয়,—১৩৯৮ সনের পয়লা জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার (১৬ | ৫ ৯১ ইং) অক্ষয় তৃতীয়া পুণ্যতিথির শ্রীশ্রীকৃষ্ণের চন্দনযাত্রা দিবসে। এই দীর্ঘ সময়

ব্যাপী অ-বরত আশ্বাস ও উৎসাহ প্রদান করিয়া, পুস্তকখানা প্রকাশ করিবার হাদ মতা জন্ত, তাঁহাদের উভয়ের প্রতি আমার অকুণ্ঠিত কৃতজ্ঞতাবোধ দীপ্তমান থাকিবে।

এই অতি আধুনিক আলোকোজ্জ্বল যুগের জড়বিজ্ঞান প্রভাবিত সমাজব্যবস্থার আলোক, যেন মরীচিকার আলেয়ার ন্যায়, কেবল দেখিতেই মনোহর, ধরা যায়না; বিস্ফারিত নেত্রে অনবরত পশ্চাদ্ধাবন করিয়াও, নিরাশ হইতে হয়। তাই সমাজ জীবনে বিজ্ঞানের অভাবিত অবদান, প্রত্যহ অঞ্জলী ভরিয়া গ্রহণ করিলেও, তাহা অন্তরের অতৃপ্তি ও সংসারের অশান্তি ঘুচাইতে পারেনা। তদুপরি পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে ও বস্তুতান্ত্রিক যান্ত্রিক সভ্যতার প্রাবল্যে প্রাত্যহিক জীবনযাত্রা বড়ই জটিল; নানা সমস্যার আলোড়নে মন সতত বিক্ষুব্ধ; অসন্তোষের বিবিধ প্রকাশ জন জীবনে অবিরত তরঙ্গিত। পরিবার প্রতিপালনের দায়িত্ববোধে, দিনের পর দিন এমন বিবিধ দায়ভার গ্রহণ করিতে হয়,— যাহার মধ্যে প্রীতি নাই, সহানুভূতি নাই, তৃপ্তিও নাই; যেন আবর্তিত পৃথিবীর ক্লান্ত বুকের উপর গহন ক্ষতি ভরা দিন যাপনের, প্রাণধারণের গ্লানি বহন করিয়া চলা মাত্র। নিজের প্রতি, সমাজের প্রতি, মানুষের প্রতি,— আলস্য বিজড়িত এই হতাশার পরিমণ্ডলে "আপনাকে জান" (আত্মনং বিদ্ধি) ঋষিগণের উচ্চ আদর্শনির্ভর আত্মোপলব্ধির বাণী, উদার দাক্ষিণ্যে যুগোপযোগী করিয়া প্রবর্তনের অনুপ্রেরণা তেই এই পুস্তক প্রকাশের প্রয়াস।

পুস্তক রচনাকালে প্রবন্ধাদি ও সুধীগণের রচিত গ্রন্থ হইতে প্রামাণ্যবোধে মুক্ত মনে সূত্র সংগ্রহের যে অকল্পনীয় যোগ না আসিয়া গিয়ে,-সূক্ষ্ম অনুভূতির আবেশে আবেশে শান্তমনে অনুধাবন করিয়া, তাহাতে লীলাময়ের স্মিত জ্যোৎস্নার মত অস্পষ্ট ছায়াময় লীলা বৈচিত্র্যই সংশয়লেশহীন দৃঢ় প্রত্যয়ের বিস্মৃত শুভ্রনেত্রে লক্ষ্য করিয়া, তাঁহার অযাচিত করুণা উপলব্ধি করিয়াছি। জগতের সকল ঘটনাই আমাদের ইন্দ্রিয়জ্ঞান ও বুদ্ধির যুক্তিদ্বারা আয়ত্ত নয় এবং জীবনদেবতা কি প্রকার কার্য্য কারণ সংঘটন করিয়া, কোন অচিন্ত্যপূর্ব ঘটনার মধ্যে জীবনকে সংসার রঙ্গমঞ্চের কোন অঙ্কে কি প্রকার ভূমিকায় কিভাবে উপস্থিত করাইবেন, তাহা মানবের বিচারবুদ্ধির অগম্য বা অবোধ্য। যেহেতু মনেপ্রাণে উপলব্ধি করি; অহরহ অন্তরের অলক্ষ্যে রহিয়া জীবন দেবতাই এই পুস্তক রচনা কার্য্য পরিচালনা করিয়াছেন,-তাই আমার সতত সমর্পিত সর্বান্তঃকরণের ভক্তি পুষ্পাঞ্জলী, সেই জীবন কর্ণধারের প্রতি চির সমুজ্জ্বল থাকিয়া

অন্তকালেও তাহার আশ্রয়লাভের ভাবনা, অন্তরে অগ্রে উদিত হইবে।

"দুঃখেরহতে ক্ষতিহতে যে অমৃত করেছি সঞ্চয়, নিত্য পলে পলে।
মৃত্তিকার ধরণীতে কণ্ঠ ভরি গাহি তারি জয় নানা ছন্দবন্ধে।"

সংসার জীবনে দুঃখশোকের আঘাত অতিক্রম করা যায় না এবং যখন অনিবার্য্য কোন ইষ্ট বিয়োগ জনিত মর্মান্তিক মনস্তাপ ঘটিয়া যায়,- তখন মনে হয়' এই বেদনার ভার হয়ত জীবনব্যাপী বহন করিয়া চলিতে হইবে। কিন্তু মহাকালের অমোঘ বিধানে, গুরুতর মনের বেদনাও ক্রমে বিস্মৃতির অতলে তলাইয়া যায়। জীবনে আবার জাগিয়া উঠে কর্মে প্রেরণা,- যেহেতু প্রতিকূল অবস্থাকে পরাভূত করিয়া, আপন শক্তি বিকাশের প্রচেষ্টাই মানবজীবনের বৈশিষ্ট্য। তবে জীবনের চাওয়া আর পাওয়া, সাফল্য ও অসাফল্যের হিসাব সকলের পক্ষেই এক নিরিখে বাঁধা নয়। যতক্ষণ জীবিকা নির্ব্বাহের প্রয়োজনে অর্থ সংগ্রহ জন্য, যেমন অক্লান্ত প্রয়াস করিতে হয়,- তেমনি অপর্য্যাপ্ত অর্থের অধিকারী ও সুরম্য হর্ম্মে প্রভূত আরামে বাস কারীকেও সামান্য স্বস্তির প্রত্যাশায় কিংবা দৈহিক বৈগুণ্য বশতঃ সচারাচর বিনিদ্র রজনী যাপন করিতে দেখা যায়।

আমরা স্বার্থ সিদ্ধির আশায় যাহা চাই। তাহা বিশ্বরহস্য সম্পর্কে অজ্ঞানতা বশতঃই চাই। কারণ বিশ্বপতি যাহা বিধান করেন, তাহা জীবের আত্মবিকাশের জন্যই করিয়া থাকেন। সুতরাং জগৎসংসার পরিব্যাপ্ত করিয়া, জগদীশ্বরের যেই মঙ্গল অভিপ্রায় অন্তর্নিহিত রহিয়াছে, তাহা উপলব্ধি করিলে,-অর্থাৎ আমি কে ও কেন, তাহা হৃদয়ঙ্গম হইলে, জীবনকে উদ্দেশ্যবিহীন ও প্রকৃতি জাত দুঃখময় বোধ হয় না এবং সংসারের ঘাত প্রতিঘাতময় জীবনসংগ্রামে প্রাণপণ প্রয়াস করিয়া যখন বুঝিতে পারা যায়, এই নশ্বর জীবনে পরিপূর্ণ প্রত্যাশায় আশ্রয় করিবার কিছুই নাই তখনই অন্তরস্থিত অন্তর্য্যামীর প্রতি, যে তত্ত্বস্তুর আশ্লেষ অনুভব হয়, তাহাই, 'আমি' সেই আত্মতত্ত্ব এই পুস্তকে যথাসম্ভব আলোচিত। উপরন্তু প্রকৃতি জগতে যেমন মধু গন্ধ কুসুমের আকর্ষণে মধুলুব্ধ মধুকরের আগমন ঘটে,-তেমনি ভাগবতী কল্যাণ কথার প্রতি বিশেষ কোন পাঠকের আগ্রহ দেখা যায়। প্রস্ফুটিত ফুল যেমন প্রকাশ পায় ফলে, যাহাদ্বারা বৃক্ষের পরিচয়,-তেমনি গুণানুরাগী দ্বারাই গ্রন্থ রচয়িতার পরিচিতি। অপিচ সৎ গ্রন্থ প্রকাশ দ্বারাই বহুজনের নিকট তত্ত্বকথা সহজে প্রচার সম্ভব এবং শ্রীগীতার মতে (১৮।৭০) ইহা জ্ঞানযজ্ঞের দ্বারা উপাসনা।

বিচিত্ররূপে বন্ধুর ও ঈর্ষাবিদ্বেষে কন্টকাকীর্ণ সংসার যাত্রাপথ কাল্পথে অতিবাহনের পর, আয়ুসূর্য্য মধ্যগগন অতিক্রম করিয়া,এক্ষণে অস্তাচলের পথে ধাবমান

মান হইলেও, স্বেচ্ছাকৃত নানা দাবিদ্র্যবোধের অনুরাগে জীবন এখনও বিজড়িত। তবে জীবনে বহুবার নিবিড়ভাবে অনুভব করিয়াছি, উদ্দেশ্য যদি মহৎ হয় এবং ঈশ্বরের প্রতি দৃঢ় নির্ভরতা অবিচল থাকে,- সেইক্ষেত্রে সর্ব্বতোব্যাপ্ত জগদীশ্বরের অযাচিত সহায়তার প্রসারিত মঙ্গলকর, কোন এক অচিন্তিতপূর্ব্ব উপায়ে বিস্তারিত হয়, যাহা কোনরূপ কার্য্যকারণ সূত্রে কাহারও মাধ্যমে ক্রিয়াশীল হইয়া থাকে। এই পুস্তক রচনা ও প্রকাশে, শ্রদ্ধেয় যতীনবাবুর প্রয়োচনা ও মুদ্রণের ব্যবস্থাপনা, ভগবৎ ইচ্ছারই প্রতিফলন বলিয়া আমার সুদৃঢ় প্রত্যয়।

"তোমায় কিছু দিব বলে চায় যে আমার মন, নাইবা তোমার থাকল প্রয়োজন"

বৃক্ষ ছায়া দেয়, ফুল দেয়,- সৌরভ দেয়, মধু দেয়। মালঞ্চের মালাকর বিবিধ বর্ণের পুষ্প চয়ন করিয়া, যত্নের সহিত বিচিত্র মালা তৈয়ার করে। পূজারী সেই মালিকায় উপাস্য বিগ্রহ সজ্জিত করিয়া থাকে। কোন রসিকজন আপন তৃপ্তি-বোধে তাহা প্রিয়জনের গলায়ও পরাইয়া দেয়। আপন মনের মাধুরী মিশাইয়া গ্রন্থকার গ্রন্থ রচনা করিলেও যেমন লক্ষ্য থাকে অজ্ঞাত পাঠকের প্রতি,- তেমনি জগতে চেতন অচেতন সমস্তই নিজ নিজস্বভাববশে ও যোগ্যতা অনুসারে বিভিন্ন জীবের হিতসাধনের জন্য আপন সামর্থ্য ও বুদ্ধিবৃত্তির প্রকাশ বিতরণ করিয়া চলিতেছে। পক্ষান্তরে ভুবনেশ্বরের সৃষ্ট ভুবনভরা এত যে আয়োজন, তাহা তাঁহার নিজ প্রয়োজনে নহে, পরন্তু জীবে অর্পিত প্রেম তাঁহার প্রতি প্রতিঅর্পণের অভি-প্রায়ে। তাই চিন্তাশীল মানবের মধ্যে, সর্ব্বব্যাপীকে প্রকাশের বিভিন্ন প্রকার ব্যাকুলতা এবং স্থূল দৃষ্টির অগোচর, সেই পরমতম চৈতন্য পুরুষকে পরমাত্মা রূপে অনুভবে ধরিয়া রাখাই জীব জীবনে যথার্থ সাধনা।

তাৎপর্য্য এই,- নষ্টানারী বা কুলটা, যেমন অবৈধ প্রণয়ী বা উপপতির প্রতি আকৃষ্ট হয়, তেমনি ভ্রান্ত বা বিপথগামী অহং জাগতিক বস্তু বা নশ্বর দেহের প্রতি আসক্ত হইয়া থাকে। এই দেহপ্রীতি বর্জ্জন করিয়া পরমপতি বোধক পরমাত্মার প্রতি, চিত্তকে নিত্য নিযুক্ত রাখাই "ধ্যানযোগ" এবং ইহার অনুশীলনে, পূর্ণমাত্রায় চৈতন্য ও তীব্রবৈরাগ্যের উদয়ে, বোধিসত্ত্ব অবস্থায় উপনীত অন্তরের ভক্তিপ্রীতি জীবনবল্লভের প্রতি ধাবিত হইয়া, পূর্ণের পদপরশে সংসারক্ষেত্রও স্নেহপ্রীতি; সম্ভাবসৌহার্দ্দে মধুময় হইতে থাকে। অন্তরের বোধকে এই বোধাতীত বোধি পরমপ্রেমিকের প্রতি উদ্বোধিত করিতে, আন্তরিক প্রয়াসী কাহারও কিছু সহায়তা হউক, এই প্রত্যাশায় আগ্রহাতিশয্যে বার্দ্ধক্যের প্রদোষ ছায়ায় আকাঙ্ক্ষিত ভাগবতীয় কথাপ্রসঙ্গ, লীলাময় জীবনদেবতার অযাচিত দানে বিরচন পূর্ব্বক, তাঁহার

শ্রীত্যর্থে সমর্পণ করিয়া রাখিলাম,- "যার ভাল লাগে, সেই নিয়ে যাক,- যশ অপযশ কুড়ায়ে বেড়াক ধূলার মাঝে"।

" তোর ভিতরে জাগিয়া কে যে, তাঁরে বাঁধনে রাখিলি বাঁধিয়া;
হায় আলোর পিয়াসী সে যে, তাই গুমরি উঠিছে কাঁদিয়া। ..

সৃষ্টির মূলে ঐশী অভিলাষ নিহিত রহিয়াছে বলিয়া, ঈশ্বর একটি গভীরতম ইচ্ছা এবং তাঁহার কোন প্রয়োজন বা অভাববোধ না থাকিলেও, মানবের চিত্তলোক আশ্রয় করিয়াই সৃষ্টিকর্ত্তার লীলাবিলাস। তাই চিহ্নিত জীবের মধ্যে ঐশী অন্তপ্রেরণা সঞ্চারিত করিয়া, তাহার অভিব্যক্তিতে তিনি সন্তোষ লাভ করেন। সুতরাং সেই পরমইচ্ছার বশবর্ত্তী হইয়াই ব্যক্তিবিশেষে বিভিন্ন প্রকাশের বাসনা জাগে। কিন্তু জড়বিজ্ঞানের প্রত্যক্ষবাদ ঐহিক সমৃদ্ধি দান করিলেও, চিত্তসম্পদের অধিকারী করে না। পারমার্থিককথার আলোক নিচ্ছুরণই যুগ হইতে যুগান্তরে ব্যাপ্ত হইয়া বহির্মুখী দৃষ্টির আবরণ উন্মোচন করে। এবং ভাগবতীয় কথা শুনিলেই মঙ্গল হয়। তাই অল্পবিস্তর সকলেই হেলায় বা শ্রদ্ধায় তত্ত্বকথা শুনিতে উৎসুক। পরন্তু তত্ত্বোপলব্ধি অবধারণ জন্য ' তপস্যা' প্রয়োজন।

প্রাচীন শাস্ত্রাদিতে তপস্যার বিবিধ সংজ্ঞা দৃষ্ট হয়, যাহা যুগে যুগে স্থানকাল পাত্রভেদে নানাভাবে ব্যাখ্যাত। মহাভারত শান্তিপর্ব্বে (১৫৭ | ৮) তপস্যার মধ্যে 'অনশন' শ্রেষ্ঠ বলা হইয়াছে,-, যদিও ইহার প্রচলিত অর্থ উপবাস' যাহা চিত্তশুদ্ধি বা আত্মসংযম প্রয়োজনে, আদর্শের অভিমুখে অভুক্ত অবস্থায় আত্মচিন্তা পরায়ণ হইয়া দীর্ঘ সময় ব্যাপী উপবেশন। অপরন্তু শ্রীগীতায় ইহা কামনা সমূহের নিবৃত্তি নির্দ্ধারিত। আচার্য্য শঙ্করের মতে তাই ' মন ও ইন্দ্রিয়গণের একাগ্রতাই, তপস্যা। তৈত্তিরীয় উপনিষদে (৩ | ১) ব্রহ্মকে শরীরাদি হইতে পৃথক উপলব্ধি জন্য তপস্যা মুক্তির বিধান, যাহা সতত ব্রহ্মপরায়ণ হইয়া থাকা। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু ভগবৎ নাম জপ বা অবিরত শ্রীহরি স্মরণকেই শ্রেষ্ঠ তপস্যা বলিয়াছেন। সুতরাং ঐকান্তিক ভাবে ধ্যানাবেশিত চিত্তে অভিলষিত লক্ষ্যের প্রতি জীবনকে সর্বতোভাবে স্থিত রাখাই তপস্যা,-যাহা আত্মজ্ঞান উপলব্ধি বা আত্মশুদ্ধি।

এই অবস্থার নিয়ত স্থিতিতেই জীবনে ঘটে, সর্বপ্রকার বন্ধন মুক্তি এবং তপস্বী স্বীয় সাধনবলে অভীষ্টলাভে সক্ষম হইয়া থাকেন। সুতরাং তপস্যা পরায়ণ তাঁহাকেই বলা হয়, যিনি আপন সাধনোচিত আদর্শে অবিচল থাকিয়া, অন্তরের শুচিতা ও সন্তোষ দ্বারা জীবনের প্রতি পদক্ষেপকে সেই লক্ষ্যের অনুসারী করিয়া তুলিতে সমর্থ এবং চিন্তা, বাক্য ও কর্মের মধ্যদিয়াই তাঁহার সত্যাদর্শের পরিচয়,-যাহা কোন মতবাদ

নয়, পরন্তু ঈশ্বরানুরাগ, সত্যনিষ্ঠা, ভগবৎ প্রেম ও নিঃস্বার্থপরতা। যেহেতু তপস্যা ব্যক্তি কেন্দ্রিক, তাই তপস্যাকারী 'আমি, কাহাকে বলা হয় এবং তাহার স্বরূপ কি,- তাহাই পুস্তকের প্রথম প্রবন্ধে আলোচিত।

হিন্দু ধর্মের সুপ্রাচীন গ্রন্থ বেদের ঋষি, তাই উদাত্তকণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন,— দিব্যভূমি ভারতে বাসকারী অমৃতের সন্তানগণ শ্রবণ কর,—আমি জ্যোতির্ময় দিব্য পুরুষকে জানিয়াছি. তোমরাও তাঁহারই মৃত্যুহীন সন্তান। তাই তাঁর প্রতি অবিচ্ছেদ্য বিশ্বাস ও প্রেমের সম্পর্ক রচনাই, তাঁহার সহিত মিলিত হইবার ও মৃত্যুময় সংসার হইতে মুক্তিলাভের একমাত্র উপায়; আর অন্যপথ নাই।

তাই আত্মস্বরূপ পরিজ্ঞাত না হইয়া, গতানুগতিক পন্থায় গড্ডালিকা প্রবাহের ন্যায় মামুলী ধর্মচর্য্যা, যেমন কপোলকল্পিত ধর্মকর্মের জাল রচনা করিতেছে,- অনুরূপ ভাবে বেদবাণীর সম্প্রদায়গত কুটার্থবোধক অর্থান্তর, বিশ্বের বিভিন্ন প্রাঙ্গণে ধর্মধ্বজী বিচিত্র মতভেদ রচনা করিয়া যেন গোষ্ঠীতন্ত্রের আনুগত্যের প্রতিই প্ররোচনা প্রদানে তৎপর হইতেছে।

প্রকৃত বিচারে কিছু পাইবার জন্য বা জাগতিক সুখ সমৃদ্ধি লাভের প্রত্যাশায়,- সেব'পূজা বা আরাধনা উপাসনারূপ ধর্মাচরণ, আত্মজ্ঞানীর লক্ষ্য নহে এবং ভগবৎ বিমুখ মানসিকতাকে ভগবদভিমুখীন রাখিয়া' জীবনকে মহত্ত্বে ও মাধুর্য্যে সার্থক করিয়া তুলিবার জন্যই সাধন পদ্ধতি প্রচলিত। উল্লেখ যোগ্য যে, উপনিষদ মতে 'মহতো মহীয়ান' ব্রহ্মণ্য দেবের সহিত হৃদয়ের সম্পর্ক সংস্থাপিত করা বা সেই মহা জীবনের সহিত ব্যক্তিগত জীবনকে যুক্ত রাখাই ধর্মীয় কর্মের লক্ষ্য। এবং সংসারা সক্ত বহির্মুখী চিত্তকে দিব্যচেতনার উপলব্ধি প্রদানই বেদোক্ত স্তোত্রাদির বিশেষত্ব।

"মরম না জানে, ধরম বাখানে এমতি আছয়ে যারা,
কাজ নাই সখি তাদের কথায় বাহিরে রহুন তারা।"

অতিমাত্রায় বিজ্ঞান প্রভাবিত, এই আধুনিক যুগে, মানসিক বিবর্ত্তনের এমন জটিল এবং অভূতপূর্ব্ব পারিপার্শ্বিক সমস্যার আবর্ত্তে আমাদের অবস্থিতি,- যখন আত্মকেন্দ্রীকতার অবিরাম তাড়নায়,- আমরা আত্ম চিন্তার নিশ্চিন্ত অবকাশ পাই না। ভুলিয়া যাই, জগতে জন্মলাভ যেমন আমার ইচ্ছানুযায়ী নয়,- তেমনি জীবনের ঘটনাবলীও নিজের ইচ্ছামত নিয়ন্ত্রণ করিবার ক্ষমতা কাহারও নাই। তাই ধর্মশাস্ত্রাদি যে মত ও পথের সন্ধান দেয়, তাহা নির্ভয়ে নির্ভর করিয়া চলাই যুক্তি সঙ্গত। পরন্তু দুগ্ধপোষ্য শিশু ও বয়স্ক বালকের আহার্য্য যেমন আলাদা, সেইরূপ শাস্ত্রীয় অনুশাসন,- প্রত্যেকের পক্ষে একইভাবে অবলম্বন সমুচিত হইতে পারে না।

উল্লেখ্য, যাহারা সমগ্র ভারতভূমিকে পিতৃভূমি এবং পুণ্যভূমিরূপে গ্রহণ করিত, বৈদিকযুগে তাহারাই 'হিন্দু' গণ্য হইত,— আ সিন্ধু সিন্ধু পর্য্যান্তা যস্য ভারতভূমি কা, পিতৃভুঃ পুণ্যভুমিশ্চ স বৈ হিন্দুরিতি স্মৃতি এবং বেদ, উপনিষদ শ্রীমদ্ভগবত গীতা;। বৈদিক সংস্কৃতি তথা হিন্দু ধর্মের প্রমাণ্য গ্রন্থ, যাহা অপৌরুষেয় বলিয়া গণ্য। বেদ মতে সকল প্রাণীকেই মিত্রের দৃষ্টিতে দেখিবার নির্দ্দেশ, মিত্রস্য চক্ষুসা সর্ব্বাণিভূতানি সমীক্ষন্তাম। উপনিষদ বলেন, জীবমাত্রই ব্রহ্মচৈতন্যের অংশ এবং জাতিবর্ণ স্ত্রীপুরুষ নির্বিশেষে সকলেই ঐহিক ও পারত্রিক কল্যাণের জন্য ব্রহ্মবিদ্যালাভের অধিকারী। শ্রীগীতায় ধর্মীয় আচার পালনে, পণ্ডিতমূর্খ, ব্রাহ্মণচণ্ডাল সকলের প্রতি সমদর্শী (৫ | ১৮) হইবার উপদেশ। শ্রীমন্মহাপ্রভুর উক্তি এই, হরিভক্তি পরায়ণ নীচজাতিও ব্রাহ্মন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ,— চণ্ডালোহপি দ্বিজ শ্রেষ্ঠঃ হরিভকতি পরায়ণঃ। হরিভকতি বিহিনস্তু দ্বিজোহপি শপচাধমঃ। সুতরাং প্রকৃতবিচারে ধর্ম একটি সর্ব্বজনীন আচরণ বিধি, যাহা নিষ্ঠার সহিত অনুসৃত হইলে, ইন্দ্রিয় বা যুকতি তর্কদ্বারা অর্জ্জিতজ্ঞানের বহির্ভূত, অনির্ব্বচনীয় আনন্দ ও পরমাশ্রয়ের উপলব্ধি হয়। এবং ইহাই আর্য্যঋষিগণ প্রবর্ত্তিত হিন্দু ধর্মের বা বৈদিক সাধন প্রণালীর বৈশিষ্ট্য বা অসাধারণতা; যাহা বিশ্ববাসীর কৌতুহলী মুগ্ধ বিস্ময়। মহাজনগণ প্রদর্শীত সাধন সঙ্কেত এবং বেদ উপনিষদ নির্ভর গীতোকত, জীবের ধর্ম প্রসঙ্গের বিভিন্ন প্রাসঙ্গিক সূত্র, দ্বিতীয় প্রবন্ধে পরিবেশিত।

"তাঁহারে সম্মুখে রাখি, জীবন কন্টক পথে যেতে হবে নীরবে একাকী"

বিচিত্র এই সংসারপথ, যেন কন্টকাকীর্ণ অরণ্য ..সতত সতর্ক পদক্ষেপে চলার পথ চিনিয়া নিতে হয়। বাণিজ্যিক সভ্যতা ও তজ্জাত নাগরিক জীবন, আমাদের সময়কে এত সংক্ষিপ্ত ও ক্ষিপ্র করিয়া তুলিয়াছে যে,— আমরা অতিমাত্রায় আত্মকেন্দ্রিক হইয়া পড়িয়াছি। ফলতঃ সহস্র স্রোতধারায় প্রসারিত বাসনাকামনা, যাতনাবেদনা, অনুতাপ অনুশোচনায় জড়িত জীবনে, কেবল দিনযাপনের প্রাণধারণের গ্লানি বহন করিয়া চলিতেছি। আপনাকে জানিবার অবকাশ হয়না। কাল প্রবাহে আত্মীয় গণও পর হইয়া যায়। ঘটনা বৈচিত্র্যে উপকৃত প্রিয়জনও পরিচিত অবজ্ঞায় পরিহাস করিতে কুণ্ঠিত হয় না। স্বার্থান্বেষী সহকর্মীগণ সময়ে ঈর্ষার বিদ্বেষে অনুচিত আচরণ করিতে প্রয়াস পায়। স্বার্থের সংঘাতে সহোদরও শত্রুর ন্যায় বৈরীতা করিতে পশ্চাৎপদ হয়না। সহধর্মিনীকেও অযথা রূঢ় ব্যবহার করিতে দেখা যায়; কথায় কথায় মনোমালিন্য, পদে পদে মতভেদ। সদ্ভাব বজায় রাখিতে সতত সন্ত্রস্ত। সংসার হৃদয়কে জীবন সংগ্রামে ক্ষত, কেবল অভিজ্ঞতায় ভূষিত।

রূঢ় বাস্তবের এই দ্বিবিধ লাঞ্ছনা গঞ্জনা, অপমান অত্যাচার, উপদ্রব উৎপাতের বেদনাময়ী স্মৃতি,-অন্তঃসলিলা ফল্গুর মত অন্তরের এক নিভৃত অজ্ঞাত কোণে সঙ্গোপনে বহন করিয়া, দ্বন্দ্বসঙ্কুল সদাসন্ত্রস্ত সংসার পথে চলিতে চলিতে, অবশেষে জীবদ্দশার অনিবার্য্য অন্তকাল আসন্ন হয়,-যেমন কবিয়া দিবাবসানে সন্ধ্যা গড়াইয়া রাত্রি আসে। আমৃত্যু অন্তহীন বেদনা তিমির স্মৃতিরেখা বিস্মৃতির অতলে তলাইয়া কালের যবনিকা অন্তরালে হারাইয়া গেলেও,-জীবাত্মা সঙ্গে নিয়া যায় সকলকিছু সঞ্চিত জ্ঞান ও পার্থিব জগতের অভিজ্ঞতা, ইষ্টানিষ্ট সংস্কার। জীবনের এই নশ্বরতা ও পুনরপি জন্মমৃত্যু সম্পর্কে সকলেই সচেতন হইলেও, নশ্বর বস্তু দিয়া যিনি জীবকে সংসার মায়ায় ভুলাইয়া রাখিয়াছেন এবং যাঁহাকে জানিলে, সংসারে জ্ঞাতব্য আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না (গী-৭ | ২; মুণ্ডক ১ | ১ | ৩১, ছান্দোগ্য) ৬ | ১ | ৩),-সেই অবিনশ্বরকে তত্ত্বতঃ জানিয়া, জীবনমুক্ত অবস্থা লাভের প্রযত্ন কদাচিৎ পরিলক্ষিত (গী-৭ | ৩), যদিও এই তত্ত্বজ্ঞানই প্রধান জিজ্ঞাসা (ভাগবত ২ | ২ | ৩৬)।

প্রাকৃতিক অলঙ্ঘ্য নিয়ম অনুসারে নিয়ন্ত্রিত আঁকা বাঁকা নদীপথের ন্যায়, বক্রভাবে ধাবিত মানবের ভাগ্যপথও নির্দ্ধারিত হয়,-ঐশ্বরিক অলঙ্ঘ্য নিয়ম অনুযায়ী। অপিচ, সর্ব্বাঙ্গ শৈবালে আকীর্ণ শীর্ণদেহ নিজস্ব খাতে প্রবাহিত শাখানদী, বর্ষার প্রবল জলের উদ্দাম স্রোতের আবেগে তট প্রান্ত ছিড়িয়া ছিড়িয়া জলবাহিত পলিকে দুই প্রান্তের প্রান্তরে অবক্ষেপণ করিয়া, বহুদিনের সূক্ষ্ম প্রবাহিনী পথরেখা হঠাৎ অতিক্রম পূর্ব্বক নিজের প্রবহমানতার অবিশ্রান্ত তরঙ্গ হিল্লোলে প্রশস্ত ও স্ফীত হইয়া যেমন ক্রমশঃ নাব্য হয়,-সেইরূপ জীবনপ্রভাত সময়ের আপনমনে চলা, উৎফুল্ল নবফাল্গুনের পর, সংসার জীবনে জলভরা ব্যবহার মত দুর্য্যোগের দুর্দ্দিনে, অবিরাম ঘাত প্রতিঘাতে জর্জ্জরিত ও নিরুপায় হইয়া, আসক্তির কণ্টকাকীর্ণ চিত্তনদী, চির অভ্যস্ত সঙ্কীর্ণ সংসারপথ পরিত্যাগ করিয়া, ক্রমশঃ ভক্তিপূত ভগবদাশ্রয়রূপ কল্যাণময় গহন গভীর নবীন পথ অবলম্বনে, অপ্রাকৃত সুখময় অবস্থার অপরিমিত দীপ্তি রেখায় উদ্ভাসিত প্রশান্ত চিত্তে, সংসারের যাবতীয় ভার বহনের উপযোগী হয়।

যেমন নৌকাচালক নির্ভর যাত্রী, নিশ্চিন্তমনে নদী পার হয়,-তেমনি ঐশী অভিপ্রায়নির্ভর ভক্তিমান সংসারপথ যাত্রী, অনায়াসে জীবননদী অতিক্রম করিয়া যায়। পরম অনুরাগে ঈশ্বরকে আশ্রয় করাই 'ভক্তি'। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু প্রদর্শিত মতবাদ অনুসরণে এই ভক্তিরসের যৎকিঞ্চিৎ পরিশেষে তৃতীয় প্রবন্ধে সংযোজিত।

" এনেছি তুলিয়া পথের প্রান্তে, মর্ম্ম কুসুম মম,
আসিছে পান্থ, যেতেছে লইয়া স্মরণ চিহ্ন সম।"

শুভ্র মণিমধ্যে ছিদ্র সৃষ্টি করিতে না পারিলেও, যেমন মণিকার কর্তৃক আহ-

ঘ্বিত ও প্রস্তুত বন্ধে নিপুণ জহুরী দ্বারা প্রবিষ্ট হইয়া, মণিমালায় রূপান্তরিত হয়,- তেমনি পূর্বসূরীগণের অক্ষয় কীর্ত্তি শাস্ত্রীয়ভাণ্ডাররূপ শলাকায় বিদীর্ণ, সুপ্রবলা আকর গ্রন্থাদির মণিমুক্তা সদৃশ জ্ঞানাঞ্জন তথ্যাদি অক্লান্ত অধ্যবসায়ে আহরণ করিয়া, আন্তরিক অনুরাগ ও নিঃসংশয় বিশ্বাসের চিন্তাসূত্রে, এই গ্রন্থ মালিকা গ্রথিত হইল। অভিনব তত্ত্বকথা মনোজ্ঞরূপে বিশ্লেষণ করিতে, অর্থালঙ্কার মিশ্রণ অনিবার্য্য হইয়া পড়ে। তাই রূপকের দ্বারা দুরূহ বিষয় অংশ সরল করিবার চেষ্টা হইয়াছে।

সমুদ্র তীরবাসী হইলেও, তৃষ্ণা নিবারণের জন্য যেমন গৃহের ক্ষুদ্র পাত্রটির দিকেই দৃষ্টিক্ষেপ করিতে হয়,- তেমনি পারাবার সদৃশ মূল শাস্ত্র গ্রন্থাদি গৃহে সজ্জিত থাকিলেও অন্তরের তৃষা অপনোদন প্রয়োজনে তাহার যুগোপযোগী সরল বিশ্লেষণের প্রতিই দৃষ্টিক্ষেপ হয়। পরন্তু সাহিত্যচর্চ্চা বিষয়ে উৎসাহদান ক্ষেত্র বিশেষে জল সেচনের মতই কার্য্যকরী হইয়া থাকে। পুস্তকে সন্নিবেশিত আত্মতত্ত্বের দিগ্‌দর্শন রূপ শাস্ত্রযুক্তি নির্ভর, এই কথকতার অনুধাবনা যদি কাহারও চিত্তের উদ্দীপনা তথা উদ্বোধন ঘটাইয়া, অন্তরকে উত্তরোত্তর উন্মোচিত তথা উদ্ভাসিত করিয়া তোলে,- যেমন ফুলের কুঁড়ি নিশির শিশির আঘাতে, ক্রমে দল বিস্তার করিয়া অন্ধকার রজনীর অবসানে ফুল্লকুসুমরূপে প্রতিভাত হইয়া প্রকাশ পায়,- তবেই অবসর জীবনের এই প্রৌঢ় প্রহর সময়ের অক্লান্ত শ্রম সার্থক জ্ঞানে উৎসাহিত বোধ করিব।

"সেথা গেঁথেছিনু যে মালা, কি জানি কাহারে কেন ভালবাসিয়া,
দিনু তারি লাগি সজল মালাখানি, পথের ধারেতে রাখিয়া।"

নির্মেঘ নির্মল আকাশের এক প্রান্ত হইতে, অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত প্রসারিত পূর্ণমাসীর চাঁদের আলোর মত,- জীবন প্রভাতের সমগ্র দেহমনব্যাপী আনন্দমধুর দিনগুলির স্মৃতি বহুকাল আগেই চিত্তাকাশ হইতে অপসৃত হইয়া গিয়াছে,- স্বচ্ছ সুন্দর জীবনরসে উচ্ছল যৌবনকালের বিক্ষিপ্ত চিত্ততলের আবেগ উত্তেজনা উৎসাহের উদ্দীপনাও বহুলাংশে ম্লান হইয়া আসিয়াছে এবং মধ্যাহ্ন দিনের অনেক জোয়ার ভাঁটা উত্তীর্ণ হইয়া, এক্ষণে জীবনের শুভ্র পরিণতি প্রৌঢত্বে পৌঁছিয়াও, বিগত দিনের অবসন্ন মনের ক্ষণস্থায়ী খেয়ালের অনুপ্রেরণায়, অনুক্ষণ অনুশীলনে সদা স্মরণীয় সকল ভাগবতীয় কথা চিত্তক্ষেত্রে সঞ্চিত রহিয়াছিল,-

সেই আন্তরিক অনুভাবনার অমৃতসিঞ্চিত ফসল, যাঁহার অবারিত করুণাদানে উন্মেষিত ও অভাবিতভাবে তত্ত্বকথার মালারূপে গ্রন্থিত হইতে হইতে, অবশেষে বহু প্রতীক্ষার পর, প্রকাশযোগ্য গ্রন্থমালিকায় রূপান্তরিত হইয়া, বহুকাল পূর্ব্ব হইতে পরিপোষিত, আমার মনের কামনা পূর্ণ হইল,- সংসারের সর্ব্বোত্তম বিস্ময়, সেই করুণাময় ভক্তবাঞ্ছা পরিপূরক, কল্পতরু জগদীশ্বরের উদ্দেশ্যে বারংবার প্রণতি নিবেদন

করিয়া, তাঁহারই আশ্রিত অজানা সংসার পথযাত্রীর, কল্পিত পথপ্রান্তের নিবিড় ছায়ায়, অমিয় রসসিক্ত কথাভরা এই কথামালা সমাদরের সহিত সমর্পিত হইল।

'ভালবেসে যাহা ফুটেছে পরাণে, সবার লাগিবে ভালো,

যে জ্যোতি হবি হু আমার আঁধার, সবারে দিবে সে আলো।"

যাঁহারা পণ্ডিত শাস্ত্রবিশারদ, তত্ত্বজ্ঞ, তাঁহারা হয়ত এই সঙ্কলিত রচনায় নূতন তথ্য পাইবেন না। কিন্তু অনভিজ্ঞ, অথচ শাস্ত্রবাক্যে শ্রদ্ধাশীল, কোন অনুসন্ধিৎসু পাঠকের পক্ষে, প্রবন্ধগুলি অবশ্যই জ্ঞানসঞ্চয়ের সহায়ক হইয়া, মূলগ্রন্থ অনুসন্ধান, তথা তাহার অধ্যয়নে উৎসাহ সঞ্চার করিবে। অপরন্তু, রৌদ্র তাপদগ্ধ বৃক্ষহীন প্রান্তরে অবস্থিত পুষ্করিণীর উপরিভাগের জল, নিদাঘ মধ্যাহ্নে অত্যন্ত উষ্ণ বোধ হইলেও,- তলদেশের জলে যেমন শীতলতা বিদ্যমান,- তেমনি ধর্মশ্রম বর্জ্জিত সমসাময়িক সময়ের সদা উত্তপ্ত অমঙ্গল সূচক,-হতোদ্যম সমাজব্যবস্থায়,- অস্তিত্ব রক্ষার জন্য প্রাণান্তকর রুদ্ধশ্বাস নিষ্ফল প্রতিদ্বন্দ্বিতা জনিত মর্ম্মদাহ জনক হতাশার তাড়নায়, সতত ক্লিষ্ট মুখচ্ছবি, উদভ্রান্ত যুবমানসের কান্তিধ্বস্ত, বাহ্যিক আচরণে অসহিষ্ণুতার দীপ্তি লক্ষিত হইলেও, অন্তরে স্নিগ্ধ সহজ সরল অন্তঃসলিলা মাধুর্য্যরস প্রবহমান।

এই সজীব সত্তাবমায়ি যুবচিত্তকে ব্রহ্মানন্দে, অর্থাৎ সেই ব্রহ্মবিদ্যা লাভ হইলে, আধ্যাত্মিকতা বিকশিত অন্তঃকরণে স্বতঃস্ফূর্ত্ত বিমল আনন্দ সঞ্চারিত হইয়া, ভগবৎ নির্ভরতা সজ্ঞানে অর্জিত হয়,- মানবাত্মাকে জীবনের সর্ব্বোন্নত মহিমার সেই শাশ্বত উপলব্ধির তোরণদ্বারে উন্নীত করিয়া, আর্য্যসংস্কৃতির অস্বস্তিকর আসন্ন সঙ্কট প্রতিহত- তথা অশিক্ষার স্বভাবসিদ্ধ আড়ষ্টতায় অন্ধপ্রায়,- কুসংস্কারের বদ্ধরূপে মুমূর্ষু, হীনমন্যতার দুর্ব্বলতায় সঙ্কুচিত,- শ্রেণীবিশেষের জনগণের মধ্যে, জাগ্রত আত্মার বর্ত্তিতে অগ্নিময় আলোক প্রসবিকশিবার প্রয়াস, পুস্তকে প্রতিপাদ্য বিষয়বস্তু, তাহাদের বুদ্ধি প্রয়োগের ক্ষেত্রে কথঞ্চিৎ আনুকূল্য প্রদান করিবে। প্রণিধানযোগ্য ,- পারিবারিক পরিমণ্ডলের ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও জীবনাচারে আবর্ত্তিত জীব, কর্মবিপাকে কর্মাধীন হইলেও,- ব্রহ্মজ্ঞানলাভের সংসারমোহ রহিত অবস্থায়, তাহার কর্মে আধিপত্য রহিয়াছে,- যাহা পুরুষকার' নামে শাস্ত্র নির্দ্দিষ্ট।

"জগতে যতেক দেখ, মিছা করি সব লেখ, মিছাই করিছ তা গোপন।

মিছা পতি সুতজায়া, পিতামাতা যত:হবি, পরিণামে কে হয় কাহার॥

সুহৃদ শ্রীকৃষ্ণ ভাই, আরত আত্মীয় নাই, যত দেখ সব মায়ায় তাঁর।

কি নারী পুরুষ দেখ, সবারি সে আত্মা এক, মিছা মায়ায় বন্ধে কর ভুল॥"

দিনের পর দিন, মাসের পর বৎসর, কালাতিবাহন করিয়া কালচক্রের আবর্ত্তন ক্রমে, মহাকালের বক্ষধৃত অক্ষমালা, রথরজ্জি বর্ষান্তে সরিয়া সরিয়া ঘুরিয়া আসে,

জীবজীবনের বরমাল্য খানির এক একটি কুসুম, তখন জীর্ণ হইয়া খসিয়া পড়ে,- বিধি নির্দিষ্ট পরমায়ু কমিয়া আসে,- সংসার বন্ধনের বন্ধনকাল, অতর্কিতে ছিন্ন হইবার উৎকণ্ঠিত আশঙ্কায়, মধ্যেমাঝে যে ক্রন্দন গুঞ্জিত হইতে থাকে, জীবমাসক্তির মূল।- বোধের ডালা হইতে; অনেক জঞ্জাল ঝরিয়া যায়,- প'তান সংসার অসার বোধহয়,- আশা আকাঙ্খা স্তিমিত হইয়া পড়ে,- নিশিয়াতের বাঁকা চাঁদ আর অন্তর আকাশে আনন্দের সাড়া জাগায় না,- স্মৃতির মন্দিরে অতীতের তুচ্ছ ঘটনা জাঁকিয়া বসিয়া, জীবনযাত্রার ধরণও বদলাইয়া দেয়,- শান্ত স্নিগ্ধ ছায়াময় ছেলে খেলার দিন গুলির কথা, নিভৃত প্রাণের কন্দরে অকস্মাৎ স্পন্দিত হইলেও, অন্তরের কৌতূহল ও ইচ্ছার চাঞ্চল্য প্রশমিত হইয়া পড়ে,- মন শান্তভাব ধারণ করিতে প্রয়াস পায়। কিন্তু ঘটা করিয়া মানব জীবনে যেসকল ঘটনা ঘটিয়া যায়, তার চেয়ে ঢের বেশী রহিয়া যায়,-মানুষের মনে। এই মনই পরপারের সঙ্গী; স্থূলদেহ বিনির্মুক্ত মানবাত্মার পরবর্তী গতিপথ নির্দ্দেশক।

তাই অবিরত প্রার্থনা,-মাহং ব্রহ্ম নিরাকুর্য্যাং। হে মনোময় ব্রহ্ম, তোমাকে যেন বিস্মৃত না হই। পরম জ্ঞানের আলোকে, আলোকিত কর অন্তঃকরণ। অজ্ঞানতার সংসারমোহ যেন বিদূরিত হয়। জ্ঞানদীপ্ত মনে, যেন নিবিড় সত্যবস্তু উপলব্ধি করিতে পারি ভূমার আহ্বানে যেন প্রবুদ্ধ হই। বাক্য ও মনে যেন তদ্রূপই সত্যদর্শন করি। জীবনাহুতি গ্রহণ কর আমার। সমগ্র মন, সদা সর্ব্বদা যেন তোমার পানে ধাবিত থাকে। সকল অক্ষমতা ও অপূর্ণতা, তোমার কৃপাদৃষ্টিপাতে পূর্ণত্ব লাভ করুক। তপঃশক্তির বিপুল প্রেরণা প্রদান করিয়া, দিব্য চেতনা লাভে অনুপ্রাণিত কর। তোমার সীমাহীন আনন্দের অমৃতানুভূতি, সংসারের সর্ব্বকর্ম্মে বিকীর্ণ আমার হউক। অন্তরাত্মার নিভৃতধ্যানে, তুমি সতত শুদ্ধ হইয়া বিরাজিত থাক। তোমার প্রসন্নতা, আমার বুদ্ধিবৃত্তিকে প্রশান্ত করুক। মনের যাবতীয় গ্লানি ও সংশয় সন্দেহ দূর হইয়া ঋত ও কল্যাণের দীপ্তিতে, অন্তর ভাস্বর হউক, হইতে থাকুক। অস্মাকম্ ভদ্রায় ভবতু।

আগরতলা (কৃষ্ণনগর) ত্রিপুরা — শ্রীমোহিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

মাধবী বুদ্ধ পূর্ণিমা দিবস — ১৩ জ্যৈষ্ঠ ১৩৯৮ (২৮ | ৫ | ১৯৯১ ইং)

"সাঙ্গ যবে হবে ধরার পালা,
যেন আমার গানের শেষে থামতে পারি সমে এসে,
ছয়টি ঋতুর ফুলে ফলে, ভরতে পারি ডালা।
এই জীবনের আলোকেতে, পারি তোমায় দেখে যেতে,
পরিয়ে যেতে পারি তোমায়, আমার গলার মালা।
সাঙ্গ যবে হবে ধরার খেলা।"

শ্রীচৈতন্য আলেখ্য

উপক্রমণিকা

"চলো যাত্রী চলো দিনরাত্রি, করো অমৃত লোক পথ অনুসন্ধান"

ব্রহ্মসংহিতায় উল্লেখ রহিয়াছে, সচ্চিদানন্দবিগ্রহ কৃষ্ণই পরম ঈশ্বর। তিনিই সর্ব্বকারণের কারণ, অনাদি আদিপুরুষ গোবিন্দ। তিনি অবিচ্ছেদে আনন্দঘন ও চিন্ময়রস। অখিলের আত্মভূত তিনি, স্ব-সদৃশ আনন্দ ও চিদ্রূপী ভক্তগণের সহিত গোলোকে বিহার করেন। এই দিব্যধামে ভগবৎ সান্নিধ্যে উপনীত হওয়াই বৈষ্ণব সাধুগণের কামনা ও সাধনা। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভু সেই চিরবাঞ্ছিত পরমপথের সন্ধান প্রদান করিয়া, সেখানে সহজে উত্তরণের উপায় নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, তাই তিনি বিশ্বের বরেণ্য।

ভগবান যুগে যুগে জগতের প্রয়োজনে মানবদেহ ধারণ করিয়া ধরায় জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন, শ্রীমদ্ভগবত গীতার চতুর্থ অধ্যায়ে উল্লিখিত এই ভগবৎবাক্যের ভাবার্থ এই যে,— জগতে যখনই ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্মের অভ্যুত্থানে, মিথ্যাচার ও কুসংস্কারের আবর্জ্জনায় শাশ্বতধর্ম্ম আচ্ছাদিত হইয়া পারমার্থিক পথ নানা মতবাদে অবলুপ্তির উপক্রম হয়, চিরন্তন সত্যের ললিতবাণী উপহসিত হইতে থাকে, যথার্থ ধর্ম্মনিষ্ঠ ব্যক্তিগণ দিকভ্রান্ত পথিকের ন্যায়, প্রকৃতধর্ম্মপথ প্রাপ্তির প্রত্যাশায় উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়েন, তখনই অপার করুণায় শুভকর্ম, বিবেকবৈরাগ্য, জ্ঞানভক্তিপ্রদ শ্রেয়োলাভের প্রকৃতপথ আপন আচরণের মধ্যদিয়া জগৎবাসীকে প্রদর্শনের জন্য, শান্তির অমৃতপাত্র হস্তে স্বয়ং বিশ্বপতি যুগ প্রবর্ত্তক মহা মানবরূপে জীবজগতের কল্যাণার্থে ধরার বুকে অবতরণ করিয়া থাকেন।

রাষ্ট্রশক্তিহারা হিন্দুজাতির জাতীয় জীবনে, যখন ধর্ম্মীয় দুর্য্যোগ ঘনীভূত, বর্ণভেদ দূষিত অনুদার সমাজ ব্যবস্থার চাপে, ধর্মান্তরিত হওয়া প্রবলতর, হিন্দুসমাজ ঈর্ষাদ্বেষ পরনিন্দা পরপীড়নের কলুষিত আবেশে চৈতন্যহারা, ; ভক্তিপথ ত্যাগ করিয়া আশুফল লাভের আশায় জনগোষ্ঠী অভিচারাদি তান্ত্রিক ক্রিয়াকাণ্ডের অনুসরণেই অধিক আগ্রহশীল, বহির্ম্মুখী আচরণের প্রশ্রয়ে, ব্যবহারিক জীবনে ধর্ম্মীয় দীপ্তির গৌরব বিনষ্টপ্রায়, অবাধ সেই পঞ্চদশ শতকের শেষভাগে বঙ্গদেশ তথা ভারতবর্ষকে ধর্ম্মের অবশ্যম্ভাবী গ্লানি হইতে, মুক্ত করিতে ১৪৮৬ খৃষ্টাব্দের ১৮ই ফেব্রুয়ারী, অর্থাৎ ১৪০৭ শকাব্দ, ২৩ শে ফাল্গুন, শনিবার পূর্ণিমা তিথির প্রায়ঃ

সন্ধ্যাকালে, চন্দ্রগ্রহণের প্রাক্কালে, হরিধ্বনি মুখরিত নবদ্বীপ নগরীতে, সিংহরাশি আশ্রিত সিংহলগ্নে জাত যাহা কিছু শুদ্ধ,ও পবিত্র, তাঁহারই পরিপূর্ণ প্রতীকরূপে প্রেমের ঠাকুর শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব ঘটিয়াছিল পরবর্ত্তীকালে তাঁহার প্রবর্ত্তিত প্রেম ও মৈত্রীর সাম্যমন্ত্র সকলকেই সমভাবে প্রভাবিত করায় হিন্দুজাতির বিনষ্টপ্রায় জীবনীশক্তি পুনরায় দৃঢ়মূলে প্রতিষ্ঠিত হইয়া ধর্ম্ম ও সমাজ জীবনের মহাসঙ্কট হইতে উত্তীর্ণ হইয়াছিল, ভারতভূমি।

শ্রীগীতারমতে যুগাবতারের জগতে আবির্ভাবের প্রধানতম কারণ, জ্ঞান ও ভক্তির পথনির্দ্দেশে সাধুমহাত্মাগণের সহায়তা প্রদান, ঈশ্বরদ্বেষীগণের মতের নিবর্ত্তন, শাস্ত্রের অনন্তজ্ঞান অনন্তযুক্তি ও অনন্ত ভাববৈচিত্র্যের সমন্বয় সাধন করিয়া, যুগোপযোগী ধর্মের সংস্থাপন এবং ভগবানের লীলা স্বরূপের সহিত জীবনের মিলনসাধনের সহজ উপায় প্রবর্ত্তন বাহ্যিক ধার্ম্মিকতার অহঙ্কার যখন চিত্তবৃত্তিকে কুণ্ঠিত করিয়া কেবলমাত্র পূজাঅর্চ্চনা আচার অনুষ্ঠানের অন্তহীন আড়ম্বরের পুনরাবৃত্তিরূপ নৈমিত্তিক কর্মের গণ্ডীতেই আবদ্ধ করিয়া রাখে, কৃত্রিম আচারের যুক্তিহীন তমিস্র আবরণে, নিজেদের সমাচ্ছন্ন করিয়া তোলে ততক্ষণ অমৃতস্বরূপ অন্তরে প্রত্যক্ষযোগ্য হইয়া উঠেনা, তখন মনে ভক্তিরস জাগরিত হয় না, হৃদয়ে নিষ্ঠা আসে না, চরিত্রে মাধুর্য্য দেখা দেয় না, জগদ্ব্যাপী নিয়ম শৃঙ্খলার সহিত মনের সংযোগ ঘটে না। ইহার অবশ্যম্ভাবী ফলে পদে পদে ভয়ের ভাবনা থাকিয়া যায়, জাগতিক ক্ষতিকেই চরম বিপদ বলিয়া গণ্য হয়, মৃত্যুকে জীবনধারার অবলুপ্তি বোধ হয়, দিন যাপনের প্রাণধারণের বিড়ম্বনায় বিব্রত জীবনে কেবল অর্থবিত্ত, যশ প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি আপাতমধুর প্রহেলিকার প্রতি বিমুগ্ধ বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকাইয় সংসারমোহকেই অন্তরে লালন করা হয়। ইহারই অনিবার্য্য কারণে নিখিল বিশ্বের প্রতি আত্মার প্রীতি পরিপূর্ণরূপে প্রসারিত হয় না, সমাজের সর্বস্তরের মনুষ্যজাতির প্রতি আলস্য বিজড়িত অনাদর দূর হয় না, মন কেবল আপন স্বার্থপরতার পরিধিতেই পরিচালিত হইতে থাকে, যেমন করিয়া আপনা হইতেই নিঃশ্বাস গ্রহণ করা হয়, তেমনি ভাবে ঈশ্বরকে অনায়াসে চেতনার মধ্যে চালনা করা যায় না। ফলে মন বিক্ষিপ্ত হইয়া আপন সুখদুঃখ নিজের প্রয়োজন নিয়াই অহরহ ভাবিত থাকায়, ধর্মজীবন ও ঈশ্বর লাভের আবশ্যকতার ভাবনা, ব্যবহারিক জীবনের অন্তরালে সরিয়া যায়। অন্তরের সুকোমলবৃত্তি অন্তর্হিত হয়।

বহির্জগতে যাহা কিছু প্রকাশিত, তাহাকে জানিবার জন্য যেমন আমাদের বহিরিন্দ্রিয় আছে তেমনি যাহা গভীর ও ইন্দ্রিয়াতীত, তাহাকে উপলব্ধি

করিবার জন্য রহিয়াছে, অন্তরিন্দ্রিয়। এই অন্তরতর ইন্দ্রিয়ের ক্ষুধা অন্তর হইতে উৎসারিত বলিয়া ইহার আহার্যও অপার্থিব। তাই অর্থনৈতিক দিক হইতে যাহা পাইবার, তাহা চূড়ান্তভাবে পাইয়াও, মানুষের জীবনে পূর্ণতালাভের অবকাশ থাকিয়া যায় এবং জাগতিক সুখসমৃদ্ধি, যশপ্রতিষ্ঠা, বিত্তবৈভবের বাহিরেও যাহা চায়, তাহা প্রাণের আরাম, মনের শান্তি, অন্তরের নিশ্চিন্ত আশ্রয়।

পক্ষান্তরে যাহা জীবনের ভাবনাকে নীচে নামিতে না দিয়া, সর্বপ্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও, তাহাকে ঊর্দ্ধে বিধৃত করিয়া রাখে, তাহাই ধর্ম। এবং যাহা চিত্তকে বহির্মুখী ভাবনার মধ্যে সঙ্কুচিত করিয়া দৈনন্দিন জীবনধারাকে ক্লিন্ন করিয়া তোলে, তাহাই অধর্ম। সুতরাং মহৎকর্ম এবং এবং মহৎ প্রেরণা দ্বারা, আপনাপন চরিত্রকে পবিত্র আদর্শের দৃঢ়ভিত্তির উপর স্থাপন করিতে না পারিলে, ধনলাভের পথ সহজ হয় না। কালক্রমে বিনষ্ট এই মহান আদর্শ পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিতেই যুগে যুগে মহামানবের অবতীর্ণ হইবার অন্যতম শ্রেষ্ঠ অভিপ্রায়।

উল্লেখযোগ্য যে, জীবাত্মা সততই নিজ স্বরূপ প্রকাশের প্রয়াস পাইতেছে এবং ইহাই জীবাত্মার সংস্কার। অপরদিকে বহির্মুখী প্রেরণার তরঙ্গাঘাত জীবাত্মার এই স্বতঃপ্রকাশে কেবলই অন্তরায় সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছে এবং ইহাই মায়ার ছলনা মধ্যবর্ত্তী এই অবস্থাই জীবের বন্ধন-দশা। সুতরাং এই প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তিকে পরাভূত করিয়া, জীবাত্মার স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠা লাভের পথে সম্যক সহায়তা করিবার অবিরত অনুশীলনের আন্তরিক প্রচেষ্টাই প্রকৃত ধর্মজীবন। অধিকন্তু এই মরণশীল জাগতিক জীবনের অতি ঊর্দ্ধে এক মহানশক্তি অবস্থিত। তাঁহার ইচ্ছাতেই জগতের যাবতীয় ঘটনা প্রবাহ সুনিয়ন্ত্রিত ভাবে অবিরাম প্রবাহিত হইয়া বিশ্বব্রহ্মাণ্ড পরিচালিত হইতেছে। এবং সেই সর্বব্যাপী সত্তার সান্নিধ্য লাভের জন্যই সংসার দশাগ্রস্ত জীবাত্মার বন্ধন মুক্তির ব্যাকুলতা। কারণ আমাদের অন্তরাত্মার সত্যসত্তা একান্ত স্বাভাবিক ভাবেই এই বিশ্বপতির সহিত যে মিলিত হইতে চাহিতেছে এবং নিজেকে সর্বতো ভাবে তাঁহার নিকট সমর্পণ করিতে প্রয়াসী, কেবলমাত্র তাহাই নহে, পরন্তু ইহাতেই তাঁহার একমাত্র অভীপ্সা ও আনন্দ। কিন্তু অনাদি বহির্মুখ জীবের অভীষ্ট দেবতাকে জানিবার, তাঁহাকে ভাবনা করিবার, তাঁহার সহিত যুক্ত হইবার সঙ্কেত মন্ত্র জানা নাই। তাই ঈশ্বর-লাভের যথার্থ পথনির্দ্দেশ পাইবার প্রত্যাশায় মনুষ্যজাতি যখন অন্তরেরঅন্তরে ব্যাকুল হইয়া পড়ে, সাধু বৈষ্ণবগণ ভগবানের আবির্ভাবের আশায় নিরবচ্ছিন্ন প্রার্থনা নিবেদন করিতে থাকেন, তখনই আনন্দ চিন্ময়রূপী গোবিন্দ, সেই

পরিমণ্ডলের উপযোগী ধর্মপথ প্রদর্শনের জন্য নরদেহ ধারণ করিয়া ধরাধামে আগমন করেন।

শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভু তথা শ্রীগৌরাঙ্গ কিংবা নিমাই পণ্ডিতের আবির্ভাব কালে, দেশে রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা থাকিলেও ধনৈশ্বর্য্যের অভাব ছিল না। শিল্প কলা, শাস্ত্র আলোচনা, চতুর্ব্বেদ বিদ্যাচর্চার কেন্দ্র নবদ্বীপে তখন পাণ্ডিত্যের আন্দোলনে, নব্যন্যায়ের বিতণ্ডায় শতশত চতুষ্পাঠী সর্বদা মুখরিত থাকিত। নানাস্থান হইতে সমাগত সহস্র সহস্র বিদ্যার্থী, অভূতপুর্ব উৎসাহের উদ্দীপনায় পূর্বপক্ষ ও অপরপক্ষের বাদ প্রতিবাদে নিরত অপরাহ্ন বেলা কূট প্রশ্ন ও শুষ্কতর্কে গঙ্গাতট প্রতিধ্বনিত হইত। কিন্তু বর্ণাশ্রমের দুর্ভেদ্য প্রাচীর ও অস্পৃশ্যতার কঠোর গণ্ডি, মানুষের সহিত মানুষের ব্যবধান ক্রমেই বিপুলভাবে বর্দ্ধিত করিয়া তুলিতেছিল। চণ্ডীমণ্ডপের আসরে শাস্ত্রোক্ত রসের বিচার হইলেও, জীবন ছিল রসহীন। বিদ্যার উৎকর্ষে সকলেরই মস্তিষ্ক ছিল পুষ্ট, এমনকি পরিচারকগণও সংস্কৃত ভাষায় কথা বলিবার দক্ষতা রাখিত। কিন্তু ভগবদ্ভক্তির অভাবে প্রায় সকলেরই হৃদয় ছিল শুষ্ক। শাস্ত্র গ্রন্থাদির ভাষ্যের অনুভাষ্য রচিত হইলেও, চিত্তে মানবীয় ঔদার্য্য ছিল অপসৃত। পাণ্ডিত্যের প্রাচুর্য্যের মধ্যে প্রায়শঃ দেখা দিত আত্মিক দৈন্য। ফলে শাশ্বত ধর্মতত্ত্ব ম্রিয়মান মানবমন হইতে প্রায় অবলুপ্ত হইতে চলিয়াছিল। সদাচারী ব্রাহ্মণগণ হিন্দুধর্মের অন্তর্নিহিত পন্থা পরিত্যাগ করিয়া, বাহ্যিক আচার অনুষ্ঠানের ব্যয়বহুল ক্রিয়াকাণ্ডে আত্মনিয়োগ করিয়াই পরিতৃপ্ত হইতেছিল। গৃহে গৃহে জ্ঞানের স্বতন্ত্রধারা প্রবাহিত হইয়া, বেদের বিকৃত অর্থে জীব হিংসা প্রচলিত হইতে লাগিল। ধর্মের নামে অধর্মের প্রসারে ধর্মীয় শৃঙ্খলা শিথিল হইয়া আসিল। অত্যুজ্জ্বল প্রদীপ্তআলোক নির্বাপিত হইলে, অন্ধকার যেমন অধিকতর গাঢ় বোধ হয়, মোসলমান শাসনের শেষভাগে ভারতভূমিতে হিন্দুসংস্কৃতির ক্ষেত্রে তাহাই অনিবার্যরূপে সংগঠিত হইয়াছিল। চিন্তাশীলতার স্বাধীনতা ক্রমে অবলুপ্ত হইয়া শাস্ত্রের সঙ্কীর্ণতা, ধর্মের সাম্প্রদায়িকতা এবং অস্পৃশ্যতার ভয়াবহ কঠোরতা মানবীক চেতনাকে অন্তর্হিত করিয়া সমাজকে নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির তামসিক কালিমায় আচ্ছন্ন করিয়াছিল। ভারতবর্ষের ইতিহাসে ধর্ম ও সমাজ জীবনের সেই নিদারুণ সঙ্কট সময়ের যুগসন্ধিক্ষণে, রমণীয় ভাগিরথীতটে, বিদ্বজ্জন মুখরিত, জ্ঞান ও ধর্মের পুণ্যভূমি শ্রীধাম নবদ্বীপে, ক্ষমা, করুণা ও ভক্তি প্রেম রসের সমুজ্জ্বল মূর্ত্ত প্রতীকরূপে শ্রী গৌরাঙ্গ দেব অবতীর্ণ হইয়া, সমাজের সকল আত্মিক দৈন্ত ঘুচাইয়া, লাঞ্ছিতের বেদনা মুছাইয়া, পাণ্ডিত্যের গর্ব খর্ব করিয়া, যাবতীয় সামাজিক সমস্যার সঙ্কট

মিটাইয়া, বিচিত্র বৈষম্যক্লিষ্ট সমাজের অগণিত অশান্ত জীবনিবহকে ধন্য করিয়া অভিনব এক মহাসাম্যনীতির ভূমিকায় উত্তীর্ণ এবং ভগবানের সহিত যুক্ত হইবার সহজ সাধন পথের সন্ধান প্রদান করিয়াছিলেন।

তাঁহার বিস্ময়কর প্রতিভার অমৃতময় আলোকে, অনবদ্যরূপের অনির্বচনীয় মাধুর্যে ও অনুপম গুণের আকর্ষণে, তথা দিব্যজীবনের ঐশ্বরিক প্রভাবে, ধর্মের নামে অনাচার দূরীভূত ধর্মাদ্বেষীদের স্বভাবের অপূর্ব পরিবর্তন সংঘটিত হইয়াছিল। পরবর্তীকালে তিনি, এমন এক ভগবৎ আরাধনার উপায় প্রবর্তন করিয়াছিলেন, যাহা উচ্চ নীচ, পণ্ডিত মূর্খ, সকলেরই ব্যবহারিক ধর্মজীবন নূতন করিয়া মহিমামণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছিল। ইহা শ্রম সাধ্য আচার অনুষ্ঠান বিহীন, কেবলমাত্র ভক্তির সম্বল যে কোন অবস্থায় যে কোন সময়, নিরবচ্ছিন্ন ভগবৎ অনুস্মরণ রূপ নামজপ। ইহাতে ধর্মের নামে বিচ্ছেদের অন্তরাল সমাজ জীবন হইতে সহজে দূরীভূত হইয়া ধর্ম জীবনে জনজাগরণ তথা জাতিধর্মবর্ণ ধনীদরিদ্র, শিক্ষিতঅশিক্ষিত, নির্বিশেষে পরস্পর মৈত্রীবন্ধনের মিলন সাধিত হইয়াছিল, যাহাতে তিনি জগতের শ্রেষ্ঠ ধর্ম প্রচারক ও মহৎ সমাজ সংস্কারকরূপে পরিগণিত হইয়াছিলেন।

মানবমনের সুকোমল বৃত্তিকেই ধর্মজীবনের ভিত্তি বলা যায়। সুতরাং তাহার সম্যক বিকাশের উপরই পারমার্থিক জীবনের পরিপূর্ণতা নির্ভর করে। তাই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সংসারাসক্ত জনগণের বহির্মুখী চিত্তকে মার্জিত করিয়া অন্তর্মুখী করিবার সহজ উপায় দেখান করিলেন—সংসার দাবানলে বিদগ্ধ ভগবদ্ভক্ত, যে কোন অবস্থায় ভগবৎ মহিমাব্যঞ্জক নামজপ ও সমবেত হরিনাম সঙ্কীর্তন দ্বারাই, এই উত্তাল তরঙ্গ বিক্ষুব্ধ সদা দুঃখময় সংসার সমুদ্র অনায়াসে উত্তীর্ণ হইয়া পরমানন্দময় দিব্যলোকে শ্রীকৃষ্ণ সান্নিধ্যে গতিলাভ করিতে পারিবে। শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান ভক্তিদ্বারাই তাঁহাকে বশীভূত করা যায়। কায়মন বাক্যে শ্রীভগবানের অনুগত হইয়া তাঁহার প্রতি অন্তরের আন্তরিক প্রীতি ও ঐকান্তিক অনুরাগই ভক্তি। অন্য বস্তুর অভিলাষ শূন্য এবং জ্ঞান কর্মাদির ব্যবধান রহিত একমাত্র অহৈতুকী ভক্তিদ্বারাই ভগবানের সহিত যুক্ত হওয়া যায়। প্রথমে শ্রীভগবানের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস, তারপর সাধুসঙ্গ, পরে অর্চনা। ইহাতে বিঘ্ননিবৃত্তি হইয়া ভগবৎ নামে রুচি আসে এবং চিত্তে ভাগবতীয় রসের সঞ্চার হয়। ক্রমে রসস্বরূপ ভগবানের প্রতি প্রেমের উদয় হইয়া, তাঁহার সান্নিধ্য লাভের জন্য রসিক চিত্ত ব্যাকুল হইয়া পড়ে। ব্যাকুলিত ভক্ত হৃদয়ই ভগবানের বিশ্রামস্থান।

রস অর্থ আনন্দ; যাহা দুইপ্রকার বুঝায়, জড় ও চিৎ। জড়রস অর্থে সাংসারিক সুখদুঃখ, ইহাই বিকৃত হইয়া দাম্পত্য প্রণয়, অপত্য স্নেহ, আনুগত্য

সখ্যতা, ক্রীড়া কৌতুক প্রভৃতিতে পরিণত হয়। অপর দিকে চিৎরস, শুদ্ধ আনন্দ; যাহা অন্তরে অর্জ্জিত হইলে, জগতের সব কিছুই চিদানন্দময় ভগবানের আনন্দ প্রকাশ বলিয়া প্রতীয়মান হয়। তখন বাল সূর্য কিরণ বিচ্ছুরিত অন্তরীক্ষ, নবীনশস্য বিকীর্ণ ক্ষেত্র, পূর্ণচন্দ্র উদ্ভাসিত গগনতল, অমানিশার প্রগাঢ় অন্ধকারে তারাবিচিত্র নভঃস্থল বসন্ত ঋতুর অলঙ্কৃত আম্রমুকুল, কোকিল কুজিত কুঞ্জবন, সব কিছুর মধ্যেই পরমানন্দ ভগবানের প্রকাশ অনুভব হয়। এইরূপ ভাগবতীয় ভাবের বশবর্ত্তীতে, কামনা বিরহিত জাহ্নবীধারার সাগর সঙ্গমে সতত প্রধাবিত হইবার ন্যায়, অভিলাষশূন্য চিত্তকে অবিরত ভগবৎ অভিমুখীন করিয়া রাখাই প্রকৃত সাধনা।

শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষা এই যে, জীব ও ভগবান উভয়ই নিত্য এবং লীলাময় ভগবানের সহিত জীবের সম্বন্ধও নিত্য লীলায়িত। আপন স্বরূপ বিস্মৃত সংসারসক্ত জীবনিচয়, জগৎকেই একমাত্র অবলম্বন ভাবিয়া, ইহার অনিবার্য দুঃখ জ্বালায় সদা সন্তপ্ত থাকিয়াও, ইহা হইতে নিস্তার লাভের উপায় অনুসন্ধান করে না। সৌভাগ্যবশতঃ প্রকৃত সাধু মহাপুরুষের কৃপায়, কাহারও চিত্তে ভগবানের সহিত আত্মার আত্মীয়তা জ্ঞান স্ফূর্তি হইয়া, সেই সম্বন্ধানুযায়ী আরাধ্যের প্রতি প্রেমপ্রীতি উপজাত হইলেই, জীবহৃদয় আনন্দময়ের সহিত যুক্ত হইয়া আনন্দী হয়। তখন ঐকান্তিক ভক্তির অপূর্ব আকর্ষণী শক্তিপ্রভাবে শ্রীভগবানের তুষ্টি বিধান করিয়া, নিবিড় ও মধুর সম্পর্ক স্থাপন পূর্বক, তাঁহার তত্ত্বে এবং নিত্যলীলায় প্রবেশাধিকার লাভ করা যায়। বস্তুত যিনি প্রেমানন্দ স্বরূপ, তাঁহার প্রতিই প্রেমভক্তি নিবেদন সঙ্গত এবং কোন জীব যখন ঈশ্বরের সহিত প্রীতিতে আবদ্ধ হয়, তখনই তাহা পূর্ণ স্বার্থকতা লাভ করিয়া, প্রকৃত বিচারে সেইজন অমৃতের সন্তান-রূপে গণ্য হয়। প্রত্যেক জীবের চিত্তেই রসস্বরূপতা ধর্ম নিত্য বিদ্যমান এবং প্রেমলাভের জন্য তাই তাহার অদম্য আকাঙ্খা। কিন্তু ভগবৎপ্রেম জন্যপদার্থ বা উৎপাদক বিষয় নয় বলিয়া, তাহা আপনা আপনি উৎপন্ন হইতে পারে না। ইহা সাধুকৃপা বাহনা এই কৃপা আকর্ষণের সংকেত মন্ত্রই পরমকৃপালু মহাপ্রভু প্রদান করিয়াছেন।

অপ্রাকৃত এই ভাগবতীয় প্রেমের অনুভবে, অন্তরে অপার্থিব আনন্দের উচ্ছ্বাস প্রবাহিত হইয়া পরাশক্তি লাভের পথে পদক্ষেপ ঘটে। এবং জীবনিষ্ঠ প্রেম প্রীতি ভগবৎ নিষ্ঠায় পর্য্যবসিত হইলেই তাহা ঐশ্বরিক প্রেম পদবাচ্য হয়, যাহা নিরুপাধিক বা অনির্বচনীয়। সুতরাং ইহা কর্মযোগ বা জ্ঞানযোগ দ্বারা লভ্য নয়। ঐকান্তিক ভক্তিতে প্রাণমন যখন পরিপূর্ণরূপে স্নিগ্ধ ও দ্রবীভূত হইয়া বিজাতীয় বিষয় ব্যাপারে অনাসক্তি আনয়ন পূর্বক

ইষ্টে অশেষ মমত্ববুদ্ধি সঞ্চার করে, তখন চিত্তদর্পণ মার্জ্জিত হইয়া, সমস্ত অনর্থের অপসারণে অবিদ্যা অর্থাৎ রজস্তমোগুণ নিরাকৃত হয় এবং কেবল মাত্র সত্ত্বগুণ, অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান জাগরূক থাকে, যাহা সাধনভক্তি অর্থাৎ শ্রবণ কীর্ত্তনাদি ভজনাঙ্গের দ্বারা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়া, চিত্তকে সমুজ্জ্বল তথা ভাগবতী ভাবের সহিত একাত্মতা আনয়ন করিয়া অপার্থিব প্রেম চিত্তকে উদ্ভাসিত করে। তখন মহাদাবাগ্নির মত সংসারের দুঃখজ্বালা অন্তরকে আর সন্তপ্ত করিতে পারে না। পক্ষান্তরে সর্বতোভাবে প্রস্তুত ভগবদ্ভক্তের হৃদয় ক্ষেত্রে তখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক নিক্ষিপ্ত ভগবৎ প্রেম প্রতিফলিত হইয়া তাঁহাকে অপ্রাকৃত অনুরাগে সতত আবিষ্ট করিয়া রাখে।

মনই চিন্তার অনুগামী বলিয়া যদি কেহ দূষিত মনে ধর্মকার্য্যও করে, তবে শকটের চাকা যেমন ভারবাহী বলীবর্দ্দের পদচিহ্ন অনুসরণ করিয়া চলে, পদে পদে প্রতীকারহীন দুঃখের বিড়ম্বনা তেমনি ভাবে তাহার পশ্চাদ গমন করে। পক্ষান্তরে নির্দ্দোষ অন্তরে সঞ্চারিত অপ্রাকৃত প্রেমের নিকট ভগবান অসীম হইয়াও সসীমরূপে প্রতিভাত হন। নির্বিকার হইয়াও চঞ্চল এবং নিষ্ক্রিয় হইয়াও ভক্তহৃদয়ে সদা ক্রিয়াশীল হইতে থাকেন। ভগবান কর্তৃক আশ্রিত ভক্তজীবনে কোন বিপদই আসিতে পারে না। অধিকন্তু সদা ভক্ত হৃদয় কন্দরে স্ফুরিত— পারমার্থিক প্রেম, যাহা ভগবৎ অভিপ্রায়েই অর্পিত তাহা পুনরায় গ্রহণ করিবার জন্য ভগবান লালায়িত হইয়া পড়েন। তাৎপর্য্য এই, সূর্য্যের উত্তপ্ত আকর্ষণে বাষ্পাকারে ঊর্দ্ধ উত্থিত সমুদ্রজল, ক্রমে মেঘরূপে পরিণত হইয়া যেমন বৃষ্টিধারায় পুনরায় সমুদ্রে পতিত হয়, সেইরূপ ভক্ত হৃদয়ে ভগবৎ প্রদত্ত প্রেমবারি ক্রমে ভক্তিরসে রূপান্তরিত হইয়া ঐশ্বরিক আকর্ষণে আবার ভগবদভিমুখীন হয় অর্থাৎ ভগবান হইতে ভক্তহৃদয়ে বিচ্ছুরিত ভগবৎ প্রেম সাধন ভজনে পূর্ণতা প্রাপ্ত হইলে, সেই মহা প্রেমের অপরিসীম মাধুর্য্য আস্বাদন করিবার জন্য প্রেমিক ভগবানের লালসা জাগে ইহাই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মধুর সিদ্ধান্ত

উল্লেখযোগ্য যে উপরোক্ত ভাগবতীয় প্রেমরসের মধ্যে যে অপার্থিব মনোহারিতা নিহিত রহিয়াছে, যাহা ভগবদ্ভক্তগণ সতত পরিতৃপ্তির সহিত অনুভব করিয়া থাকেন তাহা সত্ত্বগুণজাত কোনরূপ সাত্ত্বিক আনন্দ নহে, কিংবা জ্ঞান মার্গের সাধকগণের ব্রহ্মানুভূতিজনিত সন্তোষলাভ, অথবা যোগীগণের মানসিকভাবে পরমাত্মার সহিত মিলনে সুখময় অবস্থায় অবস্থানও নয়। ইহা আনন্দস্বরূপ ভগবানের স্বরূপশক্তির বৃত্তি হইতে, অনাদি কালের নিত্য সম্বন্ধযুক্ত জীবহৃদয়ে সঞ্চারিত বিশুদ্ধ চিন্ময় প্রেম। ইহার উৎকর্ষে চিত্তের মালিন্য অপসারিত হইয়া দর্পণের মত উজ্জ্বল হয়, সংসার দুঃখরূপ অগ্নিদাহ

নির্বাপিত হয়; জীবনের যাহা কিছু ভাল তাহা শতদলের মত বিকশিত হয়; জ্ঞানবিগ্রহরূপ নন্দিনীদিগকে প্রমত্ত করিয়া অন্তরের আনন্দ সমুদ্রে মত্ত, উদ্বেলিত হয়, অমৃতের আস্বাদস্বরূপ এই আনন্দ সায়রে, ভক্তহৃদয় নিয়ত অবগাহন স্নানে রত থাকে, ইহা শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষার অন্তর্গত।

সর্বজনের আদর্শ স্থানীয় রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা, যাহা শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভু আপনি আচরণ করিয়া আপামর জগতবাসীদিগকে শিক্ষা দিয়াছিলেন, তাহা ব্যবহারিক জগতে অনন্ত প্রকৃতির সহিত অনাদি পুরুষের নিত্যলীলা। ইহার প্রকাশিত দিকটি মানবীয় এবং অন্তরের আস্বাদনের দিক আত্মিক। তাই বাহু বিদ্যা নয়, প্রভূত জ্ঞান নয়, অনেক অভিজ্ঞতা নয়, অন্তরের আন্তরিক অনুভূতির আত্যন্তিক আলোকেই সেই পরম সত্যকে উপলব্ধি করিতে পারা যায়। পক্ষান্তরে ঘনকৃষ্ণবর্ণ মেঘের অভ্যন্তরে শ্বেতশুভ্র বিদ্যুতের রেখা, যেমন চকিতে পরিস্ফুট হইয়াই মিলাইয়া যায়, তেমনি তমসাচ্ছন্ন চিত্তে অপ্রাকৃত ভাগবতীয় ভাব অতর্কিতে আবির্ভাব হইয়াই অন্তর্হিত হয়। কারণ বিপুল আগ্রহ ভরে ভগবৎ অনুধ্যানে মনোনিবেশ করিলেও দুঃখ সুখের আবেশ বিহ্বল বহির্মুখীন চমকিত চিত্তে, হঠাৎ আগত বিগতদিনের ধূসরস্মৃতি আরাধনার অভিনিবেশে আবিলতা আনিয়া, অন্তরের আবিষ্টভাব তিরোহিত করে। তাই চঞ্চলমতি, জীবিকার চিন্তায় সদা ব্যস্ত, অল্পায়ু, কঠিনসাধনে অপারক, কলিহত জীবের পক্ষে, মঙ্গলময়, পরমপুরুষের প্রণিধান সর্বক্ষণ সহজভাবে ধরিয়া রাখিয়া, অন্তরে নিরন্তর নির্মল আনন্দলাভ করা সম্পর্কে, শ্রীমন্মহাপ্রভু মহানাম মন্ত্রই একমাত্র প্রকৃত উপায় বলিয়া উপদেশ করিয়াছেন।

উল্লেখযোগ্য যে হরি নামের ব্যবহারিক দিকটি এমনি অদ্ভুত যে, হেলায় বা শ্রদ্ধায় গ্রহণ করিলেও, তাহা চেতনাকে সুস্থ করে, মানসিকতাকে সঠিক পথে লইয়া যায় এবং পারমার্থিক রুচিবোধ জাগাইয়া তোলে বিশ্বপতির সহিত বিশ্ববাসীর অনায়াসে যুক্ত হইবার নিখিল শাস্ত্রসম্মত এই তত্ত্বসন্দেশ কোনকালেই অর্পিত হয় নাই। এবং সেই বস্তুর দানই মহাদান বলিয়া গণ্য হয়, যাহা কাহারও পক্ষে কোন মতেই পাইবার উপায় ছিল না। কলিকলুষনাশন শ্রীশচীনন্দন, গৌরহরি, চৈতন্য মহাপ্রভু উজ্জ্বল শৃঙ্গার রসদ্বারা পরিপুষ্ট চিরঅনর্পিত এই রাগাত্মিক ভক্তি পথ প্রকাশিত করিয়া কলি প্রভাবিত জীবকে ইহলোকে পরম স্বস্তি এবং পরলোকে ভগবৎ সান্নিধ্যরূপ মহান শান্তিলাভের সর্বোত্তম, অথচ অনায়াস সাধ্য পথের সন্ধান প্রদান করিয়াছেন বলিয়াই, তিনি দাতা শিরোমনি বলিয়া সর্বকালে স্বীকৃত।

সমুদ্রের তটকে যেমন সমুদ্র বলাযায় না এবং সমুদ্রের উপরিস্থিত ভূমিও বলা চলেনা, অথচ উভয়ই পরস্পর যুক্ত কিংবা উভয়ের আশ্রয়স্থল, তেমনি

জীব, ব্রহ্ম নয় এবং মায়াও নহে; পরন্তু এই দুইয়ের মধ্যভাগে অবস্থিত, ভগবানের নিত্যসত্তা ও উভয়ের উপাশ্রয়। সমুদ্রের সম্বন্ধবশতঃ তটের অর্থাগমের ন্যায় শ্রী ভগবানের সহিত অংশাশী সম্পর্কে জীবের তটস্থরূপ নিত্যত্ব সিদ্ধ হয়। অর্থাৎ সমুদ্র যেমন অনাদি কাল হইতে আছে; তাহার উপকূল ভূমিরূপে তটও রহিয়াছে এবং সেইহেতু উভয়ের প্রীয়মান সম্পর্ক।

সদা সংলগ্ন থাকিয়াও তটভূমিতে লবণ ও স্বাদ মিশ্রিত না হওয়ার কারণ, সতত সমুদ্র সংলগ্ন রহিয়াও, তট নিজস্ব সত্তা রক্ষাতেই সচেষ্ট। সেইরূপ ভগবানের সহিত নিত্যযুক্ত থাকা সত্ত্বেও দেহে আত্মবুদ্ধি পোষণ করিয়া, তাহাতে তৎপর থাকায় জীবের আত্মস্বরূপের বিস্মরণ ঘটে। তটভূমি যথোৎপন্ন কণ্টকাদিতে বিস্তীর্ণ থাকার ন্যায়, জীবের জীবনও প্রকৃতি গুণজাত কণ্টক-সদৃশ্য সংসার দুঃখে আকীর্ণ। আত্মবিস্মৃত জীবের সংসারাবদ্ধ অবস্থা হইতে মুক্তিলাভের উপায় সম্পর্কে মহাপ্রভুর উপদেশ এই যে, সুখে দুঃখে ধৈর্য্য ধারণ পূর্বক প্রতিদিবসের যথোচিত কর্মে নিরলস থাকিয়া, ঈশ্বরে সমর্পিত প্রাণ ভক্ত, বাহ্যচেতনায় কীর্ত্তনাদির অনুসরণে এবং আন্তরিক অন্তরঙ্গে নিজেকে শ্রীকৃষ্ণের অনুগত দাস, প্রিয়তম সহচর, স্নেহময় পিতা, পুত্রবৎসল মাতা কিংবা অনুরক্ত প্রণয়ী কল্পনা করিয়া, তাঁহারই অনুধ্যানে সর্বক্ষণ নিমগ্ন থাকিলে, চিত্তবৃত্তি তদাকার প্রাপ্ত হইয়া, অন্তর নির্মল হইবে। নির্মল চিত্তেই ভগবৎলীলা বিষয়ে 'শ্রদ্ধা' উপজাত হইয়া, পরিশেষে 'রুচি, উদ্ভব হয়। রুচির সরসতায় ভাগবতীয় কথামৃতে 'অনুরাগ' আসিয়া, 'রতি' আবির্ভাব হয়। রতি প্রগাঢ় হইলে তাহা কামনাবিহীন 'প্রেমনামে' অভিহিত হইয়া থাকে। সর্বানন্দপ্রদ অহৈতুকী এই ভগবৎপ্রেমই প্রয়োজন বলিয়া শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর অভিমত।

অতি আধুনিক যুগের ঈশ্বরবিমুখ সমাজে যেখানে জন জীবনের সহিত অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত সুস্থ আত্মিক মূল্যবোধ, ক্রমেই সরিয়া গিয়া আত্মম্ভরিতা ও ভগবৎ স্পৃহাহীনতার প্রাদুর্ভাব দেখা দিতেছে, সেই বহির্মুখীন পরিমণ্ডলের সমাজ জীবনে, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর জীবন ও বাণী আলোচনা করিবার যথেষ্ট প্রয়োজন রহিয়াছে। সাম্যের মৌখিক গুণকীর্ত্তনে, মনের রাগদ্বেষাদিবর্জ্জিত সমতাভাব আসিতে পারে না। আবশ্যক ভগবৎনির্ভর প্রেমপ্রীতি, যাহার মূলে পরকাল ও পরমেশ্বরের প্রতি অন্তরের অচল বিশ্বাস অবিচলিত। বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য যেমন জাগতিক লুক্কায়িত সত্যকে উদঘাটিত করিয়া জগতের ব্যবহারিক কল্যাণ সাধনের উপায় নিরূপণ, ধর্মের লক্ষ্য ও মনের আড়ালে অবস্থিত, পরম সত্যকে দৃষ্টিপথে আনয়ন করিয়া মানব মনের আত্মিক কল্যাণ বিধানের উপায় নির্দ্ধারণ। পক্ষান্তরে সংশয়াত্মা লোকের

পরমাত্মা, পরমেশ্বর সম্বন্ধে সন্দেহ থাকিলেও, জীবনে দুঃখ আছে, ইহাতে কাহারও দ্বিমত নাই ; কারণ প্রত্যেকের জীবনই কোন এক দুঃখে ভারাক্রান্ত। এই দুঃখানুভূতির মূলে রহিয়াছে পূর্বজন্মের সুখস্মৃতির সংস্কার। এবং সুখময় অখণ্ড আনন্দকে বিস্মরণই দুঃখের হেতু। বিজ্ঞান ভোগের বিবিধ উপকরণ প্রদান করিলেও অন্তরের দুঃখ দূর করিতে পারে না ; কারণ একমাত্র পরমানন্দময়ের সহিত যুক্ত হইলেই দুঃখের নিবৃত্তি হয়, ইহাই ধর্মশাস্ত্রের উপদেশ। ঈশ্বরই সত্যস্বরূপ, কল্যাণস্বরূপ, আনন্দস্বরূপ এবং এই ভূমানন্দের সহিত যে যোগসম্বন্ধ বা ভাববন্ধন, মহাপ্রভুর মতে তাহাই "প্রেম"।

শাস্ত্রীয় উপাসনার আভিধানিক তাৎপর্য অতিসন্নিধানে একাত্ম হইয়া থাকা কিংবা ঈশ্বরের নিকট বাস করা। ইহাতে ভগবানের সহিত প্রেমের সম্পর্ক স্থাপনের কথা নাই এবং ইহা কোনকালেই পরিস্ফুটরূপে জানা ছিল না। তাই বেদমতে ঈশ্বর লাভের পথ, অতিকষ্টকর, যেন ক্ষুরের ধারের মত শাণিত। কিন্তু জীবহৃদয়ের স্নেহপ্রীতি প্রেম পরমামৃতময় পরমসুন্দর শ্রীকৃষ্ণকেই অনুক্ষণ অনুসন্ধান করিতেছে বলিয়া, ভক্তহৃদয় [illegible] যতখানি তাঁহার নিকটবর্তী, আনন্দ সেই পরিমাণে অনুভূত হয়, এবং অবিরত তাঁহার নাম জপই প্রেমময় কৃষ্ণের সহিত যুক্ত থাকার উত্তম পথ — আপন গভীরতম সত্তার অনুভাবসিঞ্চিত নিত্যধামের নিভৃত নিকুঞ্জের এই নিগূঢ়বার্তা, জীবলোকের মুক্ত গগনতলে ব্যক্ত এবং সর্বাতিশায়িরূপে নিজ জীবনে প্রকাশ করিয়া, প্রায় অর্দ্ধশত বর্ষ পূর্বে কেবলমাত্র হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন মাধ্যমে যেই প্রেমের বন্যা ধনীদরিদ্রের অসমতা, জাতিভেদের বৈষম্য, ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের কঠোরতার জটিলতা ঘুচাইয়া পরস্পরকে ভ্রাতৃত্ববোধের পরম প্রীতিতে মর্য্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল, সেই প্রেমধর্মের প্রচারক ছিলেন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু। তাঁহার প্রবর্ত্তিত সহজ সরল ভগবৎ আরাধনা ও মৈত্রধর্মের মর্মবাণী সমাজের সর্বস্তরে শ্রদ্ধার সহিত বিস্তার হইলে, স্পর্ধিত ধর্মাচরণের কৃষ্ণযবনিকা যাহা ধর্মের নামে, মানুষে মানুষে অন্তরাল সৃজন করিয়া তুলিয়াছে তাহা অনায়াসেই অপসারিত হইয়া ঈশ্বর লাভের যথার্থ পথ সকলের নিকটই সুগম হইবে। ভগবানকে আমরা দেখিতে না পাইলেও, তিনি আমাদিগকে নানা দুঃখ বেদনার মধ্য দিয়া জীবজীবনের সার্থকতার দিকেই লইয়া চলিয়াছেন তাঁহাকে কেমন করিয়া পাওয়া যায়, কিভাবে তিনি কাহার নিকট ধরা দেন, তাহা কেহ বলিতে পারে না। শাস্ত্রকারগণও এই বিষয়ে নীরব। কারণ ভগবান জড়ীয় বাক্য ও মনের অগোচর। কিন্তু আমরা তাঁহার কথা ভাবিতে পারি। তাঁহাকে চিন্তায় ধরিয়া রাখিতে আমাদের অসুবিধা নাই। এই ভাবনা ও

চিন্তনই ভগবৎ উপাসনা, কিংবা তাঁহার সমীপে উপবেশন। তাঁহার সর্ব গুণসম্পন্ন বিশুদ্ধস্বভাবের উপর চিত্ত নিবিষ্ট করিয়া, ভক্তিভরে তাঁহাকে ভাবনা করিতে হইবে। প্রীতির সহিত হৃদয়কে সর্বদা ভগবৎ ভাবিত রাখিয়া সকল চিন্তায়, সমস্ত কাজে যাবতীয় অবসরে, সমগ্র নিজেকে কেবলই ভগবৎ মুখীন করিয়া চলিতে হইবে। যেহেতু চিন্তাই শরীর গঠন করে এবং নিরন্তর ভাবৎ অনুধ্যানে মর্ত্য তনু ভগবতী তনু হইয়া উঠে, তাই প্রতিনিয়তই তাঁহাকে স্মরণে রাখিতে হইবে। তিনিই প্রাণের প্রাণ, চক্ষুর চক্ষু, শ্রোত্রের শ্রোত্র মনের মন এবং আমাদের প্রাণমন অতি অজ্ঞাতসারে তাহারই অভিমুখে চলিতেছে, যাহা ইচ্ছাকৃত হয় না, বলিয়াই দুঃখ বিচলিত করে।

কাজেই ভগবানকে পাওয়া নয় নিজেকে ভগবানের ভূমিকায় উন্নীত করিয়া দেবাত্মা হইতে হইবে, তাঁহার স্বভাবের আদর্শে আপনাকে গঠিত করিয়া তুলিবার আন্তরিক প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখিতে হইবে, তাহার নির্মলতার মত বিশুদ্ধতা, তাহার শক্তির অনুকারী মঙ্গলময় সামর্থ্য, অবিরত কামনা করিয়া যাইতে হইবে সুখেদুঃখে, কর্মেবিশ্রামে ও সকল কর্মাবসানে। তবেই ঐশ্বরিক পবিত্র চরিত্রের বিমলজ্যোতি আপন আচরণে প্রতিফলিত হইবে, যেমন মার্জিত দর্পণেই সূর্যরশ্মি বিচ্ছুরিত হয়। জগতের অজস্র পার্থিব আকর্ষণ ও সংসারের বিবিধ বৈচিত্র্যপূর্ণ ব্যাপারের মধ্যে বাস করিয়াও, আমরা যে শান্তিসুখ পাই না, তাহার কারণ সর্বসুখনিলয় ভগবানের সহিত আমাদের যোগ নাই। সেই সর্বসুখদাতা সর্বদাই আমাদিগকে তাঁহার অভিমুখে আকর্ষণ করিয়া চলিয়াছেন, আমাদিগের সুখসমৃদ্ধির জন্য জগৎ জুড়িয়া কত তাহার আয়োজন, দিনেদিনে স্তরেস্তরে সকলকেই শতদল পদ্মের মত বিকশিত করিয়া তুলিতেছেন, তাহারই পূজার অর্ঘ্যরূপে গ্রহণ করিবার জন্য। আমাদের কর্তব্য কেবল সেই অমৃতময় হইতে অবিরত বর্ষিত অমৃত-ধারা ধারণ করিবার জন্য নিজেদের পবিত্র পাত্র করিয়া গড়িয়া তোলা। তবেই আমরা ঈশ্বরের সমীপবর্তী হইয়া, ক্রমে নিত্যধামে তাঁহার সামীপ্যলাভের যোগ্য হইব। ইহাই জীবন্মুক্তি, অর্থাৎ ঈশ আদর্শে উপনীত বা ঈশ্বরানুকৃত স্বভাব প্রাপ্তি। মানসিকতায় এই ভাব লব্ধ হইলে সংসারে আর পুনরাবর্তন হয়না, জীবলীলা অবসানে গতি হয় দিব্যলোকে, ভগবৎ ধামে, ইহাই মহা-প্রভুর আশ্বাসবাণী। তিনি দৃপ্তকণ্ঠে বলিয়াছেন, ভগবান আছেন, ইহাই শাস্ত্রের শেষ কথা নয়, ভক্তের ভগবান ভক্তের আহ্বানে নিজেই আসেন, জীব যেমন তাঁহাকে সন্ধান করিতেছে, তিনিও তেমনি জীবহৃদয় আকর্ষণ করিয়া তাহাদের খুঁজিতেছেন, নিত্যধামে নিত্য সহচররূপে প্রাপ্ত হইবার ঐশী অভিলাষে।

শ্রীচৈতন্যদেবের প্রিয়পার্ষদ রূপগোস্বামী তাঁহার বিরচিত লঘু ভগবতামৃত গ্রন্থের পূর্বখণ্ডে শাস্ত্রসম্মত উদাহরণ উল্লেখে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত কতকগুলি গ্রহ বা জীবলোক আছে, যাহার শীর্ষস্থানীয় সেই ব্রহ্মাণ্ডের ব্রহ্মলোক এবং এমন অনন্ত কোটি ব্রহ্মলোকের বীজরূপে অবস্থিত রহিয়াছে, এক অবিনাশী নিত্যলোক, যেখানে অবতার পুরুষগণ এবং ভগবৎ পারিষদগণ নিত্য বিরাজিত। ভগবৎলীলার অনুগত ও আনুসঙ্গিক প্রয়োজনেই তাঁহাদের ভূতলে আগমন ঘটিয়া থাকে। বেদান্তদর্শনে জগতের বিচিত্র ব্যাপারকে ব্রহ্মের লীলা বলিয়া উল্লেখ রহিয়াছে এবং বিলুপ্তপ্রায় ভাগবত ধর্ম পুনরায় সংস্থাপন কিংবা বিশেষ কোন কার্য্য নির্বাহের জন্য মহামানবরূপে ভগবানের ভূতলে অবতরণ, সেই লীলাবিলাসেরই অন্তর্গত। শ্রীগীতার সপ্তম অধ্যায়ের চতুর্বিংশতি শ্লোকে এবং নবমঅধ্যায়ের একাদশ শ্লোকে ভগবৎ বাক্য প্রাসঙ্গিক অনুধাবনীয় যে বুদ্ধিহীন মূঢ়ব্যক্তিগণই প্রপঞ্চাতীত ভগবানের মনুষ্যদেহাশ্রিত লীলাবিগ্রহ ধারণকে বুঝিতে পারে না। কারণ অপ্রপঞ্চ অর্থাৎ অলৌকিক স্বমহিমার প্রতিষ্ঠা হইতে, লৌকিক অধিষ্ঠানে অবতরণই অবতার কিংবা ভগবানের মূর্ত্তরূপ।

শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রবর্ত্তিত বৈষ্ণবধর্মমতে ভগবান আনন্দস্বরূপ ও রসময় এবং তাহার সহিত জীবের একটি অহেতুক প্রীতির সম্বন্ধ স্বীকৃত জীব কেন তাঁহাকে পাইতে চায, জানে না, অথচ সকল বিষাদ অবসাদ দূর করিবার জন্য, তাঁহার উপর নির্ভর না করিলেও চলে না। পার্থিব অজস্র ভোগোপকরণ এবং সীমাহীন বিলাসবৈভবের বিচিত্র ব্যাপারের মধ্যে বাস করিয়া নানাকর্মে ব্যাপৃত থাকিলেও, কোন কিছুতেই পরিতৃপ্ত পরিতোষ পায় না। মন আপন অজ্ঞাতসারে যেন কোন এক প্রেমিক পুরুষেরই অবিরত অনুসন্ধান করিযা ফিরে। পক্ষান্তরে জীব যেমন ভগবানকে পাইতে চায, ভগবানও তেমনি তাঁহার অনন্তমাধুর্য্যের বিশ্বব্যাপিনী মাধুরী দ্বারা ভক্তহৃদয়ের সমস্ত শোকতাপ বিক্ষোভের কুহেলিকা ভেদ করিয়া, অসংখ্য কাজের শৃঙ্খলে আবদ্ধ ক্ষুদ্র স্বার্থ চিন্তায় আড়ষ্ট, নানা আচরণ অনুষ্ঠানের আভরণে আবদ্ধ, তাঁহার স্বাতন্ত্র্য চিত্তকে স্বীয়াভিমুখীন করিতে চাহিতেছেন। কারণ ভগবদ্রূপে পূর্ণতাপ্রাপ্ত জীবকে তাঁহার প্রয়োজন আছে। তাই অজ্ঞান অন্ধকারে আবিষ্ট জীবের অন্তরে, তাঁর জ্যোতির্ময় প্রকাশের প্রয়াস, বহির্ম্মুখ অসত্য হইতে সত্য স্বরূপের প্রতি আগ্রহ আনিবার আকুলতা; মৃত্যুময় জগৎ হইতে অমৃত ধামের পথে পরিচালিত করিবার প্রচেষ্টা। আলো জ্বলিলেই যেমন আঁধার ঘর আলোকিত হয়, তেমনি স্ব-প্রকাশ অন্তরে প্রকাশিত হইলেই, সকল অন্তরায় অপসারিত হইয়া যায়। অপরদিকে জীবচিত্তকে বহির্ম্মুখীন রাখিবার

উদ্দেশ্যে জগৎ জুড়িয়া কতকিছুর বিপুল সমাবেশ, কতবিধ কর্মের কোলাহল, কতরকম পাতার মর্মরধ্বনি নদীর কলস্বন ভ্রমরের গুঞ্জনগীতি, বিহঙ্গের কাকলি। জগৎ রচনার কতই সমারোহ, কত যে বৈচিত্র্য, কতকি সৌন্দর্য্য, কতপ্রকার কলা শিল্প কত কর্মের ফলশস্য আহারের কতনা বিপুল আয়োজন। পক্ষান্তরে প্রাকৃতিক নিয়মে সবকিছু সরবরাহ অব্যাহত রাখিয়াও, মানব-জীবন হইতে শান্তিবস্তুটি সরাইয়া রাখিয়াছেন নতুবা জীব তাঁহার দিকে তাকাইবে না। ইহাই লীলাময়ের লীলাবিলাস। একদিকে ঢেউয়ের আহ্বান; অন্যদিকে তীরভূমির আকর্ষণের মধ্যে তটস্থ জীবের অন্তরে অন্তর্য্যামীর আকর্ষণ, বাহিরে বহির্জগতের প্রতি মোহঘোর অধিকন্তু অলৌকিক আনন্দের ভার প্রদান করিবার বাঞ্ছিত প্রেমিক ভক্তকে নানাভাবে বঞ্চিত করিয়াও জাগতিক দুর্দ্দশায় ফেলিয়া ধৈর্য্য অধ্যবসায়ের সহন পরীক্ষা করিতে অন্তরে অপার বেদনার বিধান করেন যেহেতু মহৎবস্তু দুঃখের দারুণ মূল্যেই লাভ করিতে হয়।

জীবমাত্রকেই কর্ম করিয়া উদরান্নের সংস্থান করিতে হয়। কিন্তু কর্ম যখন কেবল আপন স্বার্থে নিয়োজিত, নিজ লোভের আধিক্যে জর্জ্জরিত, তখনই তাহা বন্ধন সৃষ্টি করে। পরন্তু কর্মফলের প্রত্যাশা না করিয়া লাভ-অলাভ, জয়পরাজয় ভাবনা যদি ভগবৎ উদ্দেশ্যে সদা নিবেদিত থাকে, তবে তাহাই ধর্মচর্চায় পর্য্যবসিত হয়। পক্ষান্তরে ভগবানই পরম-কল্যাণরূপে আমাদের প্রীতিস্নেহ দানরূপে দয়ার দান গ্রহণ করিতেছেন এই ভাবনার অনুবর্ত্তী হইয়া যখন সেবায় রত হয়, অপরের উপকার করা যায়, পূজারূপে তাহাও ঈশ্বরের নিকট পৌঁছায়। সুতরাং আনন্দময় ভগবান অমৃতরূপে সকলের মধ্যে প্রবহমান, এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া কর্মে প্রবেশের ক্ষমতা অর্জ্জনই আধ্যাত্মিকতা। ইহার বাহ্যিক প্রকাশ বুঝা না গেলেও, ইহা মনের অবসাদ জনিত অসারত্ব অপসারিত করিয়া চিত্তকে ঈশ্বর চিন্তনে নিযুক্ত রাখে। তাই অন্তরে ভগবানের প্রতি নিষ্ঠা রাখিয়া, কর্মে অনাসক্ত থাকিয়া যথাযোগ্য বিষয় ভোগ করিবার নির্দ্দেশ প্রদান করিয়াছেন, শ্রীচৈতন্য দেব।

অন্তরে বাসনার নির্বাসনই সংসারমুক্তি। অতএব সর্বতোভাবে লোভ মোহ, অহঙ্কার অভিমান দমন করিয়া প্রবৃত্তিকে ভগবানের পদপ্রান্তে সংযত রাখিয়া, দেহেমনে, অন্তরেবাহিরে জ্ঞানকর্মে ভগবৎ মহিমায় উপলব্ধিতে আপন কর্ত্তব্যকর্ম সুচারুরূপে করিয়া যাইতে হইবে। তবেই অমৃতস্বরূপ অন্তরাত্মার নিভৃতস্থানে বর দিবেন, তাঁহার অমৃত আহ্বান জীবনে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হইতে থাকিবে, অন্তরের সুপ্তচেতনা প্রাণপণ বলে উদ্বোধিত হইয়া উঠিবে। তখন আর্ত্তের আশ্বাসদাতা, ভীতের ভয়ত্রাতা, ভগবান অন্তরে আগমন করিয়া বুদ্ধিবৃত্তি ও অভিরুচিকে এমনিভাবে পরিচালিত

করিবেন, যাহাতে সকল সংশয় নিমিষে নাশ হইয়া যায়। উল্লেখযোগ্য যে, উপদেশ গ্রহণ করিয়া যে শরণাগতি, তাহা অনবদ্য হয় না। অন্তরের স্বতঃ আকর্ষণে যাহার আত্মা সর্ব্বতোভাবে সমর্পিত তাহার পক্ষে ভরসা পাইবার আবশ্যক নাই। ভগবানের সহিত আপনজনের সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া তাহার প্রতি আনুগত্য-ময়ী মমতা আসিলেই ইহা সম্ভব। ইহাই মহাপ্রভুর অভিমত।

আবির্ভাব পূর্ব্বাভাষ

ঐ মহামানব আসে দিকে দিকে রোমাঞ্চ লাগে মর্ত্ত্য ধূলির ঘাসে ঘাসে। সুরলোকে বাজে জয়শঙ্খ, নরলোকে বাজে জয়ডঙ্ক, এল মহাজন্মের লগ্ন।"

বর্ত্তমান সময়ে গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের তীর্থক্ষেত্ররূপে সমাদৃত, পশ্চিম বঙ্গের নদীয়াজেলার অন্তর্গত গঙ্গাতীরে অবস্থিত ক্ষুদ্র শহর বা গ্রাম নবদ্বীপ শ্রীচৈতন্যদেবের জন্মস্থান। একাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে নবদ্বীপ নগর বল্লালসেনের রাজধানী ছিল। তিনি শাস্ত্রজ্ঞ ও গুণগ্রাহী ছিলেন বলিয়া ঐ সময়ে বিদ্যাচর্চার ঐশ্বর্য্যে, নবদ্বীপ ভারতের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছিল। কবি জয়দেব লক্ষ্মণসেনের পুত্র বল্লালসেনের রাজসভাসদ ছিলেন। লক্ষ্মণসেনকে পরাজিত করিয়া মোসলমান রাজত্ব স্থাপিত হইবার পর পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমভাগ পর্য্যন্ত নবদ্বীপের বিদ্যাচর্চা ক্রমশঃ ম্লান হইয়া, বিদ্যা কেন্দ্র সমূহ ক্রমে লোপ পাইতেছিল। কিন্তু পরবর্ত্তীকালে নব্যস্মৃতির প্রবর্ত্তক রঘুনন্দন এবং তন্ত্রশাস্ত্র সংগ্রাহক ও কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ প্রভৃতির খ্যাতি সারাভারতে ব্যাপ্ত হইয়া নবদ্বীপ বিদ্যার যশগৌরব আবার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কিন্তু পাণ্ডিত্যের বিভবে ও প্রতিষ্ঠার প্রভুত্বে তৎকালীন নবদ্বীপ বাংলার মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া থাকিলেও একদিকে বিধর্মী মোশলমান শাসকগণের উপদ্রব ও অপরদিকে উচ্চবর্ণের হিন্দুগণের সহানুভূতির অভাবে, পণ্ডিত সমাজে প্রেম ও ভক্তির অনুশীলন ম্রিয়মান হইয়া প্রাত্যহিক সমাজজীবনে বিজাতীয় বিলাসের উশৃঙ্খলতা ও শুষ্ক পাণ্ডিত্যের অভিব্যক্তি প্রকাশ পাইতে লাগিল। উৎকট সামাজিক বিচার ব্যবস্থার উৎপীড়নে অতিষ্ঠ হইয়া নিম্নবর্ণের হিন্দুগণ, ইসলাম ধর্মের উদার আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া পড়িল। বঙ্গদেশ তথা ভারতবর্ষের সেই ঘোর দুর্দ্দিনের মহা সঙ্কটসময়ে প্রেম ও ভক্তির আবেগময়ী মানবধর্ম্মের আদর্শ সংস্থাপন করিয়া নবীনযুগের উদ্বোধন করিতে, মহামানবের আবির্ভাব আসন্ন হইয়া আসিল।

এই সমকালীন সময়ে পূর্ববঙ্গের শ্রীহট্টজেলার ঢাকাদক্ষিণ গ্রাম নিবাসী, শ্রীচৈতন্যদেবের পিতৃদেব বাৎস্য গোত্রীয় বৈদিক ব্রাহ্মণ জগন্নাথ মিশ্র তাঁহার পিতৃদেব উপেন্দ্র মিশ্রের আগ্রহে নবদ্বীপে অধ্যয়ন করিতে আসিয়া অসাধারণ পাণ্ডিত্যের নিমিত্ত 'পুরন্দর' আখ্যা পাইয়াছিলেন। পাঠ সমাপনান্তে

নবদ্বীপেই চতুষ্পাঠী স্থাপনকরিয়া স্থায়ীভাবে বসবাসের সিদ্ধান্ত করিলেন। তাহার অতুলনীয় রূপ ও অসাধারণ বিদ্যাবত্তায় আকৃষ্ট হইয়া নবদ্বীপ নিবাসী নীলাম্বর চক্রবর্তী জ্যেষ্ঠাকন্যা শচীদেবীর সহিত বিবাহ দেন। উপর্য্যুপরি আটটি কন্যাসন্তান বিনষ্ট হইবার পর এক পুত্র জন্ম গ্রহণ করে,—নাম রাখা হয়, বিশ্বরূপ। পুত্রের বয়স যখন আনুমানিক আট বৎসর, তখন স্ত্রীপুত্রসমভি-ব্যাহারে বৃদ্ধ পিতামাতাকে দর্শন করিবার জন্য শ্রীহট্টে পিতৃগৃহে গমন করিলে ১৪০৬ শকাব্দে মাঘমাসে শচীদেবী সেখানে পুনরায় সন্তান সম্ভবা হন।

ইহার কয়েকমাস পরে, পুত্রবধূর গর্ভে স্বয়ংভগবান প্রবিষ্ট হইয়াছেন এবং তিনি নবদ্বীপের গঙ্গাতীরে প্রকাশ পাইবেন— মাতা শোভাদেবী এইরূপ স্বপ্নদর্শন করায়, তাঁহার নির্দ্দেশে বিজয়াদশমীর অব্যবহিত পরে তীর্থ-যাত্রীগণের সহিত জগন্নাথ মিশ্র সপরিবার নবদ্বীপ নগরে নিজগৃহে প্রত্যা-বর্তন করেন। উল্লেখযোগ্য যে, তৎকালে গঙ্গার পশ্চিম পারে অবস্থিত বর্ত্তমান নবদ্বীপধামকে বলা হইত 'কুলিয়া গ্রাম' এবং গঙ্গা ভাগিরথী বিধৌত অপর পারে ছিল বল্লাল সেনের রাজধানী নবদ্বীপ নগর।

এইদিকে মাঘ মাস অতিক্রম হইলেও কোন সন্তান ভূমিষ্ঠ না হওয়ায় চিন্তিত জগন্নাথ মিশ্র বিখ্যাত তান্ত্রিক জ্যোতিষী ও গণক, শ্বশুর নীলাম্বর চক্রবর্ত্তীকে সংবাদ জ্ঞাপন করিলে তিনি গণনা করিয়া বলিলেন যে শচীর গর্ভে কোন মহাপুরুষ জন্ম নিয়াছেন এবং তিনি অতি সত্বর নিকটবর্ত্তী কোন শুভ মুহূর্ত্তে প্রকাশিত হইবেন। এদিকে দুইমাস কাল পূর্বে গৃহপ্রান্তে অবস্থিত একটি বৃহৎ নিম্ববৃক্ষের নীচে পর্ণসূতিকাগার নির্ম্মিত হইয়া রহিয়াছে সন্তান প্রসবের প্রতীক্ষায়। ক্রমে মধুময় মধুমাস সমাগত হইল। গঙ্গাতীরস্থ, অগণিত বিদ্বজ্জন পরিশোভিত, বিদ্যানগরী নবদ্বীপে, ১৪০৭ শকাব্দের মনোহর ফাল্গুন মাসের ত্রয়োবিংশতি দিবসে, পূর্ণিমা তিথিতে অর্থাৎ ১৪৮৬ খ্রীষ্টাব্দে ফেব্রুয়ারী মাসের আঠার তারিখে, প্রায়ঃ সন্ধ্যাকালে চন্দ্রগ্রহণকালীন শঙ্খনিনাদ ও সমবেত হরিধ্বনির আনন্দ উল্লাস অভিব্যক্তি সময়ে এবং গঙ্গাঘাটে উপনীত পণ্ডিত মণ্ডলীর বিদ্যাবড় কিংবা ভক্তি শ্রেষ্ঠ, উচ্চস্বরে উচ্চারিত এই তর্ক তরঙ্গের মধ্যে, বিদ্যা ও ভক্তির মূর্ত্তবিগ্রহ শ্রীশচীনন্দন চৈতন্যদেব জন্মগ্রহণ করেন।

অপূর্ব সুলক্ষণাক্রান্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ এবং গলিত কাঞ্চনের মত গাত্রবর্ণ, অদৃষ্টপূর্ব সদ্যজাত পরমসুন্দর দিব্যশিশুকে দেখিয়া, ধনাঢ্য প্রতিবেশিগণ প্রভূত রজতমুদ্রা, সুবর্ণমোহর, স্বর্ণ নির্ম্মিত বিচিত্র অঙ্গদ, কাঙ্কন প্রভৃতি নানাবিধ অলঙ্কার উপহার প্রদান করিয়া, নাম বলিলেন 'গৌরাঙ্গ' অর্থাৎ গায়ের রং যার ফরসা। কয়েক বৎসর যাবত দেশব্যাপী অনাবৃষ্টি জনিত

নিদারুণ মন্বন্তরের বিপত্তি চলিবার পর, ঐ বৎসর শীতকালীন আমনধান্যের অভূতপূর্ব ফলনে দুর্ভিক্ষ প্রশমিত হইয়াছিল লক্ষ্য করিয়া, মাতামহ নীলাম্বর চক্রবর্তী নাম রাখিলেন, 'বিশ্বম্ভর' যেন বিশ্বের ভরণকর্ত্তারূপে আবির্ভূত। পূর্ণিমাসীর উদিতচন্দ্রের উজ্জ্বলপ্রভাব সময়ে ভূমিষ্ঠ হওয়ায় পণ্ডিতবর্গ নাম স্থির করিলেন, 'গৌরচাঁদ'। নিমগাছের তলায় জাতক বলিয়া মাতা শচীদেবী 'নিমাই" বলিয়া ডাকিতেন এবং যুবকবয়সে তিনি সর্বত্র 'নিমাই পণ্ডিত' নামেই সুপরিচিত ছিলেন। ঈশ্বরবিমুখ জীবগণকে সর্বচিত্ত আকর্ষণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণচেতনার উদ্বোধনে প্রণোদিত করিবেন বলিয়া সন্ন্যাসগ্রহণকালে দীক্ষগুরু প্রদত্ত 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন পরবর্ত্তীকালে এই নামেই বিশ্বব্যাপী সুবিদিত।

আদিপর্ব্ব

"হৃদয়নন্দনবনে, নিভৃত এ নিকেতনে, এস হে আনন্দময় এস চিরসুন্দর

প্রতিপদের চাঁদ যেমন প্রতি কলায় বৃদ্ধি পাইয়া ক্রমে পূর্ণচন্দ্রের আলোকে জগত উদ্ভাসিত করে, শিশু নিমাই তেমনি ক্রমশঃ বয়সে বাড়িয়া তাহার সুগোল মস্তকের কুঞ্চিত কেশদাম আকর্ণবিস্তৃত কমলনয়ন, প্রশস্ত বক্ষপ্রান্তে আজানুলম্বিতবাহু, অরুণাধরে মৃদুমধুর হাসি বীণাবিনিন্দিত সুমধুর কণ্ঠস্বর এবং কন্দর্পতুল্য রূপশোভায় সকলের বিমগ্ধনেত্রে ও স্তব্ধ বিস্ময়ে চাহিয়া দেখিবার বস্তুবিশেষ হইয়া পড়িল। অনেকেই নানাবিধ সুমিষ্ট খাদ্য আনিয়া দিয়া তাহার সন্তোষ বিধানে লালায়িত হইত। এইভাবেই স্নেহপ্রীতি, ভালবাসার মধ্য দিয়া শৈশবকাল অতিবাহিত হইয়া বিদ্যারম্ভের দিন সমাগত হইল।

গৃহে বর্ণমালা ও ব্যাকরণ আয়ত্ত করিবার সময়, তাঁহার একাগ্রচিত্ত বিদ্যাভ্যাস পটুতা ও অসাধারণ তীক্ষ্ণবুদ্ধির পরিচয় পাইয়া, পিতৃদেব জগন্নাথমিশ্র, অতি উৎসাহে উচ্চতর বিষয় অধ্যয়নের জন্য ১৪৯৩ খৃষ্টাব্দে সপ্তমবর্ষে উত্তীর্ণ পুত্রকে তৎকালে খ্যাতিমান পণ্ডিত গঙ্গাদাসের টোলে ভর্ত্তি করাইয়া দিলে, অনন্যসাধারণ ধীশক্তিবলে, অত্যল্পকালেই সকল পড়ুয়াগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করিলেন। ইতিমধ্যে জ্যেষ্ঠভ্রাতা বিশ্বরূপ সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণপূর্বক গৃহত্যাগ করিলে, বিমর্ষ নিমাই খেলাধূলা উপেক্ষা করিয়া সর্বক্ষণ অধ্যয়নেই নিমগ্ন হইয়া রহিলেন। মধ্যাহ্নে স্নান-কালে গঙ্গাঘাটে সহাধ্যায়ীগণের সহিত সাক্ষাৎ হইলে, বৃথাকথা না বলিয়া শাস্ত্রগ্রন্থাদির বিশেষ কোন দুরূহ প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া, পরস্পর আলোচনায় আনন্দলাভ করিতেন। কিন্তু কেহই তাঁহার সহিত যুক্তিতর্কে আঁটিয়া উঠিতে পারিত না। এই অল্পবয়সেই অপরের মত অনায়াসে অতিক্রম করিয়া

জীব, ব্রহ্ম নয়। এবং মায়াও নহে, পরন্তু এই দুইয়ের মধ্যভাগে অবস্থিত, ভগবানের নিত্যসত্তা ও উভয়ের উপাশ্রয়। সমুদ্রের সম্বন্ধবশতঃ তটের অর্থাগমের ন্যায় শ্রীভগবানের সহিত অংশাংশী সম্পর্কে জীবের তটস্থ রূপ নিত্যান্ত্য সিদ্ধ হয়। অর্থাৎ সমুদ্র যেমন অনাদি কাল হইতে আছে, তাহার উপকূল ভূমিরূপে তটও রহিয়াছে এবং সেইহেতু উভয়ের প্রীয়মান সম্পর্ক।

নদ সংলগ্ন থাকিয়াও তটভূমিতে [illegible] হওয়ার কারণ সতত সমুদ্র সংলগ্ন রহিয়াও তটি নিজস্ব সত্তা রক্ষাতেই সচেষ্ট। সেইরূপ ভগবানের সহিত নিত্যযুক্ত থাকা সত্ত্বেও দেহে আত্মবুদ্ধি পোষণ করিয়া তাহাতে তৎপর থাকায় জীবের আত্মস্বরূপের বিস্মরণ ঘটে। তটভূমি যথোৎপন্ন কণ্টকাদিতে বিস্তীর্ণ থাকার ন্যায়, জীবের জীবনও প্রকৃতি গুণজাত কণ্টক-সদৃশ্য সংসার দুঃখে আকীর্ণ। আত্মবিস্মৃত জীবের সংসারাবদ্ধ অবস্থা হইতে মুক্তিলাভের উপায় সম্পর্কে মহাপ্রভুর উপদেশ এই যে, সুখে দুঃখে ধৈর্য্য ধারণ পূর্বক প্রতিদিবসের যথোচিত কর্মে নিরলস থাকিয়া, ঈশ্বরে সমর্পিত প্রাণ ভক্ত, বাহ্যচেতনায় কীর্তনাদির অনুসরণে এবং আন্তরিক অনুরাগে নিজেকে শ্রীকৃষ্ণের অনুগত দাস, প্রিয়তম সহচর, স্নেহময় পিতা, পুত্রবৎসল মাতা কিংবা অনুরক্ত প্রণয়ী কল্পনা করিয়া, তাহারই অনুধ্যানে সর্বক্ষণ নিমগ্ন থাকিলে, চিত্তবৃত্তি তদাকার প্রাপ্ত হইয়া, অন্তর নির্মল হইবে। নির্মল চিত্তেই ভগবৎলীলা বিষয়ে 'শ্রদ্ধা' উপজাত হইয়া, পরিশেষে 'রুচি' উদ্ভব হয়। রুচির সরসতায় ভাগবতীয় কথামৃতে 'অনুরাগ' আসিয়া, 'রতি' আবির্ভাব হয়। রতি প্রগাঢ় হইলে তাহা কামনাবিহীন 'প্রেমনামে' অভিহিত হইয়া থাকে। সর্বানন্দপ্রদ অহৈতুকী এই ভগবৎপ্রেমই প্রয়োজন বলিয়া শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর অভিমত।

অতি আধুনিক যুগের ঈশ্বরবিমুখ সমাজে যেখানে জন জীবনের সহিত অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত সুস্থ আত্মিক মূল্যবোধ, ক্রমেই সরিয়া গিয়া আত্মম্ভরিতা ও ভগবৎ স্পৃহাহীনতার প্রাদুর্ভাব দেখা দিতেছে সেই বহির্মুখীন পরিমণ্ডলের সমাজ জীবনে, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর জীবন ও বাণী আলোচনা করিবার যথেষ্ট প্রয়োজন রহিয়াছে। সাম্যের মৌখিক গুণকীর্ত্তনে, মনের রাগদ্বেষাদিবর্জ্জিত সমতাভাব আসিতে পারে না। আবশ্যক ভগবৎনির্ভর প্রেমপ্রীতি, যাহার মূলে পরকাল ও পরমেশ্বরের প্রতি অন্তরের অচল বিশ্বাস অবিচলিত। বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য যেমন জাগতিক লুক্কায়িত সত্যকে উদঘাটিত করিয়া জগতের ব্যবহারিক কল্যাণ সাধনের উপায় নিরূপণ, ধর্মের লক্ষ্য ও মনের আড়ালে অবস্থিত, পরম সত্যকে দৃষ্টিপথে আনয়ন করিয়া মানব মনের আত্মিক কল্যাণ বিধানের উপায় নির্দ্ধারণ। পক্ষান্তরে সংশয়াত্মা লোকের

পরমাত্মা, পরমেশ্বর সম্বন্ধে সন্দেহ থাকিলেও, জীবনে দুঃখ আছে, ইহাতে কাহারও দ্বিমত নাই ; কারণ প্রত্যেকের জীবনই কোন এক দুঃখে ভারাক্রান্ত। এই দুঃখানুভূতির মূলে রহিয়াছে পূর্বজন্মের সুখস্মৃতির সংস্কার। এবং সুখময় অখণ্ড আনন্দকে বিস্মরণই দুঃখের হেতু বিজ্ঞান ভোগের বিবিধ উপকরণ প্রদান করিলেও অন্তরের দুঃখ দূর করিতে পারে না, কারণ একমাত্র পরমানন্দময়ের সহিত যুক্ত হইলেই দুঃখের নিবৃত্তি হয়, ইহাই ধর্মশাস্ত্রের উপদেশ। ঈশ্বরই সত্যস্বরূপ, কল্যাণস্বরূপ আনন্দস্বরূপ এবং এই ভূমানন্দের সহিত যে যোগসম্বন্ধ বা ভাববন্ধন মহাপ্রভুর মতে তাহাই "প্রেম"

শাস্ত্রীয় উপাসনার আভিধানিক তাৎপর্য অতিসন্নিধানে একাত্ম হইয়া থাকা কিংবা ঈশ্বরের নিকট বাস করা। ইহাতে ভগবানের সহিত প্রেমের সম্পর্ক স্থাপনের কথা নাই এবং ইহা কোনকালেই পরিস্ফুটরূপে জানা ছিল না। তাই বেদমতে ঈশ্বর লাভের পথ, অতিকষ্টকর, যেন ক্ষুরের ধারের মত শাণিত। কিন্তু গৌরহৃদয়ের স্নেহপ্রীতি প্রেম পরম মৃতময় পরমসুন্দর শ্রীকৃষ্ণকেই অনুক্ষণ অনুসন্ধান করিতেছে বলিয়া তন্ময়ের মন যতখানি তাঁহার নিকটবর্তী, আনন্দ সেই পরিমাণে অনুভূত হয় এবং অবিরত তাঁহার নাম জপই প্রেমময় কৃষ্ণের সহিত যুক্ত থাকার উত্তম পথ — আপন গভীরতম সত্তার অন্তর্ভাবসিঞ্চিত নিত্যধামের নিভৃত নিকুঞ্জের এই নিগূঢ়বার্তা, জীবলোকের মুক্ত গগনতলে ব্যক্ত এবং সর্বাতিশায়িরূপে নিজ জীবনে প্রকাশ করিয়া, প্রায় অর্দ্ধশত বর্ষ পূর্বে কেবলমাত্র হরিনাম সঙ্কীর্তন মাধ্যমে যেই প্রেমের বন্যা ধনীদরিদ্রের অসমতা জাতিভেদের বৈষম্য ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের কঠোরতার জটিলতা ঘুচাইয়া পরস্পরকে ভ্রাতৃত্ববোধের পরম প্রীতিতে মর্য্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল, সেই প্রেমধর্মের প্রচারক ছিলেন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু। তাঁহার প্রবর্তিত সহজ সরল ভগবৎ আরাধনা ও মৈত্রধর্মের মহাবাণী সমাজের সর্বস্তরে শ্রদ্ধার সহিত বিস্তার হইলে, স্পর্ধিত ধর্মাচরণের কৃষ্ণযবনিকা যাহা ধর্মের নামে, মানুষে মানুষে অন্তরাল সৃজন করিয়া তুলিয়াছে তাহা অনায়াসেই অপসারিত হইয়া ঈশ্বর লাভের যথার্থ পথ সকলের নিকটই সুগম হইবে। ভগবানকে আমরা দেখিতে না পাইলেও, তিনি আমাদিগকে নানা দুঃখ বেদনার মধ্য দিয়া জীব জীবনের সার্থকতার দিকেই লইয়া চলিয়াছেন তাঁহাকে কেমন করিয়া পাওয়া যায়, কিভাবে তিনি কাহার নিকট ধরা দেন, তাহা কেহ বলিতে পারে না। শাস্ত্রকারগণও এই বিষয়ে নীরব। কারণ ভগবান জড়ীয় বাক্য ও মনের অগোচর। কিন্তু আমরা তাঁহার কথা ভাবিতে পারি। তাঁহাকে চিন্তায় ধরিয়া রাখিতে আমাদের অসুবিধা নাই। এই ভাবনা ও

চিন্তনই ভগবৎ উপাসনা ; কিংবা তাঁহার সমীপে উপবেসন। তাঁহার সর্ব গুণসম্পন্ন বিশুদ্ধস্বভাবের উপর চিত্ত নিবিষ্ট করিয়া, ভক্তিভরে তাঁহাকে ভাবনা করিতে হইবে। প্রীতির সহিত হৃদয়কে সর্বদা ভগবৎ ভাবিত রাখিয়া সকল চিন্তায়, সমস্ত কাজে যাবতীয় অবসরে, সমগ্র নিজেকে কেবলই ভগবৎ মুখীন করিয়া চলিতে হইবে। যেহেতু চিন্তাই শরীর গঠন করে এবং নিরন্তর ভগবৎ অনুধ্যানে মর্ত্য তনু ভগবতী তনু হইয়া উঠে, তাই প্রতিনিয়তই তাঁহাকে স্মরণে রাখিতে হইবে। তিনিই প্রাণের প্রাণ, চক্ষুর চক্ষু, শ্রোত্রের শ্রোত্র, মনের মন এবং আমাদের প্রাণমন অতি অজ্ঞাতসারে তাঁহারই অভিমুখে চলিতেছে, যাহা ইচ্ছাকৃত হয় না, বলিয়াই দুঃখ বিচলিত করে।

কাজেই ভগবানকে পাওয়া নয়, নিজেকে ভগবানের ভূমিকায় উন্নীত করিয়া দেবাত্মা হইতে হইবে, তাঁহার স্বভাবের আদর্শে আপনাকে গঠিত করিয়া তুলিবার আন্তরিক প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখিতে হইবে, তাঁহার নির্মলতার মত বিশুদ্ধতা, তাঁহার শক্তির অনুকরী মঙ্গলময় সামর্থ্য, অবিরত কামনা করিয়া যাইতে হইবে, সুখেদুঃখে, কর্মেবিশ্রামে ও সকল কর্মাবসানে। তবেই ঐশ্বরিক পবিত্র চরিত্রের বিমলজ্যোতি আপন আচরণে প্রতিফলিত হইবে, যেমন মার্জিত দর্পণেই সূর্যরশ্মি বিচ্ছুরিত হয়। জগতের অজস্র পার্থিব আকর্ষণ ও সংসারের বিবিধ বৈচিত্র্যপূর্ণ ব্যাপারের মধ্যে বাস করিয়াও, আমরা যে শান্তিসুখ পাই না, তাহার কারণ সর্বসুখনিলয় ভগবানের সহিত আমাদের যোগ নাই। সেই সর্বসুখদাতা সর্বদাই আমাদিগকে তাঁহার অভিমুখে আকর্ষণ করিয়া চলিয়াছেন, আমাদিগের সুখসমৃদ্ধির জন্য জগৎ জুড়িয়া কত তাঁহার আয়োজন, দিনেদিনে স্তরেস্তরে সকলকেই শতদল পদ্মের মত বিকশিত করিয়া তুলিতেছেন, তাহারই পূজার অর্ঘ্যরূপে গ্রহণ করিবার জন্য। আমাদের কর্তব্য কেবল সেই অমৃতময় হইতে অবিরত বর্ষিত অমৃত-ধারা ধারণ করিবার জন্য নিজেদের পবিত্র পাত্র করিয়া গড়িয়া তোলা। তবেই আমরা ঈশ্বরের সমীপবর্ত্তী হইয়া, ক্রমে নিত্যধামে তাঁহার সামীপ্যলাভের যোগ্য হইব। ইহাই জীবন্মুক্তি, অর্থাৎ ঈশ আদর্শে উপনীত বা ঈশ্বরানুকৃত স্বভাব প্রাপ্তি। মানসিকতায় এই ভাব লব্ধ হইলে সংসারে আর পুনরাবর্তন হয়না ; জীবলীলা অবসানে গতি হয় দিব্যলোকে, ভগবৎ ধামে, ইহাই মহা-প্রভুর আশ্বাসবাণী। তিনি দৃপ্তকণ্ঠে বলিয়াছেন, ভগবান আছেন, ইহাই শাস্ত্রের শেষ কথা নয়, ভক্তের ভগবান, ভক্তের আহ্বানে নিজেই আসেন, জীব যেমন তাঁহাকে সন্ধান করিতেছে, তিনিও তেমনি জীবহৃদয় আকর্ষণ করিয়া তাহাদের খুঁজিতেছেন, নিত্যধামে নিত্য সহচররূপে প্রাপ্ত হইবার ঐশী অভিলাষে।

শ্রীচৈতন্যদেবের প্রিয়পার্ষদ রূপগোস্বামী তাঁহার বিরচিত লঘু ভগবতামৃত গ্রন্থের পূর্বখণ্ডে শাস্ত্রসম্মত উদাহরণ উল্লেখে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত কতকগুলি গ্রহ বা জীবলোক আছে, যাহার শীর্ষস্থানীয় সেই ব্রহ্মাণ্ডের ব্রহ্মলোক এবং এমন অনন্ত কোটি ব্রহ্মলোকের বীজরূপে অবস্থিত রহিয়াছে, এক অবিনাশী নিত্যলোক, যেখানে অবতার পুরুষগণ এবং ভগবৎ পারিষদগণ নিত্য বিরাজিত। ভগবৎলীলার অনুগত ও আনুসঙ্গিক প্রয়োজনেই তাঁহাদের ভূতলে আগমন ঘটিয়া থাকে। বেদান্তদর্শনে জগতের বিচিত্র ব্যাপারকে ব্রহ্মের লীলা বলিয়া উল্লেখ রহিয়াছে এবং বিলুপ্তপ্রায় ভাগবত ধর্ম পুনরায় সংস্থাপন কিংবা বিশেষ কোন কার্য্য নির্বাহের জন্য মহামানবরূপে ভগবানের ভূতলে অবতরণ, সেই লীলাবিলাসেরই অন্তর্গত। শ্রীগীতার সপ্তম অধ্যায়ের চতুর্বিংশতি শ্লোকে এবং নবমঅধ্যায়ের একাদশ শ্লোকে ভগবৎ বাক্য প্রাসঙ্গিক অনুধাবনীয় যে বুদ্ধিহীন মূঢ়ব্যক্তিগণই প্রপঞ্চাতীত ভগবানের মনুষ্যদেহাশ্রিত লীলাবিগ্রহ ধারণকে বুঝিতে পারে না। কারণ অপ্রপঞ্চ অর্থাৎ অলৌকিক স্বমহিমার প্রতিষ্ঠা হইতে, লৌকিক অধিষ্ঠানে অবতরণই অবতার কিংবা ভগবানের মূর্ত্তরূপ।

শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রবর্তিত বৈষ্ণবমতে ভগবান আনন্দস্বরূপ ও রসময় এবং তাহার সহিত জীবের একটি অহৈতুক প্রীতির সম্বন্ধ স্বীকৃত। জীব কেন তাঁহাকে পাইতে চায় জানে না, অথচ সকল বিষাদ অবসাদ দূর করিবার জন্য তাঁহার উপর নির্ভর না করিলেও চলে না। পার্থিব অজস্র ভোগোপকরণ এবং সীমাহীন বিলাসবৈভবের বিচিত্র ব্যাপারের মধ্যে বাস করিয়া নানাকমে ব্যাপৃত থাকিলেও, কোন কিছুতেই পরিতৃপ্ত পরিতোষ পায় না, মন আপন অজ্ঞাতসারে যেন কোন এক প্রেমিক পুরুষেরই অবিরত অনুসন্ধান করিয়া ফিরে। পক্ষান্তরে জীব যেমন ভগবানকে পাইতে চায়, ভগবানও তেমনি তাঁহার অনন্তমাধুর্য্যের বিশ্বব্যাপিনী মাধুরীদ্বারা ভক্তহৃদয়ের সমস্ত শোকতাপ বিক্ষোভের কুহেলিকা ভেদ করিয়া, অসংখ্য কাজের শৃঙ্খলে আবদ্ধ ক্ষুদ্র স্বার্থ চিন্তায় আড়ষ্ট, নানা আচরণ অনুষ্ঠানের আভরণে আবদ্ধ, তাহার স্বাতন্ত্র্য চিত্তকে স্বীয়াভিমুখীন করিতে চাহিতেছেন। কারণ ভগবদ্রূপে পূর্ণতাপ্রাপ্ত জীবকে তাঁহার প্রয়োজন আছে। তাই অজ্ঞান অন্ধকারে আবিষ্ট জীবের অন্তরে, তাঁর জ্যোতির্ময় প্রকাশের প্রয়াস, বহির্মুখ অসত্য হইতে সত্য স্বরূপের প্রতি আগ্রহ আনিবার আকুলতা, মৃত্যুময় জগৎ হইতে অমৃত ধামের পথে পরিচালিত করিবার প্রচেষ্টা। আলো জ্বলিলেই যেমন আঁধার ঘর আলোকিত হয়, তেমনি স্ব-প্রকাশ অন্তরে প্রকাশিত হইলেই, সকল অন্তরায় অপসারিত হইয়া যায়। অপরদিকে জীবচিত্তকে বহির্মুখীন রাখিবার

উদ্দেশ্যে জগৎ জুড়িয়া কতকিছুর বিপুল সমাবেশ, কতবিধ কর্মের কোলাহল, কত বর্ণময় পাতার মর্মরধ্বনি নদীর কলস্বন ভ্রমরের গুঞ্জনগীতি, বিহঙ্গের কাকলি। জগৎ রচনার কতই সমারোহ, কত যে বৈচিত্র্য, কতকি সৌন্দর্য্য, কতপ্রকার কলা শিল্প কত কর্মের ফলশ্রুতি আহার্য্যের কতন বিপুল আয়োজন। পক্ষান্তরে প্রকৃতিক নিয়মে সবকিছুর সরবরাহ অব্যাহত রাখিয়াও, মানব-জীবন হইতে শান্তিবস্তুটি সরাইয়া রাখিয়াছেন নতুবা জীব তাঁহার দিকে তাকাইবে না। ইহাই লীলাময়ের লীলাবিলাস একদিকে ঢেউয়ের আহ্বান, অন্যদিকে তীরভূমির আকর্ষণের মত, তটস্থ জীবের অন্তরে অন্তর্যামীর আকর্ষণ, বাহিরে বহির্জগতের প্রতি মোহঘোর অধিকন্তু অলৌকিক আনন্দের ভাব প্রদান করিবার নিমিত্ত প্রেমিকভক্তকে নানাভাবে বঞ্চিত করিয়াও জাগতিক দুর্দ্দশায় ফেলিয়া ধৈর্য্যঅধ্যবসায়ের সাধন পরীক্ষা করিতে অন্তরে অপার বেদনার বিধান করেন, যেহেতু মহৎস্তুগ দুঃখের দারুণ মূল্যেই লাভ করিতে হয়।

জীবমাত্রকেই কর্ম করিয়া উদরান্নের সংস্থান করিতে হয়। কিন্তু কর্ম যখন কেবল আপন স্বার্থে নিয়োজিত, নিজ লোভের আধিক্যে জর্জ্জরিত, তখনই তাহা বন্ধন সৃষ্টি করে। অবশ্য কর্মফলের প্রত্যাশা না করিয়া লাভ-অলাভ, জয়পরাজয় ভাবনা যদি ভগবৎ উদ্দেশ্যে সদা নিবেদিত থাকে, তবে তাহাই ধর্ম্মচর্চায় পর্য্যবসিত হয়। পক্ষান্তরে ভগবানই পুত্র-কন্যারূপে আমাদের প্রীতিস্নেহ দীনরূপে দয়ার দান গ্রহণ করিতেছেন এই ভাবনার অনুবর্ত্তী হইয়া যখন সেবায়ত্ন করা হয়, অপরের উপকার করা যায়, পূজারূপে তাহাও ঈশ্বরের নিকট পৌঁছায়। সুতরাং আনন্দময় ভগবান অমৃতরূপে সকলের মধ্যে প্রবহমান, এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া কর্মে প্রবেশের ক্ষমতা অর্জ্জনই আধ্যাত্মিকতা। ইহার বাহ্যিক প্রকাশ দেখা না গেলেও ইহা মনের অবসাদ জনিত অসারতা অপসারিত করিয়া চিত্তকে ঈশ্বর চিন্তনে নিযুক্ত রাখে। তাই অন্তরে ভগবানের প্রতি নিষ্ঠা রাখিয়া, কর্মে অনাসক্ত থাকিয়া যথাযোগ্য বিষয় ভোগ করিবার নির্দ্দেশ প্রদান করিয়াছেন, শ্রীচৈতন্য দেব।

অন্তরের বাসনার নির্বাসনই সংসারমুক্তি। অতএব সর্বতোভাবে লোভ মোহ, অহঙ্কারের অভিমান দমন করিয়া প্রবৃত্তিকে ভগবানের পদপ্রান্তে সংযত রাখিয়া, দেহেমনে, অন্তরেবাহিরে জ্ঞানকর্মে ভগবৎ মহিমায় উপলব্ধিতে আপন কর্ত্তব্যকর্ম সুচারুরূপে করিয়া যাইতে হইবে। তবেই অমৃতস্বরূপ অন্তরাত্মার নিভৃতস্থানে দ্বার দিবেন, তাঁহার অমৃতআহ্বান জীবনে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হইতে থাকিবে, অন্তরের সুপ্তচেতন প্রাণপণ বলে উদ্বোধিত হইয়া উঠিবে। তখন আর্ত্তের আশ্বাসদাতা, ভীতের ভয়ত্রাতা, ভগবান অন্তরে আগমন করিয়া বুদ্ধিবৃত্তি ও অভিরুচিকে এমনিভাবে পরিচালিত

করিবেন, যাহাতে সকল সংশয় নিমিষে নাশ হইয়া যায়। উল্লেখযোগ্য যে, উপদেশ গ্রহণ করিয়া যে শরণাগতি, তাহা অনবদ্য হয় না। অন্তরের স্বতঃ আকর্ষণে যাহার আত্মা সর্ব্বতোভাবে সমর্পিত তাহার পক্ষে ভরসা পাইবার আবশ্যক নাই ভগবানের সহিত আপনজনের সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া তাঁহার প্রতি আনুগত্যময়ী মমতা আসিলেই ইহা সম্ভব, ইহাই মহাপ্রভুর অভিমত।

আবির্ভাবের পূর্ব্বাভাষ

"ঐ মহামানব আসে, দিকে দিকে রোমাঞ্চ লাগে মর্ত্ত ধূলির ঘাসে ঘাসে।
সুরলোকে বাজে জয়শঙ্খ, নরলোকে বাজে জয়ডঙ্ক, এল মহাজন্মের লগ্ন॥"

বর্ত্তমান সময়ে গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের তীর্থক্ষেত্ররূপে সমাদৃত, পশ্চিম বঙ্গের নদীয়াজেলার অন্তর্গত, গঙ্গাতীরে অবস্থিত ক্ষুদ্রসহর, শ্রীধাম নবদ্বীপ শ্রীচৈতন্যদেবের জন্মস্থান। একাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে নবদ্বীপ নগর বল্লালসেনের রাজধানী ছিল। তিনি শাস্ত্রজ্ঞ ও গুণগ্রাহী ছিলেন বলিয়া ঐ সময়ে বিদ্যাচর্চার ঐশ্বর্য্যে, নবদ্বীপ ভারতের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছিল। কবি জয়দেব লক্ষ্মণসেনের পুত্র বল্লালসেনের রাজসভাসদ ছিলেন লক্ষ্মণসেনকে পরাজিত করিয়া মোসলমান রাজত্ব স্থাপিত হইবার পর পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমভাগ পর্য্যন্ত নবদ্বীপের বিদ্যাচর্চা ক্রমশঃ ম্লান হইয়া, বিদ্যা-কেন্দ্র সমূহ ক্রমে লোপ পাইতেছিল কিন্তু পরবর্তীকালে নব্যস্মৃতির প্রবর্ত্তক রঘুনন্দন এবং তন্ত্রশাস্ত্র সংগ্রহকর্ত্তা কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ প্রভৃতির খ্যাতি সারাভারতে ব্যাপ্ত হইয়া নবদ্বীপে বিদ্যার যশগৌরব আবার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কিন্তু পাণ্ডিত্যের বিভবে ও প্রতিষ্ঠার প্রভুত্বে তৎকালীন নবদ্বীপ বাংলার মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া থাকিলেও, একদিকে বিধর্মী মোসলমান শাসকগণের উপদ্রব ও অপরদিকে উচ্চবর্ণের হিন্দুগণের সহানুভূতির অভাবে, পণ্ডিত সমাজে প্রেম ও ভক্তির অনুশীলন ম্রিয়মান হইয়া প্রাত্যহিক সমাজজীবনে বিজাতীয় বিলাসের উশৃঙ্খলতা ও শুষ্ক পাণ্ডিত্যের অভিব্যক্তি প্রকাশ পাইতে লাগিল। উৎকট সামাজিক বিচার ব্যবস্থার উৎপীড়নে অতিষ্ঠ হইয়া নিম্নবর্ণের হিন্দুগণ, ইসলাম ধর্মের উদার আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া পড়িল। বঙ্গদেশ তথা ভারতবর্ষের সেই ঘোর দুর্দ্দিনের মহা সঙ্কটসময়ে প্রেম ও ভক্তির আবেগময়ী মানবধর্মের আদর্শ সংস্থাপন করিয়া নবীনযুগের উদ্বোধন করিতে, মহামানবের আবির্ভাব আসন্ন হইয়া আসিল।

এই সমকালীন সময়ে পূর্ববঙ্গের শ্রীহট্টজেলার ঢাকাদক্ষিণ গ্রাম নিবাসী, শ্রীচৈতন্যদেবের পিতৃদেব বাৎস্য গোত্রীয় বৈদিক ব্রাহ্মণ জগন্নাথ মিশ্র. তাঁহার পিতৃদেব উপেন্দ্র মিশ্রের আগ্রহে নবদ্বীপে অধ্যয়ন করিতে আসিয়া অসাধারণ পাণ্ডিত্যের নিমিত্ত 'পুরন্দর' আখ্যা পাইয়াছিলেন। পাঠ সমাপনান্তে

নবদ্বীপেই চতুষ্পাঠী স্থাপনকরিয়া স্থায়ীভাবে বসবাসের সিদ্ধান্ত করিলেন। তাঁহার অতুলনীয় রূপ ও অসাধারণ বিদ্যাবত্তায় আকৃষ্ট হইয়া নবদ্বীপ নিবাসী নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী জ্যেষ্ঠাকন্যা শচীদেবীর সহিত বিবাহ দেন। উপর্য্যুপরি আটটি কন্যাসন্তান বিনষ্ট হইবার পর এক পুত্র জন্ম গ্রহণ করে,—নাম রাখা হয়, বিশ্বরূপ। পুত্রের বয়স যখন আনুমানিক আট বৎসর, তখন স্ত্রীপুত্রসমভি-ব্যাহারে বৃদ্ধ পিতামাতাকে দর্শন করিবার জন্য শ্রীহট্টে পিতৃগৃহে গমন করিলে ১৪০৬ শকাব্দে মাঘমাসে শচীদেবী সেখানে পুনরায় সন্তান সম্ভবা হন।

ইহার কয়েকমাস পরে, পুত্রবধূর গর্ভে স্বয়ংভগবান প্রবিষ্ট হইয়াছেন এবং তিনি নবদ্বীপের গঙ্গাতীরে প্রকাশ পাইবেন — মাতা শোভাদেবী এইরূপ স্বপ্নদর্শন করায়, তাঁহার নির্দ্দেশে বিজয়াদশমীর অব্যবহিত পরে তীর্থ-যাত্রীগণের সহিত, জগন্নাথ মিশ্র সপরিবারে নবদ্বীপ নগরে নিজগৃহে প্রত্যা-বর্ত্তন করেন। উল্লেখযোগ্য যে তৎকালে গঙ্গার পশ্চিম পারে অবস্থিত বর্ত্তমান নবদ্বীপধামকে বলা হইত 'কুলিয় গ্রাম' এবং গঙ্গাভাগিরথী বিধৌত অপর পারে ছিল বল্লাল সেনের রাজধানী নবদ্বীপ নগর।

এইদিকে মাঘ মাস অতিক্রম হইলেও কোন সন্তান ভূমিষ্ঠ না হওয়ায় বিচলিত জগন্নাথ মিশ্র বিখ্যাত তান্ত্রিক জ্যোতিষী ও গণক, শ্বশুর নীলাম্বর চক্রবর্ত্তীকে সংবাদ জ্ঞাপন করিলে তিনি গণনা করিয়া বলিলেন যে শচীর গর্ভে কোন মহাপুরুষ জন্ম নিয়াছেন এবং তিনি অতি সত্বর নিকটবর্ত্তী কোন শুভ মুহূর্ত্তে প্রকাশিত হইবেন। এদিকে দুইমাস কাল পূর্বে গৃহপ্রান্তে অবস্থিত একটি বৃহৎ নিম্ববৃক্ষের নীচে পর্ণসূতিকাগার নির্ম্মিত হইয়া রহিয়াছে সন্তান প্রসবের প্রতীক্ষায়। ক্রমে মধুময় মধুমাস সমাগত হইল। গঙ্গাতীরস্থ, অগণিত বিদ্বজ্জন পরিবেষ্টিত বিদ্যানগরী নবদ্বীপে, ১৪০৭ শকাব্দের মনোহর ফাল্গুন মাসের ত্রয়োবিংশ দিবসে পূর্ণিমা তিথিতে অর্থাৎ ১৪৮৬ খ্রীষ্টাব্দে ফেব্রুয়ারী মাসের অষ্টাদশ তারিখে প্রায়ঃ সন্ধ্যাকালে চন্দ্রগ্রহণকালীন শঙ্খনিনাদ ও সমবেত হরিধ্বনির আনন্দ উল্লাস অভিব্যক্তি সময়ে এবং গঙ্গাঘাটে উপনীত পণ্ডিত মণ্ডলীর বিদ্যাবড় কিংবা ভক্তি শ্রেষ্ঠ উচ্চরবে উচ্চারিত এই তর্ক তরঙ্গের মাঝে বিদ্যা ও ভক্তির মূর্ত্তবিগ্রহ শ্রীশচীনন্দন চৈতন্যদেব জন্মগ্রহণ করেন।

অপূর্ব সুলক্ষণাক্রান্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ এবং গলিত কাঞ্চনের মত গাত্রবর্ণ, অদৃষ্টপূর্ব সদ্যজাত পরমসুন্দর দিব্যশিশুকে দেখিয়া, ধনাঢ্য প্রতিবেশিগণ প্রভূত রজতমুদ্রা, সুবর্ণমোহর, স্বর্ণ নির্মিত বিচিত্র অঙ্গদ কাঞ্চন প্রভৃতি নানাবিধ অলঙ্কার উপহার প্রদান করিয়া, নাম বলিলেন গৌরাঙ্গ' অর্থাৎ গায়ের রং যার ফরসা। কয়েক বৎসর যাবত দেশব্যাপী অনাবৃষ্টি জনিত

নিদারুণ মন্বন্তরের বিপত্তি চলিবার পর, ঐ বৎসর শীতকালীন আমনধান্যের অভূতপূর্ব ফলনে দুর্ভিক্ষ প্রশমিত হইয়াছিল লক্ষ্য করিয়া, মাতামহ নীলাম্বর চক্রবর্তী নাম রাখিলেন, 'বিশ্বম্ভর' যেন বিশ্বের ভরণকর্তারূপে আবির্ভূত। পূর্ণিমাসীর উদিতচন্দ্রের উজ্জ্বলপ্রভাব সময়ে ভূমিষ্ঠ হওয়ায় পণ্ডিতবর্গ নামস্বর করিলেন, 'গৌরচাঁদ'। নিমগাছের তলায় জাতক বলিয়া মাতা শচীদেবী 'নিমাই'' বলিয়া ডাকিতেন এবং যুবকবয়সে তিনি সর্বত্র 'নিমাই পণ্ডিত' নামেই সুপরিচিত ছিলেন। ঈশ্বরবিমুখ জীবগণকে সর্বচিত্ত আকর্ষণ করি, শ্রীকৃষ্ণচেতনার উদ্বোধনে প্রণোদিত করিবেন বলিয়া, সন্ন্যাসগ্রহণকালে দীক্ষগুরু প্রদত্ত 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। পরবর্ত্তীকালে এই নামেই বিশ্বব্যাপী সুবিদিত।

আদিপর্ব্ব

''হৃদয়নন্দনবনে, নিভৃত এ নিকেতনে, এস হে আনন্দময় এস চিরসুন্দর।'

প্রতিপদের চাঁদ যেমন প্রতি কলায় বৃদ্ধি পাইয়া ক্রমে পূর্ণচন্দ্রের আলোকে জগত উদ্ভাসিত করে, শিশু নিমাই তেমনি ক্রমশঃ বয়সে বাড়িয় তাঁহার সুগোল মস্তকের কুঞ্চিত কেশদাম, আকর্ণবিস্তৃত কমলনয়ন, প্রশস্ত বক্ষপ্রান্তে আজানুলম্বিতবাহু, অরুণাধরে মৃদুমধুর হাসি, বীণাবিনিন্দিত সুমধুর কণ্ঠস্বর এবং কন্দর্পতুল্য রূপশোভায় সকলের বিমুগ্ধনেত্রে ও সুপ্ত-বিস্ময়ে চাহিয়া দেখিবার বস্তুবিশেষ হইয়া পড়িল। অনেকেই নানাবিধ সুমিষ্ট খাদ্য আনিয়া দিয়া তাঁহার সন্তোষ বিধানে লালায়িত হইত। এইভাবেই স্নেহপ্রীতি, ভালবাসার মধ্য দিয়া শৈশবকাল অতিবাহিত হইয়া বিদ্যারম্ভে দিন সমাগত হইল।

গৃহে বর্ণমালা ও ব্যাকরণ আয়ত্ত করিবার সময়, তাঁহার একাগ্রচিত্ত বিদ্যাভ্যাস পটুতা ও অসাধারণ তীক্ষ্ণবুদ্ধির পরিচয় পাইয়া, পিতৃদেব জগন্নাথমিশ্র, অতি উৎসাহে উচ্চতর বিষয় অধ্যয়নের জন্য ১৪৯৩ খৃষ্টাব্দে সপ্তমবর্ষে উত্তীর্ণ পুত্রকে তৎকালে খ্যাতিমান পণ্ডিত গঙ্গাদাসের টোলে ভর্ত্তি করাইয়া দিলে, অনন্যসাধারণ ধীশক্তিবলে, অত্যল্পকালেই সকল পড়ুয়াগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করিলেন। ইতিমধ্যে জ্যেষ্ঠভ্রাতা বিশ্বরূপ সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণপূর্বক গৃহত্যাগ করিলে, বিমর্ষ নিমাই খেলাধূলা উপেক্ষা করিয়া সর্বক্ষণ অধ্যয়নেই নিমগ্ন হইয়া রহিলেন। মধ্যাহ্নে স্নান-কালে গঙ্গাঘাটে সহাধ্যায়ীগণের সহিত সাক্ষাৎ হইলে, বৃথাকথা না বলিয়া শাস্ত্রগ্রন্থাদির বিশেষ কোন দুরূহ প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া, পরস্পর আলোচনায় আনন্দলাভ করিতেন। কিন্তু কেহই তাঁহার সহিত যুক্তিতর্কে আঁটিয়া উঠিতে পারিত না। এই অল্পবয়সেই অপরের মত অনায়াসে অতিক্রম করিয়

"শুধায়োনা কবে কোন গান,
কাহারে করিয়াছিনু দান।
পথের ধূলার পরে, পড়ে আছে তারি তরে,
যে তাহারে দিতে পারে মান।"